অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

একাংক
নাট্য-সংকলন

[নাট্য-সংকলন ঃ তৃতীয় খণ্ড]

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৩

প্রচ্ছদ শিল্পী :
মনোজ মিত্র

মুদ্রক :
বংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা ৭০০ ০০৯

দ্রষ্টব্য :
গ্রন্থভুক্ত নাটকগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যাদির জন্য ৪/২ডি, রাজেন্দ্র লালা স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৬-এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

একাংক নাট্য-সংকলন

[নাট্য-সংকলন/তৃতীয় খণ্ড

সূচী

সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে

[আনন্ত শেখভ অনুসরণে]

॥ চরিত্রলিপি ॥

সমরেশ চৌধুরী—বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান

অক্ষয়বাবু—সমরেশ চৌধুরীর প্রাইভেট সেক্রেটারী

অনিলা দেবী—সমরেশ চৌধুরীর স্ত্রী

কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

আর আছেন—পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ

॥ স্থান ॥

বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের বোর্ড অব ডিরেকটরের চেয়ারম্যানের আপিস ঘর

কাল : বর্তমান

বহুরূপী অভিনীত

প্রথম অভিনয় ৮ই নভেম্বর ১৯৫৪

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকা-লিপি ॥

সমরেশ চৌধুরী—অমর গাঙ্গুলী

অক্ষয়—জ্যাকেরিয়া

অনিলা—তৃপ্তি মিত্র

কাদম্বিনী—আরতি মৈত্র

সদস্যগণ—শোভেন মজুমদার, কুমার রায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়

নাট্য পরিচালক—শম্ভু মিত্র

[বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরের চেয়ারম্যানের আপিস ঘর। আপিস ঘরের উপযুক্ত আসবাব। বাঁদিকে দরজা। দরজার ওধারে ব্যাঙ্কের আপিস ঘর। সময় বেলা একটা। চেয়ারম্যানের প্রাইভেট সেক্রেটারী অক্ষয়বাবু তাঁহার টেবিলে বসিয়া একা কাজ করিতেছেন। টেবিলে কিছু কাগজ-পত্র, টাইপরাইটার ও একটি টোটালাইজার।]

অক্ষয় : (দরজার নিকট আসিয়া) এই ভোলা, সামনের ডাক্তারখানা থেকে দুটো সারিডন ট্যাবলেট নিয়ে আয়। আর শোন্—তোকে আমি অন্তত দুশোবার বলেছি এ ঘরের কুঁজোটা ভরে রাখতে—ভরিসনি কেন? হোপলেস কোথাকার! (টেবিলের নিকট আসিয়া) নাঃ আর পারছি না! আজ নিয়ে তিন দিন! সারা দিন এখানে টাইপ করা, রিপোর্ট তৈরি করা, আর রাত্তিরে বাড়িতে গিয়ে ফাইল মেলানো! (কাশিয়া) আবার বোঝার ওপর শাকের আঁটি—বেশ একটু জ্বরও হয়েছে, শীতও করছে—গা তো বেশ গরম!—হাত পাও কামড়াচ্ছে! আর মাথা—মাথায় একি হল রে বাবা! যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি সাইন্ অফ্ এক্স্ক্লামেশন্—রিপোর্টের সমস্ত এক্স্ক্লামেশন্গুলো ঘোরা-ফেরা করছে! (চেয়ারে বসিয়া) চেয়ারম্যান! চেয়ারম্যান্ না কচু! একটা ভাঁড়, একটা হতচ্ছাড়া—উঃ, অ্যানুয়াল রিপোর্ট পড়বেন! আবার রিপোর্টের টাইটেল দেওয়া হয়েছে—বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক, আজ যা আছে, আর কাল যা হবে। কাল কচু হবে! নিজেকে যে কি ভাবে, তার নেই ঠিক! (টোটালাইজারের চাবি টিপিতে টিপিতে) টু···ওয়ান্···নট্ ওয়ান্···সিক্স্—উনি করছেন লোকের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা, আর আমাকে তার জন্যে গাধার খাটুনি খেটে মরতে হচ্ছে! কাজ তো করেছেন তিনি একটাই, কতকগুলো আবোল-তাবোল কথা দিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি করেছেন!

চুলোয় যাকগে সব, জাহান্নামে যাক্ ! তাঁর কাজ তো তিনি করে গেলেন—আমি এখন সারাদিন বসে বসে যন্তরে খটা-খট্ করি ! (কাজ করিতে করিতে) ওঃ—কাজে ঘেন্না ধরে গেল!···তাহলে হলো গিয়ে—এক···তিন···সাত···দুই···এক···শূন্য···! কিন্তু হুঁ হুঁ বাবা—মনে থাকে যেন—বলেছ, মাইনে বাড়িয়ে দেবে। সব যদি কায়দা মাফিক হয়ে যায়—শেয়ার হোল্ডারেরা যদি বোকা বনে, তাহলে আমার পনেরো টাকা ইন্‌ক্রীমেণ্টের কথা যেন মনে থাকে !···আচ্ছা, তাহলে হলো গিয়ে—(টোটালাইজারে কাজ করিতে করিতে)···কিন্তু রিপোর্টে কাজ না হলে, নালিশ চলবে না বাবা !···আমি মাথা গরম লোক, একবার ক্ষেপ্‌লে খুন পর্যন্ত করে ফেলতে পারি—হুঁ হুঁ বাবা—

[ঘরের বাহিরে কর্মচারীদের অভিবাদন জ্ঞাপন ও চেয়ারম্যান সমরেশ চৌধুরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

সমরেশ : (তখনও ঘরের বাহিরে) ধন্যবাদ ! আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ! আপনারা আমার বন্ধু, সহকর্মী—আজ এই যে আনন্দ অভিবাদন আপনাদের কাছ থেকে পেলাম, এ আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে—আমি আবার আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি—(ঘরে প্রবেশ করিয়া অক্ষয়বাবুর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন।)

অক্ষয় : (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) মে আই হ্যাভ্ দি অনর্ অফ্ কন্‌গ্রাচুলেটিং ইউ অন্ দি ফিফ্‌টিন্‌থ্ অ্যানিভারসারি অফ্ আওয়ার ব্যাঙ্ক অ্যাণ্ড্ অফ্ উইশিং ইউ—

সমরেশ : (অক্ষয়বাবুকে কথা শেষ করিতে না দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন) থ্যাঙ্ক্ ইউ মাই ডিয়ার অক্ষয়, থ্যাঙ্ক ইউ ! জানো অক্ষয়, আজ আমার কী যে আনন্দ হচ্ছে ! ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে একটা চুমু খাই—(অক্ষয়বাবুকে প্রায় চুম্বন করিলেন বলিয়াই মনে হইল। অক্ষয়কে ছাড়িয়া) না না, তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন অক্ষয় ! এ ক'দিন তুমি আমাব জন্যে কি পরিশ্রমটাই না করেছ···সত্যি বলছি অক্ষয়—

ভয়ানক ইচ্ছে করছে তোমায় একটা চুমু খাই—(অক্ষয়বাবু একটু দূরে সরিয়া গেলেন)—তবু তুমি তো সম্পর্কে আমার ভগ্নীপতি ! কিন্তু ব্যাঙ্কের আর সবাই ? ওরাও কি আমার জন্যে কম পরিশ্রম করেছে এ ক'দিন ! ওরা তো আর আমার ভগ্নীপতি নয় ! ঠিক কথা বলছি কিনা বলো অক্ষয় ? ভাবতে পারো অক্ষয়, ব্যাঙ্কের পনেরোটা বছর কেটে গেছে। আমি তো ভাবতে পারি না। একটার পর একটা বছর পড়েছে, আর মনে হয়েছে—এটা বোধ হয় আর কাটবে না ! সত্যি কেটেছে তো অক্ষয় ? দেখো অক্ষয়, আমার দিকে দেখো ! জোর করে বলতে পারো আমিই সমরেশ চৌধুরী ? (অক্ষয়বাবু ঘাড় নাড়িলেন) ঠিক অমনি জোর করে বলতে পারো ব্যাঙ্কের পনেরোটা বছর কেটে গেছে ? (অক্ষয়বাবু আবার ঘাড় নাড়িয়া হ্যাঁ বলিলেন) ব্যাস ব্যাস, তাহলে আর কোনো চিন্তা নেই ! তুমি যখন হ্যাঁ বলেছ অক্ষয়, তখন সত্যিই পনেরোটা বছর কেটে গেছে—(ব্যস্ত হইয়া)—হ্যাঁ ভালো কথা, আমার রিপোর্টের কতদূর ? বেশ এগুচ্ছে তো ?

অক্ষয় : আজ্ঞে হ্যাঁ—আর পাতা পাঁচেক বাকী আছে।

সমরেশ : বাঃ চমৎকার ! তাহলে তিনটে নাগাদ রেডি হয়ে যাবে—কি বলো ?

অক্ষয় : যদি কোনো গণ্ডগোল না হয়, তাহলে তিনটের মধ্যে নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যাবে। আর সামান্যই বাকী আছে।

সমরেশ : বাঃ চমৎকার ! (অক্ষয়ের দিকে চাহিয়া) সত্যি বলছ তো অক্ষয় ? (অক্ষয় ঘাড় নাড়িলে) তাহলে তো অতি চমৎকার অক্ষয়—অতি চমৎকার ! চারটেয় জেনারাল মিটিং ! তাহলে এক কাজ করো—যে ক'পাতা হয়েছে আমাকে দাও—একবার চোখ বুলিয়ে নিই—(ব্যস্ত স্বরে) কই দাও—দাও—(রিপোর্ট লইয়া) এই রিপোর্টের ওপর আমার সব কিছু নির্ভর করছে ! এ তো শুধু রিপোর্ট পড়া নয়—এ হবে আমার ফায়ার ওয়ার্ক ডিসপ্লে !

তুমি ভাবছ আমি বাড়িয়ে বলছি অক্ষয়! দেখো দেখো, আমার দিকে চেয়ে দেখো—(অক্ষয় দেখিলে) আমি সমরেশ চৌধুরী এটা সত্যি তো? (অক্ষয় ঘাড় নাড়িলে) তাহলে জেনো, এটাও সত্যি—এ রিপোর্ট আমার ফায়ার ওয়ার্ক ডিস্‌প্লে! চোখ ঝলসে দিয়ে যাবো একেবারে! (বসিয়া রিপোর্ট পড়িতে পড়িতে) শরীরটা বড়ো ক্লান্ত মনে হচ্ছে—বাতের ব্যথাটাও বেড়েছে কাল থেকে—তার ওপর সকাল থেকে ছুটোছুটি, দৌড়োদৌড়ি, এই সব মালা-টালা পরা, গলা কাঁপিয়ে বক্তৃতা দেওয়া আর ভালো লাগে! সত্যি বড়ো টায়ার্ড ফিল করছি অক্ষয়—বড়ো টায়ার্ড—

অক্ষয় : (লিখিতে লিখিতে) দুই-শূন্য-শূন্য-তিন নয়-দুই-শূন্য—কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না স্যার—শুধু দেখছি নম্বর—সবুজ কালিতে লেখা নম্বর সব সবুজ হয়ে চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছে—(টোটালাইজারের চাবি টিপিতে টিপিতে) এক-ছয়-চার-এক-পাঁচ—

সমরেশ : তার ওপর সকালে আবার এক বিশ্রী ব্যাপার। মালতী এসেছিল আমাদের বাড়ীতে—তোমার নামে নালিশ নিয়ে। কাল রাত্তিরে তোমার নাকি আবার মাথা খারাপের মতো হয়েছিল! তুমি নাকি একটা পেন্‌সিল-কাটা ছুরি নিয়ে তাকে তাড়া করেছিলে! এ রকম করলে কি করে চলে বলো?

অক্ষয় : (অপেক্ষাকৃত কঠোর স্বরে) অন্যদিন হলে হয়তো আমার সাহস হতো না স্যার! কিন্তু আজ আমাদের অ্যানিভারসারি বলেই সাহস করে একটা অনুরোধ করছি! দয়া করে আমার সংসারের কথাবার্তা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। আপিসের কাজে এ ক'দিন যে খাটুনিটা যাচ্ছে, অন্তত তার কথা ভেবেও আমাকে রেহাই দিন—দোহাই আপনার—!

সমরেশ : তুমি একেবারে ইম্‌পসিব্‌ল্‌ অক্ষয়! কিন্তু তুমি তো এধারে লোক খারাপ নও! তবে মেয়েদের সঙ্গে এরকম কালাপাহাড়ের মতো ব্যবহার করো কেন বলতে পারো? আমার তো কিছুতেই মাথায় আসে না—কেন তুমি মেয়েদের অত ঘেন্না করো?

অক্ষয় : আমারও একটা কথা কিছুতেই মাথায় আসে না স্যার—কেন আপনি মেয়েদের অত ভালবাসেন ? (অল্পক্ষণ দুইজনেই নিজের কাজে ব্যস্ত রহিলেন।)

সমরেশ : বুঝলে অক্ষয়—ডিরেক্টরেরা আজ পার্টিতে আমাকে একটা মানপত্র আর একটা রূপোর টি-সেট্ উপহার দেবে। বাইরের পাঁচজন লোকের সামনে—বেশ চমৎকার হবে ব্যাপারটা, কি বলো ? আর. কিছু হোক আর না হোক, এতে ক্ষতি তো কিছু হবে না ! আর তাছাড়া ব্যাঙ্কের রেপুটেশনের জন্যে এ-সবও একটু-আধটু দরকার ! আরে, তুমি তো ঘরের লোক, সব জানোই—ও মানপত্রও আমার লেখা, আর ও টি-সেট্ কেনবার টাকাও আমি দিয়েছি। কিন্তু কি করি বলো ? নিজে থেকে কোনো কিছু দেবার কথা তো তারা ভাবতেই পারে না ! (চারিদিক দেখিতে দেখিতে) এ ঘরের ফার্নিচারগুলো কি রকম কেনা হয়েছে বলো তো ? প্রত্যেকটা একেবারে বাছাই করা ! ওরা বলে এই সব ছোটো-খাটো জিনিস নিয়ে আমি বড়ো মাথা ঘামাই ! বলে আমার নজর খালি গেটের দরোয়ানের ওপর—লোকটা যাতে বেশ মোটা-সোটা হয়—আমার নজর খালি ডোর-হ্যাণ্ড্‌ল্‌য়ের ওপর, সেগুলো যাতে সব সময় ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে থাকে ! বলে নজর আমার এমপ্লয়িদের পোশাকের ওপর—তারা যাতে বেশ স্মার্টলি ড্রেস্‌ড্‌ হয়ে আপিসে আসে। কিন্তু তুমিই বলো অক্ষয়, এগুলো কি ছোটো-খাটো জিনিস ? বাড়িতে আমি যেমন তেমন করে থাকতে পারি—যা ইচ্ছে তাই করতে পারি—যেখানে সেখানে পড়ে শুয়োরের মতো খানিকটা ঘুমোতে পারি—মদ খেয়ে হৈ-হল্লা করতে পারি, কিন্তু তাই বলে—

অক্ষয় : একটা অনুরোধ স্যার ! দয়া করে গালাগাল করবেন না কাউকে।

সমরেশ : ওঃ তুমি সত্যিই একটা ইম্‌পসিবল্‌ লোক অক্ষয় ! আমি গালাগাল কাউকে করছি না ! আমি বলছি—বাড়িতে যাহোক

করে থাকলে চলে। কিন্তু এখানে প্রত্যেক ব্যাপারটার মধ্যে একটা পালিশ থাকা চাই! ভুলে যাও কেন এটা ব্যাঙ্ক! এখানে প্রত্যেকটা ছোটো-খাটো জিনিসের মধ্যেও একটা গুরু-গম্ভীর ভাব থাকা চাই! জানো অক্ষয়, আমার চেয়ারম্যানশিপের বিশেষত্ব কি? আমি এই ব্যাঙ্কের রেপুটেশনকে একটা হাই লেভেলে উঠিয়েছি। কিসে সবচেয়ে বেশী এসে যায় জানো অক্ষয়? প্রত্যেক জিনিসের সুর যেন উঁচু তারে বাঁধা থাকে। আর একটু বাদেই ডিরেক্টরদের ডেপুটেশন আসবে আর তুমি কিনা জামাটা পর্যন্ত পরে আসা প্রয়োজন মনে করোনি! পরে আছো একটা ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জী যার আসল রং বার করতে গেলে রীতিমত অঙ্ক কষতে হবে। অন্তত আজকের দিনের জন্যেও একটা শার্ট-টার্ট কিছু পরে আসতে পারতে তো!

অক্ষয় : আমি আমার দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যটা আপনার ডেপুটেশনের চেয়ে বড়ো মনে করি স্যার! গা-ময় আমার ছোটো ছোটো ফোড়া বেরিয়েছে।

সমরেশ : (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) তাহলেও এ কথাটা মানবে তো, এ ঘরে তোমাকে মোটেই খাপ খাচ্ছে না? সমস্ত এফেক্টটা তোমার জন্য স্পয়েল্ড হয়ে যাচ্ছে!

অক্ষয় : তাতে কিছু এসে যাবে না। তারা এলে আমি না হয় আলমারীর পাশে গিয়ে লুকোবো! (লিখিতে লিখিতে) সাত-এক-সাত-দুই-এক-পাঁচ-শূন্য—বেখাপ্পা জিনিস আমি নিজেই পছন্দ করি না—সাত-দুই-নয়—(চাবি টিপিতে টিপিতে)—বেখাপ্পা কিছু আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না! আজ আপনার বাড়ির পার্টিতে মেয়েদেয় নেমন্তন্ন না করলেই পারতেন!

সমরেশ : কি যা-তা বাজে বকছ!

অক্ষয় : বাজে নয়, বাজে নয়! আপনি কি ভাবছেন তা আমি জানি! ভাবছেন—শাড়ী, গয়না, আর মিহি গলার স্বর—এই তিনে মিলে চমৎকার একটা শো হবে! কিন্তু এই তিনে মিলে সব কিছু

আপসেট করে দিতে পারে, তা জানেন? জানেন যত নষ্টের মূল এই মেয়েরা?

সমরেশ : আমি তো জানি উল্টোটা। মেয়েরা মানুষকে অনেক উঁচুতে উঠিয়ে দেয়!

অক্ষয় : তাই নাকি! আর মই কেড়ে নিয়ে ধপাস করে ফেলে দেয় না? এই মিসেস চৌধুরীর কথাই ধরুন না। শোনা যায় তিনি নাকি বেশ বুদ্ধিমতী! এই তো সেদিন তিনি এমন একটা কথা বলে বসলেন, যার টাল সামলাতে আমার তু'দিন গেল? এক ঘর বাইরের লোক—তার মাঝে হঠাৎ তিনি এসে আমায় জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা শুনলাম, মিস্টার চৌধুরী আমাদের ব্যাঙ্কের হয়ে নবভারত প্লাসটিক্সের শেয়ার কেনার পরই, শেয়ারের দাম বাজারে পড়তে আরম্ভ করেছে? ক'দিন ধরেই দেখছি ওঁর মনটা ভার হয়ে রয়েছে—তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি—!—আপনিই বলুন না, এসব কথা কেউ বাইরের লোকের সামনে জিজ্ঞেস করে? আমি তো কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না—কেন আপনি মেয়েদের বিশ্বাস করে এসব কথা বলেন! এর জন্যে কোন্‌দিন না আপনাকে আদালতে দাঁড়াতে হয়!

সমরেশ ঃ ব্যাস ব্যাস ব্যাস! আজকের দিনে আর এসব কথা নয়! হ্যাঁ, ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ—(ঘড়ি দেখিয়া) অনিলার তো আসবার সময় হয়ে গেল—আমায় তো এখুনি একবার স্টেশনে যেতে হয়! কিন্তু যাই কখন—বড্ড টায়ার্ড! সত্যি কথা বলতে কি অক্ষয়—অনিলা এ সময় এখানে আসুক—এ ইচ্ছে আমার ছিলো না! তাই বলে ভেবো না, সে আসছে শুনে আমি বিরক্ত হয়েছি! কিন্তু তাহলেও আর তুটো দিন থেকে এলেই পারতো! সাড়ে সতেরো গণ্ডা ঝঞ্ঝাট বাড়লো! সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ, হেন-তেন! আজ আবার মিসেস মিত্রকে কথা দিয়েছিলাম খাওয়া দাওয়ার পর একটু—অক্ষয় আমি খুব নার্ভাস ফিল্ করছি —মনে হচ্ছে, আর একটু বাদেই আমার দেহটা ফেটে চৌচির হয়ে

যাবে! অক্ষয়, এরকম হওয়া তো উচিৎ নয়! আজ একটা অ্যানিভারসারির ব্যাপার, এতো নার্ভাস হলে চলবে কেন?

[পিছনের দরজা দিয়া অনিলা চৌধুরীর প্রবেশ]

সমরেশ ঃ এই যে অনিলা, তোমার কথাই হচ্ছিল—(ঘড়ি দেখিলেন।)

অনিলা : সত্যি! আমার কথা হচ্ছিল? আমাকে তাহলে খুব মিস্ করছিলে বলো! শরীর-টরীর ভালো তো? আমারও স্টেশনে নেমেই তোমার কথা মনে হলো। জানি তুমি এখন এখানে—তাই তো মাল-পত্তর বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে সোজা এখানেই চলে এলাম (অনিলা দেবী কথা বলেন খুব তাড়াতাড়ি, মনে হয় যেন এক নিঃশ্বাসে সব কথা বলিয়া ফেলিতে চান) কত যে কথা আছে বলবার তার আর ঠিক নেই! আমার আর সবুর সইছে না! (অক্ষয়কে ব্যস্ত হইতে দেখিয়া) না-না অক্ষয়, ব্যস্ত হতে হবে না, —এক্ষুনি চলে যাবো। ভালো আছো অক্ষয়? মালু কেমন আছে—ভালো তো? (সমরেশকে) বাড়ির সব ভালো তো?

সমরেশ ঃ ক'দিনেই তোমার শরীরটা একটু সেরেছে দেখছি। ভালোই ছিলে তাহলে সেখানে, কি বলো?

অনিলা : চমৎকার! মা আর সুনীলা তোমার কথা বার বার জিজ্ঞেস করেছে—পিসিমা তোমার জন্যে জেলি তৈরি করে পাঠিয়েছে। সক্কলের তোমার ওপর খুব রাগ—চিঠি-পত্তর দাও না বলে! ওখানে যেসব কাণ্ড হচ্ছে, তা যদি জানতে! ওঃ সে কী সব কাণ্ড! আমার বলতেই ভয় করছে—কী সব ব্যাপার! কিন্তু ব্যাপার কি বলো তো? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আমাকে এখানে দেখে খুব খুশি হওনি—

সমরেশ : খুশি হইনি!—কি যে বলো তুমি! তাই কখনো আবার হয় না-কি! (ক্রুদ্ধ অক্ষয়ের গলা খাঁকারি শোনা গেল।)

অনিলা : (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সুনীলাটার কথা ভেবে মনে আমার এতটুকু শান্তি নেই! বেচারী!

সমরেশ : অনিলা আজ আমাদের ব্যাঙ্কের ফিফটিন্থ অ্যানিভারসারি।

এক্ষুনি এ ঘরে ডিরেক্টরদের ডেপুটেশন আসবে—এ সময়, এই জামা-কাপড় মানে বলছিলাম কি একেবারে স্টেশন থেকে সোজা এখানে এসেছ—

অনিলা: ও নিশ্চয়! আজ ফিফটিন্‌থ অ্যানিভারসারি। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স! খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা রাত্তিরে করেছ তো? চমৎকার! ভালো কথা, মনে আছে—তুমি সেই সুন্দর স্পীচটা লিখেছিলে ওদের জন্যে! বড্ড সময় নিয়েছিলো কিন্তু—(অক্ষয়ের গলা খাঁকারি।)

সমরেশ: (কুণ্ঠিত স্বরে) মানে এসব কথা এখানে বলাটা ঠিক নয় অনিলা, মানে আমি বলছিলাম কি—তুমি এই এলে, এখন বাড়ি গিয়ে বিশ্রামটিশ্রাম—মানে রাত্তিরে আবার—

অনিলা: আরে এখুনি যাচ্ছি। তোমায় সমস্ত ব্যাপারটা বলতে আমার এক মিনিটও লাগবে না! তাহলে গোড়া থেকে বলি শোনো। তোমার মনে আছে নিশ্চয়, তুমি আমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে এলে। আমার পাশে বসেছিলেন এক স্থূলাঙ্গী ভদ্রমহিলা, মনে আছে নিশ্চয়? তুমি তো জানো, আমি বেশী কথা-টথা বলতে ভালবাসি না। গোটা তিন-চার স্টেশন চুপচাপ কেটে গেল! তারপর মনে আসতে আরম্ভ করলো যত রাজ্যের কুচিন্তা! একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি সামনে বসে আছে একটি ছেলে—সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছে বলেই মনে হলো। একটু বাদে আর একটি ছেলে এসে বসলো—দেখে মনে হলো স্টুডেন্ট। তাদের ধারণা আমার বয়স নাকি পঁচিশের বেশী নয়! কম আলোয় ভালো করে দেখাও যাচ্ছিল না কিছু। আমি আবার বললাম—আমার বিয়ে হয়নি। তারপর সেই রাত বারোটা অবধি কী মজার মজার গল্প! হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার যোগাড়। শেষকালে আবার দু'জনে পালা করে আমাকে গান শোনাতে আরম্ভ করলে! (হাসিতে হাসিতে) ভাগ্যিস ভোর রাতে নেমে গেল, নইলে জানতে পেরে যেতো, আমার বয়স পঁয়ত্রিশ, বিয়ে

হয়ে গেছে অনেক কাজ। সমস্ত এফেক্টটাই তাহলে নষ্ট হয়ে যেতো !

(ক্রুদ্ধ অক্ষয়ের গলা খাঁকারি আবার শোনা গেল।)

সমরেশ : অনিলা, এখানে অক্ষয়ের কাজের ক্ষতি হচ্ছে। এখন বাড়ি যাও লক্ষ্মীটি, পরে সব শুনব'খন—

অনিলা : আরে তাতে কি হয়েছে ! অক্ষয়ও শুনুক না—এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে ! বুঝলে অক্ষয়, ভারী ইণ্টারেস্টিং ! স্টেশনে দেখি কল্যাণ গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। সেদিন ওয়েদারও ছিলো চমৎকার—(এমন সময় বাহিরে গোলমাল শোনা গেল—ভেতরে যাবেন না—ভেতরে যাওয়া বারণ—কি চাই আপনার—বাহির হইতে কাদম্বিনী দেবীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কেন আটকাবার চেষ্টা করছেন আমাকে, আমাকে আটকাতে আপনারা পারবেন না—মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে—)

কাদম্বিনী : (ঘরের ভিতরে আসিয়া সমরেশকে নমস্কার করিয়া) আপনিই মিঃ চৌধুরী তো ? (ব্যাকুল স্বরে) বড়ো বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি ! আমার নাম কাদম্বিনী গাঙ্গুলী—সুরেন গাঙ্গুলীর স্ত্রী—

সমরেশ : কি চাই আপনার ?

কাদম্বিনী : মানে—ব্যাপারটা হচ্ছে এই, আমার স্বামী সুরেন গাঙ্গুলী জয়হিন্দ ইন্‌সিওরেন্সে কাজ করতেন। আজ সাত মাস তিনি অসুখে শুয়ে—এরই মধ্যে কোম্পানী তাঁকে বিনা কারণে ছাঁটাই করে। তারপর আমি যখন তাঁর আপিসে মাইনে আনতে গেলাম তখন দেখি চব্বিশ টাকা ছ'আনা কম ! জিজ্ঞেস করলাম, কেন ? বললে, ওঁর নাকি টাকাটা আপিসে ধার ছিলো। কিন্তু তা কি করে হবে মিস্টার চৌধুরী ? আজ অবধি আমাকে না জানিয়ে এক পয়সাও উনি ধার করেন নি আর একেবারে চব্বিশ টাকা ছ'আনা এ কি করে সম্ভব ! আপনিই বলুন—আপিসের কি এটা করা

উচিৎ হয়েছে ? তাই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি মিস্টার চৌধুরী ! একে গরীব তায় মেয়েছেলে। আমাদের দেখবার শোনবার কেউ নেই ! বাড়ি ভাড়ার আয়ে কোনো রকমে সংসার চলে ! স্বামীর কাছ থেকে পর্যন্ত একটা মিষ্টি কথা কখনও শুনিনি—আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই মিস্টার চৌধুরী—এ টাকাটা আপনাকে উদ্ধার করে দিতেই হবে—(একখানি আবেদনপত্র বাড়াইয়া দিলেন। সমরেশবাবু আবেদনপত্র গ্রহণ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।)

অনিলা : (ততক্ষণে অক্ষয়বাবুকে লইয়া পড়িয়াছেন) তাহলে ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলি, শোনো অক্ষয় ! গেল সপ্তার আগের সপ্তায় মার কাছ থেকে চিঠি পেলাম। সোমেন বলে একটি ছেলে নাকি সুনীলাকে ভালবাসে, বিয়ের প্রস্তাবও নাকি করেছে। ছেলেটি এমনিতে ভালো, কিন্তু টাকা পয়সা মোটে নেই ! সুনীলাও নাকি তাকে বড্ড ভালবেসে ফেলেছে। তাই মা আমাকে লিখেছিলেন, আমি যদি গিয়ে সুনীলাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে—

অক্ষয় : (কঠোর স্বরে) মাফ করবেন, আপনি আমার হিসেবে সব গোলমাল করে দিলেন ! এদিকে হিসেবের অঙ্ক, আর ওদিকে আপনি, আপনার মা, সুনীলা দেবী-কে-কোথায়-কবে-কার সঙ্গে আমার তো সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল !

অনিলা : হোক গোলমাল হিসেবে ! হিসেবে গোলমাল হলে কিচ্ছু এসে যাবে না ! কোনো ভদ্রমহিলা যখন কথা বলেন, তখন তাঁর কথা ভালো করে শুনতে হয় বুঝলে ! আচ্ছা অক্ষয় তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো ? এতো ক্ষেপে রয়েছ কেন ? কারো প্রেমে-টেমে পড়ে গেছ নাকি ? (হাসিয়া উঠিলেন।)

সমরেশ : (কাদম্বিনীকে) মাফ করবেন, এ-সব কি ব্যাপার ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না !

অনিলা : কি অক্ষয়—সত্যি সত্যি কারো প্রেমে পড়েছো নাকি ? এই দেখো তোমার যে কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠলো !

সমরেশ : অনিলা লক্ষ্মীটি, তুমি একটু ও ঘরে যাও তো, এক মিনিট—আমি এক্ষুনি আসছি—

অনিলা : তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু—(অনিলা দেবীর প্রস্থান ।)

সমরেশ : দেখুন মিসেস গাঙ্গুলী, আমি তো এর বিন্দু-বিসর্গ কিছু বুঝতে পারছি না। তবে আপনি যে জায়গা ভুল করেছেন—একথাটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এ আবেদন-পত্রের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই। আপনার স্বামী কাজ করতেন যে ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে—আবেদন-পত্র আপনার সেখানেই পাঠানো উচিৎ !

কাদম্বিনী : কিন্তু আমি পাঁচ জায়গায় ঘুরে তবে এখানে এসেছি। কেউ আমার দরখাস্ত পড়ে পর্যন্ত দেখেনি। কি যে করবো তাই ভাবছিলাম। শেষকালে আমার জামাই বললে—জামাইটি কিন্তু আমার বেশ ভালো হয়েছে, বুঝলেন সমরেশবাবু—হ্যাঁ তা সেই জামাই আমাকে বললে—মা, আপনি সমরেশ চৌধুরীর কাছে যান, তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, তিনি ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন। দোহাই আপনার মিস্টার চৌধুরী, আমাকে দয়া করে সাহায্য করুন !

সমরেশ : আপনি বিশ্বাস করুন মিসেস গাঙ্গুলী, এ ব্যাপারে আমি কিছুই করতে পারি না। আপনি দয়া করে বুঝতে চেষ্টা করুন, আপনার স্বামী কাজ করতেন ইন্‌সিওরেন্সে, জয়হিন্দ ইন্‌সিওরেন্স, আর এটা হচ্ছে বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ! এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা ?

কাদম্বিনী : আপনি হয়তো আমার স্বামীর অসুখের কথাটা বিশ্বাস করছেন না মিস্টার চৌধুরী—কিন্তু আমার কাছে ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে ! এই দেখুন, আপনি যদি দয়া করে একবার পড়ে দেখেন—

সমরেশ : (বিরক্ত হইয়া) বাঃ চমৎকার ! কে বললে আমি আপনার কথা অবিশ্বাস করছি ! কিন্তু বিশ্বাস করুন এ-সবের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই ! (অনিলা দেবীর হাসির শব্দ শোনা গেল)

এই দেখো, ওঘরে অনিলা আবার ওদের কাজে ডিসটার্ব করছে! (কাদম্বিনী দেবীকে) যত সব অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা, এসবের কোনো মানে হয়? কোথায় আবেদনপত্র পাঠাতে হয়, তাও কি আপনার স্বামী জানেন না?

কাদম্বিনী: আমার স্বামী কিছুই জানেন না, মিস্টার চৌধুরী! তাঁকে জিজ্ঞেস করতে গেলেই তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন—তোমার ওসব খোঁজে দরকার কি? বেরোও সামনে থেকে!

সমরেশ: কিন্তু মিসেস গাঙ্গুলী—আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন, আপনার স্বামী কাজ করতেন জয়হিন্দ ইন্‌সিওরেন্সে আর এটা ব্যাঙ্ক, বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক—

কাদম্বিনী: আমি সব বুঝেছি মিস্টার চৌধুরী—এখন আপনি বললেই হয়! আপনি দয়া করে ওদের বলে দিন আমার টাকাটা দিয়ে দিতে! একবারে না পারে ত্ব-বারে দিক—

সমরেশ: (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ওঃ—।

অক্ষয়: কিন্তু স্থার, এভাবে এগুলে রিপোর্ট কোনো দিনই শেষ হবে না!

সমরেশ: আর এক মিনিট অক্ষয়! (কাদম্বিনী দেবীকে) আমার মনে হচ্ছে আপনি এখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি! আমাদের তরফ থেকে জয়হিন্দ ইন্‌সিওরেন্সকে অনুরোধ করার কোনো মানেই হয় না! এ সেই কি রকম হলো জানেন? আপনার স্বামী আপনার ওপর অত্যাচার করেন। আপনার নালিশ করবার কথা আদালতে—তা না গিয়ে আপনি এলেন কিনা এক ওষুধের দোকানে নালিশ জানাতে! (দরজার বিপরীত দিক হইতে অনিলা দেবীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আমি কি ভেতরে আসতে পারি?)

সমরেশ: (প্রায় চিৎকার করিয়া) একটু অপেক্ষা করো অনিলা, এক মিনিট—আমি এক্ষুনি আসছি! (কাদম্বিনী দেবীকে) আপনি আপনার স্বামীর পুরো মাইনেটা পান নি, কিন্তু তার জন্যে আমরা কি করতে পারি বলুন? তাছাড়া মিসেস গাঙ্গুলী, আজ আমাদের

ব্যাঙ্কের ফিফ্‌টিন্‌থ্‌ অ্যানিভারসারি—মানে পঞ্চদশ বার্ষিকী, আমরা সকলেই খুব ব্যস্ত!—যে কোনো মুহূর্তে কেউ না কেউ এসে পড়তে পারে—দয়া করে আজকের দিনটা আমাদের ছেড়ে দিন—

কাদম্বিনী : সমরেশবাবু, দয়া করে আমার দিকে চেয়ে দেখুন! আমি অনাথা, দুর্বল—অসহায়, আমাকে দেখবার কেউ নেই! সকাল থেকে কতো ঘুরেছি—বড়ো ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে—মনে হচ্ছে, আমি বোধহয় এখুনি মারা যাবো! কতো কাজ আমাকে করতে হয় জানেন? ভাড়া আদায়ের জন্যে আদালতে ছোটাছুটি, স্বামীর মাইনে আদায়ের জন্যে আপিসে ছোটাছুটি, বাড়ি-ঘর-দোর দেখাশুনো—তার ওপর আবার জামাইটির আমার চাকরি নেই—

সমরেশ : দেখুন মিসেস গাঙ্গুলী, আমি—মানে—না, আপনি আমায় মাফ করুন—আমার আর কথা বলার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই! আমার মাথার ভেতর সব যেন ঘুরছে!—মানে—আপনি যে আমাদেরই শুধু ডিসটার্ব করছেন তা নয়, নিজেরও সময় নষ্ট করছেন!—(আপন মনে) ওঃ কী মোটা মাথা! কি হলো? কথাটা মিথ্যে? মোটেই নয়! এ মাথা যদি মোটা না হয় তো আমার নাম সমরেশ চৌধুরীই নয়! (কাতরস্বরে অক্ষয়কে) ও অক্ষয়, দোহাই তোমার! এঁকে একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দাও না! আমি যে আর পারছি না···(অসহায়ের ন্যায় মুখভঙ্গি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।)

অক্ষয় : (কাদম্বিনী দেবীর নিকট আসিয়া কঠোর স্বরে) আপনার কি চাই?

কাদম্বিনী : আমি বড়ো দুর্বল, বড়ো অসহায়! আমাকে দেখলে মোটা-মোটা বলে মনে হতে পারে—কিন্তু বিশ্বাস করুন—আমাকে কেটে টুকুরো টুকরো করে যদি প্রত্যেকটা টুকরো আপনি এগ্‌জামিন্‌ করে দেখেন, তাহলে তার মধ্যে ভালো থাকার চিহ্নটুকুও খুঁজে পাবেন না! আপনি বিশ্বাস করুন, দু'পায়ে ভর দিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার মতো ক্ষমতাও আমার নেই! দু'টি বেলা আমার

একেবারে ক্ষিদে হয় না তা জানেন? বিশ্বাস করবেন—সকাল থেকে শুধু খানিকটা চা খেয়ে আছি? বিশ্বাস করুন—সে-চাটুকুও আমার ভালো লাগেনি!

অক্ষয়: আমি আপনাকে একটাই প্রশ্ন করেছি—আপনি কি চান?

কাদম্বিনী: দয়া করে ওদের বলে দিন, আমায় অন্তত পনেরোটা টাকা দিতে! বাকী ন'টাকা ছ'আনা আমি না হয় ওমাসে এসে নিয়ে যাবো!

অক্ষয়: কিন্তু আপনাকে তো পরিষ্কার বলে দেওয়া হলো—এটা জয়-হিন্দ্ ইনসিওরেন্স্ নয়—এটা বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক।

কাদম্বিনী: নিশ্চয়—একশোবার! যদি দরকার মনে করেন—আমি আপনাকে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাচ্ছি—

অক্ষয়: আচ্ছা, আপনার কাঁধের ওপর মাথা বলে কোনো জিনিস আছে, না নেই!

কাদম্বিনী: দয়া করে আমার কথাটা শুনুন। আপনার কাছে অন্যায় কিছু চাইছি কি? আইন-মাফিক আমার যা পাওনা, তাই চাইছি! এক পয়সাও বেশী দিতে বলছি কি আপনাকে?

অক্ষয়: ছোট্ট একটা কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে—উত্তর দেবেন দয়া করে? আপনার কাঁধের ওপর যেটা রয়েছে, ওটা মাথা না অন্য কিছু? বোধহয় অন্য কিছুই হবে, কি বলেন? (হঠাৎ চিৎকার করিয়া) যাক্‌গে, মরুকগে, চুলোয় যাক্, জাহান্নামে যাক্! আপনার সঙ্গে কথা কইবার আমার সময় নেই—আমি ব্যস্ত! (দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) যান—!

কাদম্বিনী: (বিস্মিত হইয়া) কিন্তু আমার টাকা?

অক্ষয়: আসল ব্যাপারটা কি বুঝতে পারেন নি এখনও? শুনবেন? শুনুন তাহলে—(কাদম্বিনী দেবীর নিকট আসিয়া চিৎকার করিয়া) আপনার হেডে মাথা বলে কোনো বস্তু নেই! কি আছে জানেন? (টেবিল ঠুকিয়া)—কাঠ, বুঝতে পারলেন—কাঠ!

কাদম্বিনী: (ক্ষুব্ধ হইয়া) তাই নাকি! দেখুন—আপনি দয়া করে

নিজের চরকায় তেল দিন! আর তেল যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তো ঘরে যান—সেখানে নিজের বউ আছে—তার সঙ্গে চোট-পাট করুন গিয়ে! আমার স্বামী আপনার চেয়ে ঢের বড়ো আপিসে চাকরি করতেন! খবর্দার, আপনি আমার সঙ্গে ওভাবে কথা কইবেন না!

অক্ষয় : (ক্রুদ্ধ অথচ মৃদুস্বরে) আপনি যদি এই মুহূর্তে চলে না যান তো আমি দরোয়ান ডাকতে বাধ্য হবো! (মেঝেয় পা ঠুকিয়া) যান—বেরিয়ে যান—!

কাদম্বিনী : (কোমরে কাপড় জড়াইয়া) আস্তে কথা বলো! এ্যাঃ— উনি চেঁচিয়ে কথা বললেন আর আমি ভয়ে মরে গেলাম আর কি! তোমার মতো অনেক কেরানী আমার দেখা আছে—বিষ নেই, আর কুলোপানা চক্কোর!

অক্ষয় : ওঃ—মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না একেবারে! কী বিশ্রী! মেয়েছেলে এতো বিশ্রী হয়! চোখে চোখ পড়লে রাগে সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে একেবারে! দেখো, ভালো হবে না বলছি! এখান থেকে এক্ষুনি যদি চলে না যাও তো আমি তোমাকে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেবো! কোথাকার একটা বুড়ী বজ্জাত মেয়ে-মানুষ! আমি রাগলে কিন্তু কারো নই বলে দিলাম—মেরে একেবারে জন্মের মতো প্যারালিসিস্ করে রেখে দেবো! বেরোও বলছি— নইলে কিচ্ছু বলা যায় না—খুন পর্যন্ত করে ফেলতে পারি!

কাদম্বিনী : তোমার মতো অনেক কুকুর আমার দেখা আছে! কামড়াবার নেই ক্ষমতা—খালি ঘেউ ঘেউ! ভেবেছেন ওঁর চোখ-রাঙানীতে আমি থেমে যাবো! মরে যাই আর কি?

অক্ষয় : (হাত দিয়া চোখ ঢাকিয়া) নাঃ—মুখের দিকে তাকানো পর্যন্ত যাচ্ছে না! তাকালেই গা বমি বমি করছে! কী বজ্জাত মেয়েমানুষ বাবা—(হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া) তখনই বলেছিলাম—তা আমার কথা শুনলে তবে তো! আপিসে মেয়েছেলে, বাড়িতে মেয়েছেলে—(চিৎকার করিয়া) এখন আমি

রিপোর্ট শেষ করি কি করে, সেটা কেউ বলে দিয়ে যাক্ আমাকে !

কাদম্বিনী : ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে দেখো ! আমি যেন অন্য কারো জিনিস চাইছি ! আমি কি বলেছি—আমার পাওনার চেয়ে এক পয়সা বেশী আমাকে দাও ! নিলজ্জ বেহায়া কোথাকার ! গেঞ্জী পরে গুণ্ডার মতো আপিসে বসে রয়েছে ! ষাঁড় কোথাকার (সমরেশ ও পিছনে কথা বলিতে বলিতে অনিলা দেবীর প্রবেশ ।)

অনিলা : সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ছিলো রজত সেনের বাড়ি টি-পার্টি । সুনীলা পরেছিলো লেশের ব্লাউজ আর সবুজ রঙের শাড়ি ! চুলটা একটু ওপরে তুলে বেঁধে দিয়েছিলাম, কী চমৎকার মানিয়েছিল সুনীলাকে কি বলবো !

সমরেশ : নিশ্চয় নিশ্চয় ! বড়ো চমৎকার মানিয়েছিলো ! —অনিলা এক্ষুনি কেউ যদি এসে পড়ে—

কাদম্বিনী : সমরেশবাবু !

সমরেশ : (কাদম্বিনী দেবীর দিকে চোখ পড়িতে হতাশ দৃষ্টিতে) আপনি এখনও যান নি ? আবার কি চাই আপনার ?

কাদম্বিনী : (অক্ষয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) এই লোকটা— টেবিল ঠুকে বলে কিনা আমার মাথায় কাঠ আছে ! আপনি ওকে বলে গেলেন—আমার একটা ব্যবস্থা করতে ! আর ও কিনা আমায় যা নয় তাই বলে গলাগালি দিতে আরম্ভ করলে—আমাকে অসহায় পেয়ে বলে কিনা আমার হেডে মাথা নেই !

সমরেশ : ভালো কথা মিসেস গাঙ্গুলী ! আপনি এখন যান—আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—আমি খোঁজ নিয়ে দেখবো, কেন অক্ষয় আপনাকে ওসব কথা বলেছে ।···আপনি বরং দু'একদিন বাদে আসবেন···(মৃদুস্বরে) ওঃ কী সংঘাতিক বাতের যন্ত্রণা হচ্ছে !

অক্ষয় : (সমরেশের নিকট আসিয়া মৃদুস্বরে) আমায় পারমিশন দিন স্যার, দরোয়ান ডেকে ওটাকে বার করে দিই ! নইলে এ একটা ইম্‌পসিব্‌ল্ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে !

সমরেশ : (সন্ত্রস্ত হইয়া, মৃদুস্বরে) না না, তাহলে বুড়ী এক্ষুনি চেঁচাতে

আরম্ভ করবে! চারধার থেকে লোকজন ছুটে আসবে! কেলেঙ্কারির একশেষ হবে তখন!

অক্ষয়: (কাঁদো কাঁদো অবস্থায়) কিন্তু আমাকে যে রিপোর্ট শেষ করতে হবে তিনটের মধ্যে। কী করে হবে, সেটা বলে দিন?

কাদম্বিনী: তাহলে সমরেশবাবু দয়া করে বলে দিন টাকাটা কখন পাচ্ছি? আমার কিন্তু দরকার এক্ষুনি—

সমরেশ: (মৃদুস্বরে) ওঃ বুড়ীকে দেখতে কী কুৎসিত! (কাদম্বিনী দেবীকে মৃদু এবং শান্ত কণ্ঠস্বরে) দেখুন মিসেস গাঙ্গুলী, আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, আমাদের এটা ইন্‌সিওরেন্স নয়, ব্যাঙ্ক—

কাদম্বিনী: আমার ওপর একটু দয়া করুন সমরেশবাবু—ভেবে দেখুন, আমাকে দেখবার কেউ নেই—অসহায়, অনাথা স্ত্রীলোক! আপনি যদি বলেন, ডাক্তারের সার্টিফিকেটে হবে না, আমি থানা থেকে সার্টিফিকেট এনে দিচ্ছি। আপনি শুধু দয়া করে আমায় টাকাটা দিয়ে দিতে বলুন!

সমরেশ: ওঃ!

অনিলা: আচ্ছা, এরা কেউ আপনাকে বলেনি, আপনি এদের কাজে ব্যাঘাত করছেন? আপনি তো আশ্চর্য মেয়েমানুষ!

কাদম্বিনী: আমার এ বিপদে সত্যিই দেখবার কেউ নেই মিসেস চৌধুরী! সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন—আমি খেয়ে স্বাদ পাই না, ঘুমিয়ে আরাম পাই না, আমার শোয়া বসা সব ঘুচে গেছে! আপনি বিশ্বাস করুন, আজ সকালে খানিকটা চা খেয়েছিলাম, সে চাটুকুও আমার ভালো লাগেনি!

সমরেশ: (ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌছাইয়া) কতো চাইছেন আপনি?

কাদম্বিনী: চব্বিশ টাকা ছ'আনা—

সমরেশ: বেশ (ব্যাগ হইতে পঁচিশ টাকা বাহির করিয়া কাদম্বিনী দেবীর হাতে দিলেন) এই নিন্ পঁচিশ টাকা, এখন দয়া করে এখান থেকে যান, আমাকে রেহাই দিন! (আসিয়া চেয়ারে বসিলেন।

ক্রুদ্ধ অক্ষয়েরর গলা খাঁকারি শোনা গেল।)

কাদম্বিনী : টাকাটা পাইয়ে দিয়ে সত্যিই আমার বড়ো উপকার করলেন সমরেশবাবু। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!

অনিলা : (সমরেশবাবুর পাশের চেয়ারে বসিয়া, হাত ঘড়ির দিকে দেখিয়া) নাঃ আর থাকা চলে না—কিন্তু গল্পটা যে এখন শেষ হয়নি! শেষ করেই যাই—কি বলো? বেশী নয়, মিনিটখানেক লাগবে। ওঃ ওখানে কি সব ব্যাপার বুঝলে! তার পর তো যাওয়া হলো রজত সেনের বাড়ি। খাওয়া-দাওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছিলো! সুনীলার লাভার সোমেন—সেও ছিলো ওখানে। সুনীলাকে আমি আবার আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বোঝাই, দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলি! সুনীলা রাজী হয়। ওখানেই সোমেনকে ডেকে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সমস্ত পাট চুকিয়ে আমি ভাবলাম যাক্, সব ঠিক হয়ে গেল! মা খুশি হলেন, সুনীলাটাও বেঁচে গেল—আমিও তাহলে এবার একটু হাঁফ ছাড়তে পারবো! তারপর কি হলো জানো? চা-টা খেয়ে বাগানে বেড়াচ্ছি এমন সময়—(হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া) এমন সময় বাগানের কোণের খালি ঘরটা থেকে গুলির আওয়াজ!

সমরেশ : ওঃ!

অনিলা : ছুটে গেলাম সেখানে, গিয়ে দেখি সোমেন মেঝেয় পড়ে আছে। তার হাতে পিস্তল!

সমরেশ : নাঃ, এ অসহ্য হয়ে উঠেছে! (হঠাৎ কাদম্বিনী দেবীকে দেখিতে পাইয়া) আপনি এখনও এখানে? আবার কি চান আপনি?

কাদম্বিনী : সমরেশবাবু! যদি দয়া করে আমার স্বামীকে চাকরিটা আবার পাইয়ে দেন!

অনিলা : (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম) সোজা নিজের বুক লক্ষ্য করে গুলি করেছে। সুনীলা তো সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে গেল! ছেলেটারও কী ভয়, দু'চোখ ভর্তি জল! নিজেই ডাক্তার ডাকতে

বললে দু'টি হাত জোড় করে! ডাক্তার, বদ্যি, ছুটো-ছুটি! ডাক্তার এসে ভাগ্যিস বললে, গুলিটা বুকের আধ হাত ওপর দিয়ে গেছে! নইলে হয়েছিলো আর কি!

কাদম্বিনী : বড়ো উপকার হয় সমরেশবাবু, যদি আমার স্বামীকে চাকরিটা আবার পাইয়ে দেন—

সমরেশ : (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবেন এইরূপ অবস্থায় অক্ষয়ের নিকট আসিয়া দুই হাত জোড় করিয়া) এ আর সহ্য হচ্ছে না অক্ষয়, যা হোক করে ওটাকে বার করে দাও, যেমন করে পারো!

অক্ষয় : (সোজা অনিলার নিকট আসিয়া) বেরোও এখান থেকে!

সমরেশ : না-না, ওকে নয়—ওটাকে, ওই বুড়ীটাকে—(কাদম্বিনী দেবীর দিকে ইঙ্গিত করিলেন। অক্ষয়বাবুর মুখ দেখিয়া স্পষ্টই মনে হইল, তিনি সমরেশবাবুর কথা বুঝিতে পারেন নাই।)

অক্ষয় : (অনিলা দেবীকে) বেরোও শিগ্‌গির এখান থেকে! (মেঝেতে পা ঠুকিয়া) বেরোও বলছি!

অনিলা : (ভীত স্বরে) অক্ষয়, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! এসব কি বলছো তুমি?

অক্ষয় : (অনিলা দেবীকে) বেরোও বলছি এখান থেকে! নইলে একেবারে জন্মের মতো পঙ্গু করে দেবো! খড়-কুচো করে ছেড়ে দেবো! বোরোও শিগ্‌গীর, নয়তো যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসবো!

অনিলা : (চেয়ার হইতে উঠিয়া, অক্ষয়ের নিকট হইতে দৌড়াইয়া পলাইতে পলাইতে) তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়! অসভ্য, অভদ্র, বেয়াদব কোথাকার—(পিছনে অক্ষয়কে আসিতে দেখিয়া, ছুটিতে ছুটিতে) সমরেশ আমাকে বাঁচাও—(ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিলেন) সমরেশ!

সমরেশ : (অক্ষয়বাবুর পিছনে পিছনে) অক্ষয়, দোহাই তোমার, এবার থামো! আমি জোড়হাত করে বলছি তোমাদের—একটু চুপ করো! ওঃ, মান-ইজ্জত সব গেল!

অক্ষয় : (এতক্ষণে কাদম্বিনী দেবীকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার পিছনে

ছুটিতে ছুটিতে) বেরোও এখান থেকে, বেরোও বলছি ! এই—কে আছিস, ধর্ তো ওটাকে ! মেরে মোণ্ডা বানিয়ে ছেড়ে দেবো ! ঘুঁষিয়ে দলা পাকিয়ে রেখে দেবো একেবারে !

সমরেশ : অক্ষয়, দোহাই তোমার। আমি হাত জোড় করছি ! এইবার থামো অক্ষয়।

কাদম্বিনী : (ঘরময় ছুটিতে ছুটিতে) সমরেশবাবু, লোকটার মাথা খারাপ ! দোহাই আপনার, আমাকে পাগলের হাত থেকে বাঁচান ! ও যদি কামড়ে দেয়, তাহলে আমি আর বাঁচবো না। নারায়ণ, শ্রীমধুসূদন, পাগলের হাত থেকে বাঁচাও, রক্ষে করো প্রভু !—(অনিলা চিৎকার করিয়া) কে কোথায় আছো, বাঁচাও ! নইলে আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো ! (একটি চেয়ারের উপর লাফাইয়া উঠিয়া, সেখান হইতে একটি সোফার উপর লাফাইয়া পড়িলেন) ওগো শুনছো, আমি বোধহয় সত্যি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি, শুনছো (এই কথা বলিতে বলিতে অর্ধ-মূর্ছিতের ন্যায় সোফার উপর বসিয়া পড়িলেন।)

অক্ষয় : (কাদম্বিনী দেবীর পিছন পিছন) মেরে ফেলে দেবো ! কেটে ফেলে দেবো ! ছাল ছাড়িয়ে আনবো !

কাদম্বিনী : ভগবান রক্ষে করো ! ওগো আমার চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে আসছে যে—(এই কথা বলিতে বলিতে সমরেশ-বাবুকেই একমাত্র আশ্রয় ভাবিয়া, তাঁহার বুকের উপর প্রায় অর্ধ-মূর্ছিতের ন্যায় হেলিয়া পড়িলেন। দরজার বাহিরে মিলিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ডেপুটেশন্-ডেপুটেশন্ !)

সমরেশ ঃ (তাঁহার অবস্থা প্রায় পাগলের মতো। আবোল-তাবোল বকিতেছেন) ডেপুটেশন্—না না ডেপুটেশন্ তো নয়, রেপুটেশন্ —অ্যাঁঃ রেপুটেশন্ কে বললে—অকুপেশন্—

অক্ষয় : (তখনও মেঝেয় পা ঠুকিতেছেন) বেরোও—বেরোও বলছি এখান থেকে ! তবে রে তোর নিকুচি করেছে—(জামার আস্তিন গুটাইয়া) একবার ধরতে পারি তোমায় ! খুন করে ফেলবো একেবারে !

(ইতিমধ্যে পরিচালকমণ্ডলীর পাঁচজন সদস্যের প্রবেশ। একজনের হাতে ভেলভেটের কভারে বাঁধানো একটি মানপত্র, আর একজনের হাতে রৌপ্য-নির্মিত একটি টি-সেট্। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন অনিলা দেবী সোফার উপর অর্ধ-মূর্ছিত অবস্থায় প্রায় শুইয়া আছেন বলিলেই হয় এবং সমরেশ চৌধুরী দুই বাহুর মধ্যে প্রায়-মূর্ছিত কাদম্বিনী দেবীকে লইয়া হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন।)

সদস্য : (মানপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন) মাননীয় শ্রীসমরেশ চৌধুরী সমীপেষু—বন্ধুবর! আজিকার এই শুভদিনে অতীতের বিস্মৃত দিনগুলির কথাই আমাদের বার বার মনে পড়িতেছে। মানস-নেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে এই ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির ইতিহাস। মনে মনে এক অনির্বচনীয় তৃপ্তি ও সন্তোষ অনুভব করিতেছি। অবশ্য আমরা জানি, প্রথম দিকে অল্প মূলধনের জন্য আমাদের ব্যাঙ্ক বিরাট একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। ব্যাঙ্কের অনির্দিষ্ট কর্ম-পন্থা দেখিয়া অনেকেরই সন্দেহ হইয়াছিল। মনে জাগিয়াছিল হ্যাম্‌লেটের প্রশ্ন—টু বি অর নট্ বি। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ কথাও তুলিয়াছিলেন, ব্যাঙ্ক তুলিয়া দেওয়া হউক। এমন সময় আপনি আপনার বৃষ-স্কন্ধে ব্যাঙ্কের ভার তুলিয়া লইলেন। আপনার জ্ঞান, আপনার শক্তি, আপনার ক্ষুরধার বুদ্ধি ব্যাঙ্ককে সাফল্যের উচ্চতম শিখরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে—(কাদম্বিনী দেবী গোঙাইয়া উঠিলেন—ও—ও—)

অনিলা : জল! একটু জল!

সদস্য : আজ আমাদের ব্যাঙ্কের ডেপুটেশন্—না, না—মানে খ্যাতি—

সমরেশ : ডেপুটেশন—রেপুটেশন্—অকুপেশন্—না না, অকুপেশন্—ডেপুটেশন-রেপুটেশন্—(হঠাৎ কথকথার সুরে)

একদিন দুই বন্ধু গেল বেড়াইতে,
বেড়াইতে বেড়াইতে তারা লাগিল বলিতে ;
বলো না যৌবন তোমার হইয়াছে নষ্ট,
আমার কারণে তুমি পাইয়াছ কষ্ট।

(কাদম্বিনী দেবী তখন আরও জোরে গোঙাইতেছেন।)

সদস্য : (মানপত্রের কিছু অংশ ছাড়িয়া দিয়া) আজ ব্যাঙ্কের বর্তমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই—

অনিলা : জল ! একটু জল !

সদস্য : দেখিতে পাই, মানে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই— (কাদম্বিনী দেবীর গোঘানি আরও জোর হইয়া উঠিয়াছে। অক্ষয়বাবু পুনরায় পা ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও বেরোও বেরোও করিতেছেন)—মানে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, মানে বর্তমানে আমাদের মানপত্র পাঠ স্থগিত রাখাই বিধেয় ! (একে অপরের মুখের দিকে তাকাইতে তাকাইতে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় সদস্যেরা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সমরেশ তখনও ছড়া কাটিতেছেন, বাকী সকলের অর্থাৎ কাদম্বিনী দেবী, অক্ষয়বাবু, এবং অনিলা দেবীর অবস্থারও কোনো পরিবর্তন হয় নাই। ঠিক এই অবস্থায় পর্দাও নামিয়া আসিল।)

নাট্যকারের বিপত্তি

॥ চরিত্রলিপি ॥

সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—নাট্যকার

রমা—নাট্যকারের স্ত্রী

ভোলা—ভৃত্য

নাট্যকারের শ্যালক—পঞ্চভূত কাগজের সম্পাদক

আর আছে নাট্যকারের লেখা বিভিন্ন নাটকের কয়েকটি চরিত্র

বিপাশা রায়—বিপাশা রায় নাটকের নায়িকা

পরিমল—ঝড়ের পরে নাটকের চাকরি যাওয়া মেয়ে

নেপেন—অগ্নিরথ নাটকের সাহিত্যিক

তিনকড়ি—আহাম্মক নাটকের আহাম্মক

এ ছাড়া

অগ্নিরথ নাটকের রকবাজ ভজা, ফট্‌কে, লেতো

ঝড়ের পরে নাটকের পকেট-কাটা এবং গুণ্ডা

স্থান—নাট্যকারের বাড়ির ভিতরের দিকে একখানি ঘর

কাল ঃ বর্তমান।

[দৃশ্যপট উঠিতে দেখা যায় একটি বসিবার ঘর। ঘরে সবই আছে —তবু সব কিছু অগোছালো—দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্যে দু'টি জিনিস— বইয়ের র‍্যাক্ এবং লিখিবার টেবিল। অন্যান্য আসবাবপত্রের মধ্যে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়—কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তাহা কেমন শ্রীহীন হইয়া আছে। ঘরটি কোনও এক নাট্যকারের। এই কথাটি জানিবার পরই ঘরের অবস্থা দেখিয়া একটি কথাই মনে পড়িবে যে—"বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে দুর্বল অঙ্গ নাটক।" সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়াছে। ঘরে নাট্যকারের ভৃত্য টুকিটাকি কাজ করিতেছে—এমন সময় দরজায় কড়া নাড়িবার আওয়াজ—ভোলা দরজা খুলিতে যায় এবং পরক্ষণেই ভৃত্যটি এক সুদর্শন ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ করে—তাহাদের পরবর্তী কথায় প্রকাশ পায় ভদ্রলোক নাট্যকারের শ্যালক]

ভোলা : আরে, দাদাবাবু আপনি ! আসুন আসুন, ভালো আছেন তো ?

ভদ্রলোক : হ্যাঁ।—তোমার বাবু এখনো ফেরেন নি ?

ভোলা : না, বাবু তো এখনো ফেরেন নি।

ভদ্রলোক : বাবাঃ ! এখনো অফিস করছে ?

ভোলা : আপিস করছে না ছাই—দেখুনগে খাতা বগলে ক'রে এ-দোর ও-দোর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কতো বলি—ওসব খেয়াল ছাড়ো তো বাপু। তা আমার কথা শুনলে তো !

ভদ্রলোক : নাটক করে শেষে পাগল হবে দেখছি !

ভোলা : তার আর বাকী নেই—সেই বৌদিমণি রাগারাগি করে আপনাদের বাড়ী চলে গেলেন—তাতে বাবুর জেদ যেন আরও বেড়ে গেল।—হ্যাঁ বাবু,—বৌদিমণি বেশ ভাল আছেন তো ? সংসারের কি যে অবস্থা হয়েছে দেখছেন তো ?—তা—বাবু, বোন ভগ্নিপোতকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে মিল করে দেন না—আর কতকাল এমনি করে চলবে ?

ভদ্রলোক : তা তোমার দাদাবাবুটিকে এই নাটক লেখা আর হন্যে হয়ে ঘোরাটা বন্ধ করতে বলো ; আমরাও আমাদের বোনটিকে

দিয়ে যাবো।—এখন একটু জল খাওয়াও তো দেখি—যাও।

(ভোলা জল আনিতে যায়। ভদ্রলোক টেবিলের উপর হইতে একটি Post Card দেখেন; ভোলা জল লইয়া ঘরে ঢোকে)

ভোলা : ঐ চিঠিটা এয়েছে আজ তুকুরে—কোথা থেকে এয়েছে বাবু?

ভদ্রলোক : কে এক "পঞ্চভূত" কাগজের সম্পাদক। সে আজ আসবে সন্ধ্যের পর ওর লেখা শুনতে না কি করতে—তা বাবুর তো এখনো পাত্তা নেই। (ঘড়ি দেখে।)

ভোলা : (খুশি হইয়া) এখানে এসে লেখা শুনবেন? তা হলে, যাকে বলে কি, আমাদের বাবুর নাম-ডাক হচ্ছে।—বৌদিমণিকে খবরটা একটু দেবেন—হ্যাঁ—আমাদের বাবুর নাম হচ্ছে—এবার মান ভাঙতে হবে।

ভদ্রলোক : মান ভাঙাবার জন্যে সেও তৈরী—তা এখন তোমার বাবু এলে যে হয়, কাজ সেরে যাই—

ভোলা : আমাদের গাঁয়ের নবীন অধিকারী—বাবু, যাত্রার পালাগান নেকতো। তা সেও এমন পাগল ছিলো যে, ঘর-সংসারের কথা কিছু ভাবতোই না। তাতে তার বৌ একদিন রাগ করে গলায় দড়ি দিতে গেছলো—শেষে যখন সেই নবীন অধিকারীর পালায় দেশের নোক পাগল হয়ে ছুটতে লাগলো, তখন—আমাদের বাবু—এই যে বাবু এয়েছেন—

[নাট্যকারের প্রবেশ]

ভদ্রলোক : কি হে, একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থা—

নাট্যকার : কতক্ষণ?—খবর ভালো তো?

ভদ্রলোক : হ্যাঁ, সব ভালো। এখন তোমার খবর কি?

নাট্যকার : খবর যথারীতি—তবে একটা কথা তোমার বোনকে বলে দিতে পারো যে, নাটক লেখা ছেড়ে দেবো ঠিক করেছি।

ভদ্রলোক : হাতে তো পাণ্ডুলিপির বোঝা—আবার কোথাও ঠোক্কর খেয়ে এলে বুঝি—নতুন নাটক?

নাট্যকার : না, ঐ অগ্নিরথ—যাক্‌গে মরুকগে—(পাণ্ডুলিপিটা ফেলে

দেয় মেঝেতে।)

ভদ্রলোক : বাবা! এ-যে দেখছি Ignatia 200-এর symptoms—'হতাশায় ভেঙে পড়া' ভাব! তা এই অবস্থায় antidote হিসেবে আপাততঃ এটা কাজ করে কিনা দেখো তো? (Post card-টা আগাইয়া দেয়; নাট্যকারের চোখে মুখে কোনও পরিবর্তন ধরা পড়ে না।)

ভদ্রলোক : দেখো, অভাবিতভাবে এই হয়তো তোমার এতদিনের পরিশ্রমের স্বীকৃতি দেবে। তোমার ঐ "বিপাশা রায়" "অগ্নিরথ" "আহম্মক" হয়তো পাণ্ডুলিপির লজ্জার হাত থেকে বেঁচেই বা যায়!

নাট্যকার : Not at all interested—নাটক আর লিখবো না।

ভদ্রলোক : Determined! তবে আর ভদ্রলোককে কষ্ট দেবে কেন?

নাট্যকার : পরিচয় হতে নিজেই উৎসাহ দেখালো তো কি করবো!

ভদ্রলোক : কে—ভদ্রলোক?

নাট্যকার : ঐ পঞ্চভূত কাগজের সম্পাদক—সম্পাদকীয় করেন আবার Insurance-এর দালালীও করেন। আমি Insurance-এ কাজ করি আর লিখি-টিখি শুনে নিজেই বললেন—যাবো একদিন আপনার ওখানে—হাতে হ্যামলেটের একটা অনুবাদের পাণ্ডুলিপি ছিলো সেটা নিয়ে গেলেন—বললেন পড়ে দেখবো—

ভদ্রলোক : কাগজের নামও তো শুনিনি বাপু—সপ্তাহিক সমাচারে একবার চেষ্টা করে দেখলে পারতে—

নাট্যকার : এই তো আসছি সেখান থেকে।

ভদ্রলোক : দেখা হলো সম্পাদকের সঙ্গে?

নাট্যকার : হ্যাঁ, হলো। দেখা হতেই বললেন—কী এনেছেন?—বললাম নাটক। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে দুর্বল অঙ্গ নাটক—কিন্তু আমরা তো নাটক ছাপি না। বললাম—একবার পড়ে যদি দেখতেন। বললেন—পড়ে কী করবো—বলছি তো নাটক আমরা ছাপাই না—নিয়ম নেই; আমি বেরিয়ে আসছি, সম্পাদক চেঁচিয়ে আবার বললেন—মনে রাখবেন, বাংলা

সাহিত্যের সবচেয়ে দুর্বল অঙ্গ হচ্ছে নাটক।

ভদ্রলোক : তা দুর্বলকে সজীব করার ভার রথী-মহারথীদের দিয়ে ছোটো-মানুষ, ছোটো-গল্প কিম্বা এক-আধটা উপন্যাস লিখলেও তো পারো; কিছুটা নাম করতে হয়তো এতদিনে।—এক আধটা Film-এ ধরাতে পারলে তো কথাই ছিলো না। তা নয়, ধনুর্ভঙ্গ পণ—নাটক লিখবো। বোঝো ঠেলা—

নাট্যকার : তোমার বোনের সঙ্গে তো ঐ নিয়েই বাধলো।

ভদ্রলোক : তা বাধবে না—সংসার করবে আবার তোমার শ্রীহস্তের লেখা Manuscript কপি করবে রাতের পর রাত জেগে। —আবার একই লেখার একাধিক কপি!

নাট্যকার : না না, ব্যাপারটা সেদিন হলো কি জানো? প্রগতি পত্রিকা দেড় বছর ধরে আমার একটা নাটক নিয়ে বসে আছে—হঠাৎ সম্পাদকের চিঠি এলো—'এবার আপনার নাটক ছাপবো, কিন্তু দুঃখের সংগে জানাচ্ছি আপনার নাটকের Manuscript-টা অফিসের বাড়ী বদলাবার সময় কোথায় গেছে পাওয়া যাচ্ছে না—যদি আর একটা Copy পাঠান'—তা বোঝো, ঐ অবস্থায় কি করি; তাই—

ভদ্রলোক : এখনো তো ছেপে বেরুলো না—বেরুলেও না হয় রমার ফিরে আসার সম্ভাবনা হতো—

নাট্যকার : না না, ছাপবে ওরা—ধারাবাহিক উপন্যাস ওই "ডাষ্টবিন"টা শেষ হলেই আমারটা ছাপবে। তা যাকগে—রমাকে খবরটা দিও—তিনি এবার ফিরে আসতে পারেন—নাটক আর লিখবো না।

ভদ্রলোক : সে তুমি নিজে গিয়েই জানিয়ে এসো, মা তোমাকে যেতে বলেছেন—সেই খবরটাই তোমাকে দিতে এসেছিলাম। কালকেই যেও কিন্তু। রাত্রে ওখানে খেয়ে না হয় জোড়ে ফিরে আসবে। আমি চললাম। (ভদ্রলোক বাহির হইয়া যান।)

[নাট্যকার অনেকদিনের অভ্যাস বসে দুইটি আঙুল তর্জনি ও মধ্যমা ভোলার দিকে আগাইয়া দেয়। ভোলা একটি আঙুল

ধরিলে—'দুত্তোর হলো না' বলিয়া নিরাশ হইয়া বসিয়া পড়ে]

ভোলা : হলো না তো হলো না—এখন জলটা খেয়ে নেন তো।—নাটক নেকা যখন ছেড়েই দেবেন তখন—

নাট্যকার : (চটিয়া)—কে বললে যে তোকে আমি নাটক ধরাচ্ছি আঙুলে ?

ভোলা : বাঃ, বলবে আবার কে! নেকার শুরু থেকেই তো এই ভোলাকে দিয়ে আঙুল ধরাচ্ছেন। এখন তো কিছু বলেন না। আগে তো তবু বলতেন এইটাতে নাটক হবে, এইটাতে হবে না (বাইরে কড়া নাড়ার আওয়াজ) তা এবার বোধ হয় হলো বাবু—

নাট্যকার : কী করে জানলি ? (আবার কড়া নাড়া।)

ভোলা : আজ্ঞে ঐ যে কড়া নাড়ছেন, ঐ বাবুটিই বোধ হয় এলেন—পত্তর নিতে আসছেন—এবারে নিশ্চয়ই—(কড়া নাড়া) যাই বাবু—(ভোলা চলিয়া যায় এবং পঞ্চভূতের সম্পাদককে লইয়া ভিতরে আসে।)

সম্পাদক : নমস্কার। চিঠিটা পেয়েছেন তো ? কোনও অসুবিধা ঘটাইনি ?

নাট্যকার : না না—কিছু মাত্র না—আপনি বসুন—

সম্পাদক : বসবো না, একটু তাড়া আছে, বুঝতে পারছেন···পাঁচ জায়গায় ঘুরতে হয় (সম্পাদক তবু বসেন এবং বলেন) একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলাম—

নাট্যকার : বলুন।

সম্পাদক : আপনার পাণ্ডুলিপি পড়লাম। হ্যামলেটের অনুবাদ···সে সম্পর্কে বলার কিছু নেই···সুন্দর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন মশায়! এতদিন এ লেখা পড়ে আছে কেন বুঝতে পারছি না। অনুবাদ-সাহিত্য হিসেবেও তো ছাপা হওয়া দরকার।

নাট্যকার : ছাপ্‌ছে কে বলুন ? চেষ্টার ত্রুটি করিনি। চালু কাগজের সম্পাদকেরা তো নাটকের নামে নাক সেঁট্‌কান—

সম্পাদক : সেঁট্‌কাবেনই তো! নাটক কেন—অন্য কিছু নিয়ে গেলেও

তাঁরা নাক উঁচু করতেন—আপনি তো আর সম্পাদকের পত্রিকার গোষ্ঠিভুক্ত লেখক নন। যদি হতেন তবে any trash আপনি লিখুন···না না, আপনি trash লিখবেন কেন, আপনার লেখা আমার ভালই লেগেছে—

নাট্যকার : যাক, আপনার যে ভালো লেগেছে এ-ও সৌভাগ্য—

সম্পাদক : আমার মশাই অতো উন্নাসিকতা নেই—ভালো জিনিস ভালই বলি। তবে কি জানেন—নাটক অভিনীত না হলে এ-দেশীয় পাঠকদের কাছে তার দাম নেই মশাই! তাই নাটক লিখেও return নেই, ছাপিয়েও না—দেখুন না, নামকরা কোনও সাহিত্যিক নাটক লিখেছেন আজকাল?

নাট্যকার : তবু বাংলা সাহিত্যের দুর্বল অংশ কিন্তু নাটক—

সম্পাদক : হ্যাঁ, তা বটে—কিন্তু সাধারণ লোক নাটককে সাহিত্য হিসাবে গল্প-উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলেছে কি? যাক্‌গে মশায়, আর কিছুদিন সবুর করুন। দেশের লোক লেখাপড়া আরও কিছুটা শিখুক, দেখবেন—নাটকের কদর চড় চড় করে বাড়ছে। (হঠাৎ নাট্যকারের দিকে ঝুঁকিয়া)—তা আপাতত আমাদের কাগজের জন্যে ভূতের গল্প লিখে দিন তো।

নাট্যকার : ভূতের গল্প! ভূতের গল্প তো লিখি না।

সম্পাদক : লিখি না কি মশায়! আপনার কলমে যে ভূতের গল্পের মুন্সিয়ানা আছে!

নাট্যকার : এ্যাঁ—

সম্পাদক : হ্যাঁ, হ্যামলেটের প্রথম ক'পাতায় কী atmosphere তৈরী করেছেন মশায়!—তারপর সেই যেখানে রাজকুমার ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে দুর্গপ্রাকারের ওপর রাজার প্রেতাত্মার সংগে দেখা করতে—আরি বাপ! আপনার হাতে ভূতের গল্প চমৎকার আসবে—আপনি আমাদের গোটা-বারো ভূতের গল্প লিখে দিন। কুড়ি টাকা পার্ গল্প। মাল দেওয়ার সংগে Cash!

নাট্যকার : কুড়ি টাকা প্রতি গল্প?

সম্পাদক : হ্যাঁ, আমি মশাই ঠকাই না। "পঞ্চভূতে" পঞ্চরংয়ের সমাবেশ করবো। তাই ভাবছিলাম ভূতের গল্পের একটা Regular Feature বার করবো আর তার লেখক হবেন আপনি—

নাট্যকার : আমি !

সম্পাদক : হ্যাঁ, আপনি। লিখুন Sir লিখুন। First instalmentটা কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি চাই—এক ফর্মা ছাপা হয়ে গেছে কিনা। টাকাটাও নিয়ে আসবেন আর বারো মাসের একটা Contract করলে advanceও কিছু— (প্রাপ্তির ইঙ্গিত করে) তবে একটা কথা আপনাকেই বলছি—বড়ো কাউকে তো বলতে পারি না ; আপনি একই trade-এর লোক তাই,— মানে ঐ ভূতের গল্পে তো একজন ভূত চাই—তা ভূত হয় কিসে ?—না একটা অতৃপ্ত বাসনা, তা সেই অতৃপ্ত আত্মার অতৃপ্ত বাসনার কারণটা এই ইহজগতে insurance না করার জন্যেই···যদি কোনও রকমে manage করতে পারেন—তাহলে খুব ভালো হয়—মানে আপনার remunerationটাও হয়তো Companyর কাছ থেকে manage করতে—(হঠাৎ ঘড়ি দেখিয়া) এঃ হেঃ, দেরী হয়ে গেল—চললাম —মঙ্গলবার আবার আসবো। আপনি লিখতে শুরু করুন।

(নমস্কার বিনিময়ের পর সম্পাদক চলিয়া যান, নাট্যকার হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া থাকেন হ্যামহেটের পাণ্ডুলিপি হাতে। ভোলা আসিয়া ঢোকে। নাট্যকার প্রায় প্রলাপের সুরে)

নাট্যকার : হ্যামলেট্ থেকে ভূতের গল্প !

ভোলা : নগদ কুড়ি টাকা দেবে বাবু ? (নাট্যকারের কানে ভোলার কথা যায় না সে আপন মনে বিড়বিড় করিয়া চলে)

নাট্যকার : নাটক···গল্প···কুড়ি টাকা ! (হঠাৎ চীৎকার করিয়া) ভোলা—ভোলা, কালই কাগজওয়ালা ডেকে খবরের কাগজের সঙ্গে এই খাতাগুলো সব বেচে দিবি বুঝলি—ওগুলো আর ঘরে রাখবো না—নাটক যখন আর লিখবো না তখন মরা ছেলে আগলাবার দরকার কী ! ভূতের গল্প লিখবো—আজই—এক্ষুনি (ভোলা

নাট্যকারের মানসিক বিপর্যয়ের কথা বোঝে না, সে শুধু বোঝে *নগদ কুড়ি টাকা।*)

ভোলা : এক্ষুনি ? তা বাবু শুভকাজে দেরী না করাই ভালো—

নাট্যকার : শুভ কাজ !

ভোলা : তা বাবু নগদ কুড়ি টাকা—

নাট্যকার : (রাগিয়া) বেরিয়ে যা সামনে থেকে···বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে হতভাগা—

ভোলা : এই দেখো—রেগে উঠলেন তো। আপনি লিখুন, আমি বাইরে বসলাম। (বাহিরে যায়।)

[নাটকার টেবিলে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে। Lamp-এর আলো ছাড়া অন্য আলোগুলি আস্তে আস্তে কমিতে শুরু করিয়াছে। নাট্যকার হঠাৎ কাগজ কলম লইয়া বসে। ভূতের গল্প লিখিবে কিনা আমরা তাহা জানি না—চারপাশ নিঝুম···হটাৎ কতকগুলি অদ্ভুত আওয়াজ, পিছনের বইয়ের rackটি নড়িয়া উঠে—একটু পরে সুযোগ বুঝিয়া মাথায় Bandage বাঁধা একটি লোক নাট্যকারের অলক্ষ্যে সুট করিয়া বাহির হইয়া যায়]

নাট্যকার : (সচকিত হইয়া) কে ?—কে রে ? ভোলা ! ভোলা !! কে গেল রে ?

ভোলা : কোথায় ? কে আবার যাবে ? দেখো দিকি ! ভূতের গল্প নিকতে নিকতে কি ভূত দেখছো নাকি—জ্বালা দেখো দিকি— (ভোলা আবার বাহিরে চলিয়া যায়।)

[নাট্যকার আবার লিখিতে শুরু করে, কিছুক্ষণ লিখিবার পর আবার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকে। ঘরের আলো আস্তে আস্তে একটা ফিঁকে নীল রঙে পরিবর্তিত হয়। এমন সময় ঘরে চার-মূর্তির আবির্ভাব। হয়তো সাধারণভাবে ঘরের দরজা দিয়া প্রবেশ করিল, আবার তা নাও হইতে পারে—হয়তো সত্যই আবির্ভাব। তারা কে বা কারা তা একটু পরেই জানা যাইবে—তবে তাদের নাম—নেপেন, তিনকড়ি, বিপাশা ও পরিমল—।

বলা বাহুল্য, দুইজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা। উত্তেজিত অবস্থায় তারা কথাবার্তা শুরু করে]

নেপেন : আপনি নাকি ভূতের গল্প লিখছেন ?

নাট্যকার : (হঠাৎ হক্‌চকাইয়া) তাতে আপনাদের কী ? আপনারা কারা ?

নেপেন : আমাদের কী—। আমরা নাটক চাই—

নাট্যকার : আপনারা কোথাকার দল ? আমড়াতলা লেন—না আমতলা স্ট্রীট ?

তিনকড়ি : আজ্ঞে আমরা তলার নয়—ওপরের। প্রথমে ওপরের—মানে আপনার ঐ মাথার মধ্যে ছিলাম। এখন আছি আপনার লেখা খাতার পাতায়।

নাট্যকার : ঠিক বুঝলাম না ? এটা কি রকম রসিকতা ?

পরিমল : আজ্ঞে না—খুব সিরিয়াস কথা। আমরা সব আপনারই লেখা নাটকের চরিত্র।

বিপশা : আমি আপনার "বিপাশা রায়" নাটকের বিপাশা।—

পরিমল : আমি "ঝড়ের পরে" নাটকের চাকরী যাওয়া মেয়ে পরিমল।

নেপেন : আমি "অগ্নিরথ"এর নেপেন।

তিনকড়ি : আমি "আহাম্মক"এর তিনকড়ি।

নাট্যকার : আমি কি নেশাভাঙ করলাম না কিরে বাবা—এসব কি—

নেপেন : আপনি নেশা করবেন কেন ? খাতার মধ্যে আমাদের কি রকম যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল—তাই ক'দিন থেকে আপনিও আপিসে বেরোন আমরাও খাতার পাতা থেকে বেরিয়ে পড়ি।

পরিমল : আপনি না পারছেন Stage করতে, না পারছেন ছাপতে।

তিনকড়ি : তবু আপনার Honest effort দেখে আমাদেরও একটু Sympathy হলো—

নেপেন : ভাবলাম আমাদেরও কিছু করণীয় আছে—

বিপাশা : আমরাও তাই থিয়েটার পাড়ায় ঘোরাঘুরি শুরু করলাম।

তিনকড়ি : আর আপনি কিনা তলে তলে Sabotage করছেন real

causeকে—ভূতের গল্প লিখছেন !—

পরিমল : ভাগ্যিস Unionএর বীরেনদা মাথা ফাটা অবস্থাতেও দৌড়ে খবরটা দিলে—

নাট্যকার : কে বীরেনদা ?

পরিমল : আজ্ঞে, আপনার "ঝড়ের পরে" নাটকের Union Leader বীরেনবাবু—তাকে তো গুণ্ডা দিয়ে মাথা ফাটিয়ে জখমি করে রেখেছেন—তাইতো আমরা তাকে বাড়ীতে রেখে যাই।

নেপেন : দীপ-মহলের সামনে আপনার রকবাজের দল এক কাণ্ড করে বসলো। আমরা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে, এমন সময়ে বীরেনবাবু খবরটা দিতে আরও হতভম্ব করে দিলে—আপনি নাকি ভূতের গল্প লিখছেন ?—আর আমাদের নাকি সের দরে বেচে দেবেন ?—বাঃ।

তিনকড়ি : ওই ছোঁড়াগুলো অমন করে দীপ-মহলে ঢুকে না গেলে সবাই মিলে এর বিহিত করা যেতো—

পরিমল : মানে, এটা হতো না, বুঝলেন—যতো নষ্টের মূল আপনার ঐ বিপাশা। নইলে আমি চাকরী যাওয়া মেয়ে, আমি সোজা কথা বুঝি।—আমি সবাইকে বুঝিয়ে বলতাম—দেখো, আমাদের যখন একটা সমস্যা রয়েছে, তখন একটা কাজ করা যাক, সবাই মিলে একটা ঝাণ্ডা তুলে—'আমাদের দাবী মানতে হবে, নাট্যকার চাই' হাঁকতে হাঁকতে যাওয়া যাক্—একটা Discpline থাকবে—কেউ আর ভাগতে পারবে না।

বিপাশা : আচ্ছা আপনিই বলুন, তাই কখনো হয়—আমি তো আপনারই তৈরী। আপনি তো জানেন সব। আমি সকাল সন্ধ্যে জর্জেট পরি, সোফা-কৌচে গড়াতে গড়াতে কথা বলি, আর নাটকের শেষে আত্মহত্যা করি—তাও কিন্তু পিয়ানো বাজাতে বাজাতে, আপনিই বলুন। এসব ভাল্‌গার ব্যাপার—

পরিমল : এ্যা—ভাল্‌গার।—একটু আগে বীরেনদা খবরটা দিলে, কিছুতে ওদের যেতে দিতাম না। তখন দেখতাম ওই ভাল্‌গার

ব্যাপারে কেমন না আসতে।

বিপাশা : এ্যাঃ—আমি ওসব ইনক্লাব জিন্দাবাদের মধ্যে নেই।

নেপেন : বেশ নেই। কিন্তু তাই বলে রাস্তার মাঝখানে ও-রকম করে পিয়ানোর সুর করে দিলেন কেন ?

বিপাশা : বাঃ। আমার যে কি রকম সুর ভাঁজতে ইচ্ছা করছিল। কি জানি কেমন মনে হলো—এর পরের নাটকে নাট্যকার হয়তো আমাকে দিয়ে আত্মহত্যা নাও করাতে পারে। বাঁচতে কার না ইচ্ছা হয় বলুন ?

তিনকড়ি : আরে—মরতে আপনাকে বলেছে কে ? এর পরের নাটকে যতো খুশি আপনি বাঁচুন না। আপনাকে বারণ করবো না। Curtain পড়ে যাবার পরেও Stage-এ দাঁড়িয়ে থেকে বেঁচে থাকবেন। কিন্তু সুরটা তো মনেও ভাঁজতে পারতেন। যতো গণ্ডগোলের মূল তো অপনার ঐ সুর-ভাঁজা।

পরিমল : ঠিক তাই। কতো কষ্ট করে আমরা সকলকে সামলে সুমলে নিয়ে আসছি—ফিরেফিরতি আপনারই কাছে। জানেন, কী সব চরিত্র!—এক একটা আস্ত বকাটে ইয়ার।—জানেন, কাউকে বাদ দিইনি—সব ক'টাকে নিয়ে আসছিলাম—আপনার অগ্নিরথের রকবাজী ভজা, ফটকে, লেতো, ঝড়ের পরের গুণ্ডা, পকেট-কাটা—সব—।

নেপেন : আর ঠিক পথের মাঝখানে উনি সুর ভাঁজতে আরম্ভ করলেন। আর যায় কোথায়। পকেট-কাটা মুখের মধ্যে আঙুল পুরে শিষ দিয়ে উঠলো, ফট্‌কে বললে—তুত্তোর নাট্যকার। আমার ভাই জ্যান্ত নাচ দেখতে ইচ্ছে করছে। তারপর আপনার অগ্নিরথ নাটকের রকবাজ ভজা—সেই তো আঙুল বাড়িয়ে দেখালে। চেয়ে দেখি দীপ-মহল থিয়েটার। সামনে বিরাট পোষ্টার—**নতুন নাটক “ধূমকেতু”। ভয় নাই, নাটক দেখাইয়া বিরক্ত করিব না। ইহার চৌত্রিশটি দৃশ্যে চৌত্রিশবার ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ ঘুরিতে দেখিবেন। বিখ্যাত প্লে ব্যাক শিল্পী পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়**

গান না গাহিয়া মোট পাঁচবার আপনাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন এই নাটকে।

তিনকড়ি : বাঃ "বিঃ দ্রঃ"টা বাদ দিয়ে গেলেন ?

নেপেন ঃ ও হ্যাঁ হ্যাঁ। একটা "বিঃ দ্রঃ" আছে—মানে বিশেষ দ্রষ্টব্য আর কি। **ঐ পরিতোষ চট্টোপাধ্যায় সামনে আসিয়া দাঁড়াইবেন**—তারপর বিঃ দ্রঃ দিয়ে লেখা আছে—**এন্‌কোর দিলে আবার আসিবেন।** আপনিই বলুন—এই প্ল্যাকার্ড চোখে পড়বার পর আর কি লেতো ফট্‌কেকে ঠেকিয়ে রাখা যায় ? সব হুড় হুড় করে ঢুকে পড়লো !

তিনকড়ি : আবার যাবার সময় সে চোখ পাকিয়ে বলে যাবার ঘটা কি ! ওহে কড়িবাবু, তোমার নাট্যকারকে বলে দিও যে আমরা আর ওতে নেই। নাটক আমরা বয়কট করলাম।

পরিমল : ইস্—একটু আগে বীরেনদা গিয়ে পড়লে বয়কট করাতাম ওদের। ঘাড় ধরে ওদের নিয়ে আসতাম না।

নেপেন : বীরেনবাবু তো রয়ে গেলেন ওখানে। বললেন, হল থেকে বেরুলেই সব ক'টাকে গ্যাগ্ করে ধ'রে নিয়ে যাবো, ততক্ষণ তোমরা যাও।

তিনকড়ি ঃ তারপর ঐ—ঐ ওরা আরও বললে কি জানেন ? এরপর আমরা নাটকের চরিত্র না হয়ে stageএর তক্তা হয়ে জন্মাব। তবে ওদেরও খুব দোষ দেওয়া যায় না—বুঝলেন স্যার। করেই বা কি বলুন। আমাদের মতো intellectual চরিত্র তো আর নয়, যতসব রকবাজ পকেট-কাটা পার্শ্বচরিত্রের দল। কাজেই ধৈর্যের অভাব !

বিপশা ঃ আর ধৈর্যের অভাবই বা বলি কি করে। আজ ছ'বছর আমরা অপেক্ষা করে বসে আছি। না বেরুলাম বই হয়ে—না উঠলাম কাগজের পাতায়—না গেলাম stage-এ। বছরের পর বছর ধরে আপনার খাতার পাতায় আটকে বসে আছি।

নেপেন ঃ তারপর আমাদের নিয়ে আপনি আরম্ভ করলেন। কতক-

গুলো প্রশ্ন আনলেন—সমস্যা দেখালেন। কিন্তু সমাধান ? বেশির ভাগই তো 'জিজ্ঞাসা চিহ্ন' দিয়ে ছেড়ে দিলেন। আমরা তো সবাই 'note of interrogation' হয়ে রইলাম।

তিনকড়ি : কিন্তু তা হয়ে রইলে তো চলবে না। আমাদেরও তো আকুলি বিকুলি বলে একটা বস্তু আছে। যা হয় স্থার একটা ব্যবস্থা করুন; অন্তত খাতায় লিখেই উত্তরগুলো দিয়ে দিন। পরিষ্কার বুঝি যে এইখানে জন্মে এইখানে মরেছি। অন্তত হাঁফটানটা কমুক।

পরিমল : (উত্তেজিত হইয়া) ঠিক কথা—নাটকে আরম্ভ করেছেন নাটকে শেষ করুন। আমি একটা চাকরী যাওয়া মেয়ে, সমস্যার পর সমস্যা—একটারও উত্তর দিলেন না। কোথা থেকে এক নায়ক জুটিয়ে তার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বার করে দিয়ে আকাশে সূর্য উঠিয়ে দিলেন। কিন্তু উত্তর কই ?

নাট্যকার : (হতভম্বের মতো) আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না —মানে আপনারা কারা ?

নেপেন : বাঃ! ঐ যে বললাম—আমরা আপনার নাটকের চরিত্র।

নাট্যকার : তা ঠিক, কিন্তু সে তো আর হয় না।

বিপাশা : কেন হবে না। 'Six Characters in Search of an Author'এ হয়েছিলো।

নাট্যকার : 'Six Characters in Search of an Author'! সে তো 'পিরান দেল্লো'র নাটক।

তিনকড়ি : আজ্ঞে হ্যাঁ—আমরা ঐ 'Six Characters in Search of an Author' করে ফেললাম।

নেপেন : যদিও আমরা আপাতত characters six নই, four—

পরিমল : ছিলাম আমরা সবই; কিন্তু "ধূমকেতু"তে ঢুকে পড়লো— তা কি করি বলুন ?

নাট্যকার : কিন্তু আমার কাছে এলেন কেন ? আমি তো আর নাটক লিখছি না।

তিনকড়ি : আজ্ঞে এ ক'দিন তো আপনার কাছে আসিনি। অন্যত্র চেষ্টা দেখছিলাম—(হঠাৎ মনে হলো যে, কথাটা বলা বোধহয় ঠিক হইল না) আমি স্যার 'সিম্পিল' লোক ; সত্যি কথাই বলে ফেললাম। আপনি ছাড়া আর গতি ছিলো না তাই আপনার কাছেই আসছিলাম।

পরিমল : মানে কি জানেন ; নাটকের দন্ত্য 'ন'এর Possibility যেখানে দেখেছি সেখানেই আমরা 'রেড্' করেছি। সাহিত্যিক দেখেছি কি ধরে পড়েছি। কিন্তু উঁহুঃ. কোনো chance নেই।

সমীরন : কেন ?

নেপেন : তাদের দরজায় টাঙানো আছে 'উপন্যাস ও ছোটো গল্প ছাড়া অন্য কিছু লেখা হয় না। বড়জোর কবিতা পাইলেও পাইতে পারেন—তাহাও অবসর থাকিলে'।

তিনকড়ি : কোনো কোনো জায়গায় আবার বিলিতি কায়দা, বুঝলেন ? একটা বোর্ড লেখা রয়েছে—Novels—Yes ; Short stories —Yes ; Poems—Yes + No ; Plays—No.—

পরিমল : সেই জন্যেই তো ঘুরে ফিরে আপনারই ওপর ভরসা করি আমরা। যদি আপনি আমাদের উদ্ধার করেন।

নেপেন : আমরা ভরসা করি, আর আপনি কিনা লিখছেন ভূতের গল্প ?

নাট্যকার : কিন্তু আমি তো তোমাদের উদ্ধার করবো না—আমি নাটক লেখা ছেড়ে দিয়েছি। (নাট্যকার যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল।)

পরিমল : ছেড়ে অমনি দিলেই হলো ? শ্রেণীটা তো আপনার তৃতীয়। আপনি নাটক ছাড়া লিখবেন কি ?

নাট্যকার : উঁহুঃ। এখন তো আর তৃতীয় নই, দ্বিতীয়—। ভূতের গল্প লিখছি যে !

বিপাশা : বেশ, তাহলে আপনি আমায় ভূতই করে দিন। আর তাছাড়া আমি তো ভূতই। কি এক নাটক লিখলেন "বিপাশা রায়" যাকে ধরা-ছোঁয়াই গেল না। স্বামী শুদ্ধ তিনটে লোক এলো জীবনে,

ভাবলাম প্রেমট্রেম করা যাবে। ওমা—কোথায় কি? কাউকে পছন্দ নয়, দুনিয়ার কিছুই ভালো লাগে না। ইজিচেয়ারে শুয়ে সাংস্কৃতিক আড্ডা মারতে মারতে পিয়ানো বাজাতে উঠলাম আর পিয়ানো বাজাতে বাজাতে আত্মহত্যা করলাম—ব্যস্! একে ভূত ছাড়া কি বলবো বলতে পারেন? তার চেয়ে আপনি আমায় সত্যিকারের ভূতই করে দিন। বরং একটা ব্রহ্মদৈত্যের সঙ্গে বিয়ে-টিয়ে দিয়ে দিন যাতে Permanently ঘর-সংসার করতে পারি। No suicide business—please!

নাট্যকার: কিন্তু তোমার পরিবেশে ঐ পিয়ানো বাজাতে বাজাতে, মরাটাই শেষ কথা। ওখানে জীবনে আঁকড়াবার কিছু নেই—সাংস্কৃতিক মাটি ছাড়া। কাজেই ঐ সাংস্কৃতিক আড্ডা মারতে মারতে মরে বেঁচে থাকতে হবে; আর নয়তো আত্মহত্যা করতে হবে।

বিপাশা: বেশ, পরিবেশ বদলান তা হলে। নতুন নাটকে ফেলুন। Solid একটা কিছু দিন আমাদের।

পরিমল: আমারটা কি করলেন বলুন? বেকার হয়ে strike করে লড়াই করছি। পৌরাণিক ছবির মাটি ফুঁড়ে জল বের করবার মতো এক আলুভাতে মার্কা নায়ককে এনে হাজির করলেন। কি বলবো? তার ঐ তো-তো করে কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল ঠাস্ করে এক চড় মারি। কিন্তু উপায় নেই—কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। 'হঠাৎ—আলোর—ঝলকানি'র মতো নায়ক এলেন আর আমিও হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়লাম। আপনিও 'ঝল্‌মল্ করে চিত্ত' করে নাটক শেষ করে দিলেন। কিন্তু যদি ঐ ঝলকানিটুকু না আসতো? ধরুন Strike চলেছে—খেতে পাচ্ছি না—ভাই Matric দেবে—তার fee-এর টাকা নেই—পেট চুঁই চুঁই, তেষ্টায় ছাতি ফাটছে—তাহলে? (প্রায় ধমকাইয়া) লিখুন নাটক।

নাট্যকার: না।

সকলে: না মানে?

নাট্যকার : না মানে না। ভূতের গল্প লিখছি, order আছে।

বিপাশা : (খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিল) ভূতের গল্পের order? একি গোলাম মহম্মদের স্যুটের দোকান নাকি যে, made to order?

নাট্যকার : অনেকটা তাই।

বিপিশা : made to order করে ভূতের গল্প লিখতে পারেন—আর নাটক লিখতে পারেন না? তাহলে তো এতদিন আমাকে পড়ে থাকতে হতো না—শ্রীমঞ্চের মালিক কল্যাণ সেন—কী বলেছিলো মনে নেই? আমাকেই তো নিয়ে গিয়েছিলেন।

সকলে : কী বলেছিলেন—কী বলেছিলেন Sir?

নাট্যকার : বলবে আবার কী!—প্রথমে তো দারোয়ান ঢুকতেই দিচ্ছিল না। বললাম সেন্ সাহাবকো কুছ চীজ দেনা হ্যায়—হাতে সদ্য কেনা আমের থলি—ভাবলে, হয়তো আমই দেবো। পথ ছাড়লো—ওপরে গিয়ে সেনের হাতে Scriptটা দিলাম। বললেন —নতুন নাটক এনেছেন—কিন্তু এখন তো ভাই 'স্কন্ধগুপ্ত' খুলেছি আর মেনকার পলায়ন খুলবো।—বছর দুই পরে আসবেন। তারপর বইটা নেড়ে দেখে গম্ভীরভাবে বললেন—তাছাড়া এটা তো বেস্পতিবারের নাটক হয়েছে দেখছি।—আমার মুখে একগাল হাসি। ভাবলাম, যা হোক কিছু একটা হয়েছে তাহলে—

বিপাশা : ঐ হাসিটুকুকে তো টিকিয়ে রাখতে পারতেন যদি Mr. Sen-এর Suggestionগুলো নিতেন।—মানে, কিছু কথা বাদ দিয়ে, সূক্ষ্ম তর্কাতর্কি, মানসিক দ্বন্দ্বগুলোকে বাদ দিয়ে, সহজ করে —আমাকে একটু মিষ্টি মিষ্টি ভিজে প্রেম করতে দিতেন,—নাচ, গান ঢোকাতেন—

নাট্যকার : ঐ নাটকে নাচ!

বিপাশা : হ্যাঁ, Birth day party-তে ছিলো তো নাচের Scope। একটা নাচের আসর বসালে কি ক্ষতি হতো আপনার? সেন সাহেব তো তাই বললেন তখন—

নাট্যকার : (চটিয়া গিয়া) সেন সাহেব বললেন আমিও করলাম।

যা আছে, যা হচ্ছে, যা হয়—তাকে made to order করা যায় না। করা যায় তাকেই যা নেই,—যা হয় না,—হতে পারে না—মানে ভূতের গল্প!

বিপাশা: এটা কিন্তু ভালো বলেছেন। এই তো এতক্ষণ বাদে আমার মনের মতো কথা হচ্ছে। বাদ তো বাদ নৈরাশ্যবাদ। আমার আবার কী জানেন—এই সব নেতি নেতি শুনতে ভারী ভালো লাগে—

পরিমল: শুধু তাই? আর "দাঁড়িয়ে আছি—পথের ধারে—তবু দেখা হলো না" বলে গান গাইতে ভালো লাগে না?

বিপাশা: (জিভ ভেংচাইয়া) গান গাইতে ভালো লাগে না। হ্যাঁ লাগে—নিশ্চয় লাগে। তাতে তোমার কি? যতসব ক্যাড্ কোথাকার।

পরিমল: ক্যাড্ আমি না তুমি? হচ্ছে এখানে সমস্যার কথা, নয় উনি এলেন 'নেতি' 'নেতি' করতে! আরে অতো যদি নেতি নেতি তো এলি কেন? ঘরে গিয়ে চুলে ল্যাভেণ্ডার মেখে মুখ শুক্‌নো করে ঘুরে বেড়াগে যা।

বিপাশা: দেখো, 'তুই তোকারি' ক'রোনা বলে দিচ্ছি।

(পরিমল আর কি সব বলিতে যাইতেছিল)

নেপেন: আচ্ছা আপনারা কী? সমস্যা চুলোয় গেল—নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে আরম্ভ করে দিলেন! এই জন্যেই বলেছিলাম female character বাদ—

বিপাশা ও পরিমল: (সমস্বরে স্ববিস্ময়ে)—এ্যাঁ!

তিনকড়ি: তবু ওঁরা এক খাতার নন্, দু'জনের মধ্যে আস্ত মলাটের তফাৎ—

নেপেন: যাক্‌গে ওসব কথা—এখন আপনার কথা বলুন। আপনি নাটক লিখবেন কি না?

নাট্যকার: বলে তো দিয়েছি,—না।

তিনকড়ি: কেন জানতে পারি?

নাট্যকার : কৈফিয়ৎ ! নাটক লিখবো না তাও কৈফিয়ৎ—আর নাটক লিখি বলেও কৈফিয়ৎ।

বিপাশা : কার কাছে ?

নাট্যকার : বৌ-এর কাছে—! বৌ-এর কাছে কৈফিয়ৎ—এর কাছে কৈফিয়ৎ—তার কাছে কৈফিয়ৎ—সেদিন শ্রীমঞ্চের নতুন মালিকের ওখানে নাটক নিয়ে কোনও রকমে দেখা করলাম—সেখানেও কৈফিয়ৎ—নাটক আনেন কেন ? আমরা ভাই নাটক করি না—উপন্যাসের নাট্যরূপ করি—আপনি উপন্যাস টুপন্যাস থাকলে আনবেন তখন বরং দেখা যাবে। আমি অবাক নার্ভাস একসঙ্গে। ভ্যাবাচাকা খেয়ে নমস্কার করে বেরিয়ে এলাম। বাইরে দারোয়ান মুখ টিপে টিপে হাসছে—মনে হলো সেও যেন বলছে "নাটক নিয়ে কাহে আতা হ্যায় ইধার"। রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছি—মনে হলো যেন সকলে আমার দিকে চেয়ে আছে আর বলছে—নাটক লেখেন কেন ? সে এক জ্বালা !

তিনকড়ি : ঠিক বলেছে sir ! আপনার বইয়েতে আমারও মাঝে মাঝে ঐ রকম sensation হয়। মানে আমি 'আহাম্মকের' তিনকড়ি। কথাবার্তা সরল—কোথাও একটা প্যাঁচবিহীন কিছু বলে ফেললাম, আর যাবে কোথায় ? আহাম্মক হলেও মানুষ তো। কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠলো। খালি মনে হয় লোকেরা সব তাকিয়ে হাসছে। ভাবছে কি গাধা রে বাবা ! পরের কথা আর মুখ দিয়ে বেরোয় না—তো-তো করে মরি। একেবারে ঘেমে নেয়ে একাকার—

পরিমল : এই কড়িবাবু. কি হচ্ছে কি ? আবার বাজে কথা আরম্ভ করেছেন। কিন্তু সহরে তো আর একটা থিয়েটার নয় ! আপনি 'দীপ-মহলে' গেলেন না কেন ?

নাট্যকার : গিয়েছিলাম তো। আপিস ঘরে যেতেই ম্যানেজার নিশাপতিবাবু হাত থেকে scriptটা টেনে জিজ্ঞাসা করলেন—কি এনেছেন ? নাটক ? না নাটক নয় ? ভয়ে ভয়ে বললাম—আজ্ঞে

নাটক, ইবসেনের অনুসরণ। জিজ্ঞেস করলেন—ইবসেন? কল্যাণ সেনের কেউ হয় নাকি? বললাম, আজ্ঞে না, ইনি নরওয়ের লোক। 'অ' বলে হাঁক পাড়লেন—ওহে হরিপদ, একটা নম্বর দিয়ে তাকে ঢুকিয়ে রাখো। বললাম—দয়া করে একটু পড়ে দেখবেন। তিনি বললেন—আজ্ঞে না। ফেরত তো দিতে পারি না, তাহলে আপনি আবার কাগজে চিঠি লিখবেন। তাই নম্বর দিয়ে তুলে রাখলাম। আর নাটক তো আমাদের চাই না: আমাদের চাই নাটক-নয়।

পরিমল: উঃ! আপনি কোনো প্রতিবাদ করলেন না!

নাট্যকার: না। বরং শেষ পর্যন্ত দেখবার জন্যে বললাম—আমার এটা 'নাটক-নয়'ও হতে পারে।

পরিমল ও নেপেন: আপনি ওদের কাছে surrender করলেন!

নাট্যকার: শোনো আগে সবটা। তিনি বললেন—ওটা যে তা নয় সে আমি আপনার চরিত্রলিপিতে চোখ বুলিয়েই বুঝে নিয়েছি (সকলে 'সে-কি' গোছের একটা বিস্ময়ের শব্দ করে)। এই—এই রকম অবাক আমিও হয়েছিলাম—তাই দেখে ভদ্রলোক ড্রয়ার থেকে একটা ছাপানো লিষ্ট বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন—এর যে কোনও তিনটের কম্বিনেশন হলে আমরা বিবেচনা করতে পারি। পড়ে দেখি টাইপ চরিত্রের একটা লিষ্ট—কালা, বোবা, খোঁড়া, নুলো, কুঁজো, কানা, হাতকাটা, নাককাটা, দন্তুর, বডি ওরিয়েণ্টাল।

পরিমল ও নেপেন: থাক থাক—থামুন—

তিনকড়ি: আপনার কথা শুনে ফট্‌কের একটা কথা মনে পড়ে গেল স্যার। 'বোকার মতো যেখানে সেখানে যাস বলেই তো খিস্তি খেয়ে মরিস'। আপনি ঐ সব আবোল-তাবোল জায়গায় গেলেন কেন? (উত্তেজিত হইয়া) কোথায় রঙ্গভারতীতে নট-সম্রাট আদিত্য বাঁড়ুজ্জ্যের কাছে যাবেন—তা নয়, কোন্ হরিপদ—কোন্ দারোয়ান—যতসব পকেটমারের দল। আপনি—(উত্তেজনার চোটে

তিনকড়ি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে আর কথা বলিতে পারে না।)

বিপাশা : আচ্ছা ঐ কথাটা শুনতে বেশ চমৎকার—না? দন্তুর। কি রকম একটা মিউজিক আছে কথাটায়, আচ্ছা দন্তুর মানে কি?

পরিমল : (ভেংচাইয়া) দন্তুর মানে কি? দন্তুর মানে যার গোটাচারেক দাঁত ঠোঁটের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে, বুঝলে? হচ্ছে কাজের কথা তার মধ্যে উনি এলেন মিহি গলায় দন্তুর মানে কি? ওর মধ্যে যেন একটা মিউজিক আছে! (নাট্যকারকে) আপনারও হয়েছে যেমন, যতসব ললিতা সখীকে নিয়ে নাটক লিখেছেন।

বিপাশা : দেখুন, আপনার ঐ পরিমল তখন থেকে আমাকে বলছে। কেন? আমি কি ওর খাই না পরি? আমার বড্ড কান্না কান্না পাচ্ছে। আমি কিন্তু সত্যি কেঁদে ফেলবো। (কান্না)

নাট্যকার : আরে ছিঃ কাঁদে না। আর তোমাকেও বলি পরিমল, ওর দোষ কি? ওকে আমি যেমন তৈরী করেছি—তেমনিই তো হবে। ছিঃ ভাই বিপু—পরিমলের কথায় কি কাঁদতে আছে, ওটা চিরকালই ঐরকম।

তিনকড়ি : ভাই কি মশাই! ওযে আপনার মেয়ে—মানসকন্যা!

নাট্যকার : আরে ঐ হলো। নাটক লিখলে মেয়েও ভাই হয়—ভাইও মেয়ে হয়। এটা হলো···

নেপেন : যাকগে ওসব কথা, "রঙ্গভারতী"তে তো যান নি।

নাট্যকার : যাইনি!

তিনকড়ি : যান নি?

নাট্যকার : যাই নি।

তিনকড়ি : যান নি?

নাট্যকার : (চীৎকার করিয়া) গিয়েছিলাম—

তিনকড়ি : (উৎসাহিত হইয়া) গিয়েছিলেন!

নাট্যকার : বুকিং অফিসে জিজ্ঞাসা করলাম—নট-সম্রাটের সঙ্গে দেখা হবে? হাঁ-ও নেই না-ও নেই। সেদিন ছিলো 'জাহানারা'।

পাঁচটা টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—একটা টিকিট। টিকিটটা যখন দিচ্ছে তখন টাকাটা আটক রেখে বললাম নট-সম্রাটের সাথে একটু দেখা হবে ? বিশেষ দরকার—। টাকাটা মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বললে—তিনি তো এখন নেই। অথচ, আমি জানি তিনি আছেন। মরীয়া হয়ে বললাম—আমি স্বর্গতঃ নাট্যকার সুরেন চাটুজ্যের বাড়ী থেকে আসছি—মানে সম্পর্কে তাঁর নাতি আমি। কথাটা আধা সত্যি। সুরেনবাবুর ছেলে আমার মেশোমশাই। 'জাহানারা' সুরেনবাবুরই লেখা। বুকিং ক্লার্ক ভড়কে গিয়ে খবর দিলে—সুরেনবাবুর নাতি এসেছে। আর আমিও একেবারে নট-সম্রাটের ঘরে হাজির। নাটকটা নেড়েচেড়ে বললেন—এখন তো আমার সময় হবে না। মাস আষ্টেক পরে চেঞ্জে যাবো—তখন একবার এসো। আর হ্যাঁ—আর একটু পরিষ্কার করে কপি করো।

নেপেন : আমি কিন্তু এতক্ষণ একটি কথাও বলিনি, আপনার বোকামীর দৌড়টা দেখছিলাম। আপনি একজন নতুন নাট্যকার, ওসব বড়ো বড়ো জায়গায় যানই বা কেন ? কলকাতার অলিতে গলিতে কতো ছোটো ছোটো নাটকের দল আছে জানেন ?

নাট্যকার : হ্যাঁ, জানি। আমতলা লেন থেকে আমড়াতলা ষ্ট্রীট—সমস্ত দল ঘুরে এসেছি। সেখানে 'মিশর কুমারী' আর 'কঙ্কাবতীর ঘাট'এ মাথা ফাটিয়ে চলে এসেছি। আমার নাটক নেবে কেন ? তবে হ্যাঁ, এসব বাদেও দু'চারটে দল আছেন, যাঁরা ভেতরে বসান, নাটক শোনেন—তবে এঁদেরও দু'টাইপের গণ্ডগোল ; হয় ইডিওলজিকাল, আর না হয় টেক্‌নিকাল।

নেপেন : তার মানে ?

নাট্যকার : মানে কেউ কেউ 'করবো' বলে নাটক নেন, আর বছর-খানেক পরে বলেন হলো না, ইডিওলজিকাল গণ্ডগোল। আবার কেউ বা 'নেবো নেবো' করেও শেষ পর্যন্ত না নিয়ে বলে টেক্‌নিকাল গণ্ডগোল। তবে হ্যাঁ, দু'চারজন মাঝে মাঝে এসে বলেন

'আমাদের একটা Simple নাটক লিখে দিন'।

নেপেন : তা এই 'আহাম্মক'টাকে দিলেই তো পারেন—ওটা তো খুব Simple—

তিনকড়ি : ঠিকই তো, আমি তো খুব Simple, স্যার।

নাট্যকার : উঁহু, এই ক'খানা তো আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়েছি। তাঁরা বলেন, 'এ নয়—একটু Simple'। তাঁদের Simpleটা যে কি তা তাঁরাও ঠিকমত বলে উঠতে পারেন নি, আমারও নাটক লেখা হয়নি।

নেপেন : তাহলে উপায় ?

পরিমল : উপায় খুঁজে বার করুন। আরও নতুন নাটক লিখুন—মাসিক সপ্তাহিকে ক্রমশঃ বার করুন।

নাট্যকার : কাগজে নাটক ! হুঃ !

নেপেন : আপনি বলতে চান পত্র পত্রিকায় নাটক ছাপাবে না।

নাট্যকার : অন্ততঃ ছাপায়নি—। মাসিক 'আমার দেশ'এর মালিক শুধু এর ব্যতিক্রম—সত্তর বছর বয়স হলেও ভদ্রলোক ধৈর্য ধরে সব পড়েছিলেন—যেদিন তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হবার কথা সেদিন সকালে কাগজ খুলে দেখি—(সবাই উৎসুক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকায়) তিনি মারা গেছেন—

সকলে : অ্যাঁ ! মারা গেলেন !

নাটকার : হ্যাঁ, ইডিওলজিক্যাল, টেকনিক্যাল—কোনো তর্ক না তুলে ভদ্রলোক বোধহয় মরে গিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন।

তিনকড়ি : তাহলে আমাদের গতি কি ?

নাট্যকার : (বিরক্তির শেষ সীমায়) ভোলা। ভোলা তোমাদের গতি করবে কাল সকালে। তোমরা তারই কাছে যাও।

বিপাশা : Ugly-nasty idea। ভোলা গতি করবে কি আমাদের—আপনাকেই নতুন করে নাটক লিখতে হবে—লিখুন না ওই থিয়েটাররা যা চায় তেমনি করে—

পরিমল : আহা আহা হা—যা চায় তেমনি করে—খবরদার আপনি ওর

কথা শুনবেন না, ওদের রুচির কাছে নিজেকে বিক্রী করবেন না। আপনি এই বাস্তব জীবন নিয়ে নাটক লিখুন—দেখতে পাচ্ছেন না চার পাশের বাস্তব ঘটনাগুলোকে ?

নাট্যকার : না, আপাততঃ চার পাশের বাস্তব ঘটনা হলো ভৌতিক—কাজেই ভূতের গল্প লিখবো—যাও।

নেপেন : বাঃ এ তো আপনার জুলুম—দেখছি।

নাট্যকার : (চীৎকার করিয়া)—চোপ। জুলুম আমার না তোমাদের ? —আমারই সৃষ্ট চরিত্র—আমার কাজের সমালোচনা করবে আমারই সামনে—

নেপেন : বাঃ ! তা আপনি জনগণের দাবী না মেনে যা খুশী······

নাট্যকার : জনগণ কী চায় আর না চায় তার কী কোনও Barometer আছে ? নেই—

তিনকড়ি : তাহলে আমাদের উপায় ?

নাট্যকর : উপায় আবার কী—আমি আর নাটক লিখবো না, তোমরা জাহান্নামে যাও।

[ভজা, ফটকে, লেতো, পকেট-কাটা, গুণ্ডা প্রভৃতির প্রবেশ]

নেপেন : ওই নিন—ভজা, ফটকেরাও এসে গেছে। এবার ওদের সামলান !

ভজা : না লিখে একবার দেখুন না ? আপনার ঘাড় লিখবে !

লেতো : (ভীড়ের মধ্যে মাথা গলাইয়া) ধূমকেতু দেখেছেন Sir ? ধূমকেতু ?—না দেখে থাকলে দেখে আসুন—তাহলে আর মুখ দিয়ে নাটক লিখবো না বেরুবে না !

পকেটকাটা : ওঃ সে কি ঘুরে গেল মাইরি—! (শিষ দিয়া উঠে।)

গুণ্ডা : তুই থাম ! লাটকে পকেট কেটে খাস্—তুই এ সবের কি বুঝিস রে ? আরে মশায়, আমি যে আমি—আপনার লাটকের একটা গুণ্ডা, আমি শুদ্ধ দেখে বুঝলাম এটা লাটকই নয়।

ভজা : ওঃ সে যে কী, তার কোনো ঠিক পাবেন না Sir ! পোঁ-পোঁ করে Stage ঘুরে যাচ্ছে, আর খেপে খেপে লাক্স্ সাবানের star

কিংবা হাবা কালা খোঁড়া মুলো! ওরই মধ্যে আবার এন্‌কোর পড়ছে। একজন হাতে তালি দিয়ে বললে—পলিতাদি, আপনার সেই ময়ূরকণ্ঠী জামাটা পরে আস্থন না—! পলিতাদি অমনি ময়ূরকণ্ঠী জামাটা পরে এলেন। (পা জড়িয়ে ধরে) আপনার হু'টি পায়ে পড়ি Sir! ভালো হোক খারাপ হোক, আপনি লিখে যান—থার্ডক্লাশ, থার্ডক্লাশই সই। তবু নাটক না হোক কাছাকাছি তো হবে। কিন্তু ওদের খপ্পরে যদি কোনদিন পড়ি তো দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো, দোহাই আপনার!

লেতো : (ভজার জামা ধরিয়া তাহাকে টানিয়া) আরে অতো আকুতি কিসের? ওর ঘাড় নাটক লিখবে। না লিখলে, সোডার বোতল মেরে নাটক লেখাবো না!

নাট্যকার : না বাবা—সোডার বোতল মারতে হবে না—আমি না হয় এমনিই লিখলাম—শুনবে কে?

পরিমল : এই দেখ, বীরেনদা এখনো পৌছল না—! থাকলে একটা উপায় বাৎলে দিতো—

নেপেন : তা আপনি এক কাজ করুন না। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মিটিং ডাকুন—Loud Speaker নিয়ে নাটক শোনান—প্যারালাল বারের ওপর উঠে।

তিনকড়ি : হ্যা—পুলিসেও ধরবে না,—ভাববে ঝাল চানাচুর বেচছে—

নেপেন : অভিনব একটা কিছু হোক্, নইলে চৈতন্য হবে না।

(লেতো ফট্‌কের দল সকলে হৈ চৈ করে ওঠে)

নাট্যকার : কিন্তু এদের একটু চৈতন্য দাও, আমি না হয় Loud Speaker নিয়ে মাঠে ঘাটে নাটক শোনাবো কাল থেকে—

বিপাশা : কিন্তু আমার তো ও চলবে না।

নাট্যকার : কি চলবে না?

বিপাশা : ঐ মাঠে ঘাটের ব্যাপার। আমি শুকনো চুলে ল্যাভেণ্ডার মেখে পিয়ানো বাজাই। আমার বাঁধা Stage চাই—সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো—ডানলোপিলোর Seats. সামনে ভেলভেটের কার্টেন—

আমার ও মাঠে পোষাবে না—তার চেয়ে আপনি আমায় একটু খোঁড়া করে দিন—পেশাদার থিয়েটারে নিয়ে নেবে—

নাট্যকার : খোঁড়া করে দেবো ?

পরিমল : খবরদার না—ঐ সব বিকৃতিকে প্রশ্রয় আপনি কিছুতেই দিতে পারবেন না। আরও বেশী বলিষ্ঠ—

বিপাশা : আপনি আমায় খোঁড়া করে দিন। বুঝতে পারছেন না—খোঁড়া নেংচে চলে—একটা Sympathy—একটা···

তিনকড়ি : যার যাই করুন স্যার, আপনার ঐ শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধসত্ত্বা আমার চাই না। লোকে বেকুব বলবে,—বলবে নির্বোধ, আহাম্মক। আমায় একটা 'ব্লাক্ মার্কেটিয়ার' করে দিন! আপনি ফট্‌কেকে আমার জায়গায় বসিয়ে আমাকে ফট্‌কে করে দিন—আমি 'স-স' করে পকেট মেরে খাবো। এর পরের নাটকে আমি লেঙ্গি মেরে খাবো!

নাট্যকার—তা হয় না তিনকড়ি। ও লেঙ্গি মেরে খাওয়ার চেয়ে আহাম্মক হয়ে থাকা অনেক ভালো।

তিনকড়ি : ও—আমাদের বেলা যতসব বড়ো বড়ো কথা। আপনি নিজেরটা দেখুন। নিজে যে লেঙ্গি মারতে আরম্ভ করেছেন—তার বেলা বুঝি কিছু নয়! লেখবার কথা নাটক, আর লিখছেন ভূতের গল্প।

পরিমল : ওসব চলবে না—নাটক আপনাকে লিখতেই হবে—

সকলে : হ্যাঁ—নাটক চাই—আমাদের দাবী মানতেই হবে।

তিনকড়ি : আমার কথাটা মনে রাখবেন—

পরিমল : বাঃ! আর আমারটা—? কলকাতার কালো পীচ আমার বুকের রক্তে লাল হয়ে উঠবে পুলিসের বুলেটে, বুঝলেন? ওই সব "আলো ঝলমলানি" চলবে না।

নেপেন : আর আমাকে সাত্যিকারের সাহিত্যিক। খেতে পাই বা না পাই তবু যাতে সত্যিকারের সাহিত্য লিখে যাই; মানে No রম্য রচনা—No ভূতের গল্প।

বিপাশা : আর খোঁড়া নেংচে চলে—আমি খোঁড়া হয়েই বাঁচতে চাই।

পরিমল : আমি মরতে চাই। একটা Heroic death.

[চারিপাশ হইতে সম্মিলিত দাবীতে বিভ্রান্ত নাট্যকার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। লেতো ফট্‌কের দল শিষ দিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ অন্ধকার হইয়া যায়। পরক্ষণেই আলো জ্বালিয়া উঠে—যেভাবে মূর্তিগুলির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল ঠিক সেইভাবেই তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে। নাট্যকার পূর্ববৎ একা টেবিলে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া আছে দেখা যায়। আলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার মাথা তুলিয়া চাহিয়াছে। তাহার দৃষ্টিতে একটা কিছু খুঁজিয়া পাইবার ভাব। ঘোর কাটিতেই মুখ চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ফাউন্‌টেন পেন খুলিয়া কি যেন লিখিতে যায়। কালি ফুরাইয়া গিয়াছে—বোঝা যায়, তুইবার কলম ঝাড়া দেখিয়া। কালির দোয়াত হইতে কলমের প্যাঁচ খুলিয়া কালি ভরিতে ভরিতে ভোলাকে ডাকে]

নাট্যকার : ভোলা—ভোলা—

[সেই মুহূর্তেই বাহিরে মহিলা কণ্ঠস্বরে ডাক শোনা যায়—'ভোলা' —'ভোলা'। —'কোন্ দিকে যাইরে বাপু !'—পরক্ষণেই—'আরে বৌদিমনি এয়েছেন—বাবু তো ভূতের গল্প নিকছেন—'এই বলিতে বলিতে ভোলা নাট্যকারের স্ত্রীকে লইয়া প্রবেশ করে]

নাট্যকার : (সবিস্ময়ে এবং খুশীতে) রমা ! তুমি ! এই দেখ. তোমাকেই চিঠি লিখছিলাম।

স্ত্রী : আমাকে ! কই দেখি—তুমি নাকি ভূতের গল্প লিখছ ?

নাট্যকার : না, এখনো লিখিনি—। এইমাত্র নাটকের একটা প্লট মাথায় এসেছে—এখুনি লিখতে হবে—fresh copy তোমাকেই করে দিতে হবে—please এই বারটি—দেবে তো ?—(স্ত্রী মৃদু হাসিয়া সম্মতি দেয়—সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার ভোলার উপস্থিতি বিস্মৃত হইয়া একটু আদর করে স্ত্রীর চিবুক ধরিয়া। তদ্‌দৃষ্টে ভোলার অন্তর্ধান। নাট্যকারের হাত কালি ভরার পর কলমের প্যাঁচ লাগাইতে তৎপর হইয়া উঠে—মুখে চোখে তাহার খুশীর আমেজ। ইহারই মধ্যে পর্দা নামিতে সুরু করে।)

নবদূর্বাদলশ্যাম

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকালিপি ॥

রোহিতবাবু—রবি ঘোষ

সুখময়—সমর নাগ

দূর্বাদলবাবু—তরুণ মিত্র, উৎপল দত্ত (পরে)

শ্যামলিমা—নীলিমা দাস

পরিচালনা—উৎপল দত্ত

চরিত্র-লিপি

শ্রীদূর্বাদল চৌধুরী—কর্তা

শ্রীমতী শ্যামলিমা চৌধুরী—গিন্নী

সুখময়—ভৃত্য

রোহিত—অতিথি

[দূর্বাদলবাবুর বাড়ির বৈঠকখানা। রোহিতবাবু একা]

রোহিত : নামটা একটু বিদঘুটে হলেও লোক কিন্তু বেশ ভালো। সেদিন চায়ের দোকানে তো আলাপ হলো। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বেশ চমৎকার লোক। কি রকম আপ্যায়ন করে বলেন—আমরা কিন্তু কোনো কথা শুনবো না। যে ক'দিন এখানে আছেন, সকাল-সন্ধ্যে দু'বেলাই আমাদের ওখানে আসতে হবে। এ কিন্তু বেশ ভালো হলো……চমৎকার হলো! যা চাইছিলাম ঠিক তাই হলো! কিন্তু চাকরটা? আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে সে গেল কোথায়? ভেতরে একটা খবর দিতে হবে। হয়তো খবর দিতেই গেছে। কিন্তু না……যে রকম তাড়াহুড়ো করে গেল, নাম-ধাম জিজ্ঞেস না করেই……(মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল)……ও বুঝেছি, পেট খারাপের ধাত! হতেই হবে! আমারও যে ও রকম হয় মাঝে মাঝে! (ভৃত্য সুখময়ের প্রবেশ) এই যে! সকাল থেকেই পেটটা খারাপ করেছে তো?

সুখময় : আজ্ঞে না তো—

রোহিত : তাহলে? আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে যে ঐ রকম হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেলে? নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করার সময় হলো না তোমার।—আসছি, বলেই দৌড় দিলে—এ নিশ্চয়ই পেট-খারাপ! কি বলো? ঠিক বলছি না?

সুখময় : আজ্ঞে না। ডালটা ধরে উঠেছিলো—তাড়াতাড়ি নামিয়ে এলাম।

রোহিত : ও! তাই। আমি ভাবছিলাম বুঝি……

সুখময় : আজ্ঞে না।

রোহিত : কি না?

সুখময় : আজ্ঞে পেট-খারাপ।

রোহিত : না—মানে…আমারও মাঝে মাঝে ঐ রকম হয় কিনা।

সুখময় : (একগাল হাসিয়া) ও! হয় বুঝি? রোজ গাঁদাল পাতা সেদ্ধ খাবেন বাবু—একেবারে ভালো হয়ে যাবে।

রোহিত : (হতভম্ব অবস্থায় তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া) ও—ভালো হয়ে যাবে বুঝি···আচ্ছা···তাহলে না হয়···ও···হ্যাঁ···তোমার বাবুকে খবর দিয়েছ?

সুখময় : আজ্ঞে হ্যাঁ···যাই···(যে দিক দিয়া আসিয়াছিল তাহার বিপরীত দিকের প্রস্থান পথের দিকে অগ্রসর হয়।)

রোহিত : (মঞ্চের সম্মুখভাগে অগ্রসর হইয়া আসিয়া যেন নিজেকে বলিতেছেন এমনভাবে) কিন্তু ছোকরাটার সঙ্গে আলাপটা একটু জমিয়ে রাখলে মন্দ হতো না! কায়দা করে একটু জেনে নেওয়া দরকার--কর্তা-গিন্নী লোক কেমন! তা ছাড়া জলখাবার-টলখাবারগুলো তো ও-ই আনবে। শেষে পেট খারাপ মনে করে যদি···(ভৃত্যের প্রস্থান পথের দিকে অগ্রসর হইয়া) ওহে, শোনো শোনো······

সুখময় : (রোহিতবাবুর ডাকে ফিরিয়া আসিয়া) আজ্ঞে?

রোহিত : না···মানে···তুমি যা ভাবলে, আমার কিন্তু তা নয়!

সুখময় : (বিগলিতভাবে হাসিয়া) আজ্ঞে, তা বুঝেছি।

রোহিত : (পুনরায় হতভম্ব হইয়া) কি বুঝলে বলো তো!

সুখময় : (পুনরায় বিগলিতভাবেই হাসিয়া) আজ্ঞে, আপনার পেট খারাপ নয়।

রোহিত : কি করে বুঝলে?

সুখময় : (এক গাল হাসিয়া) আজ্ঞে, আমরা তিন-পুরুষে চাকর! লোকের আড়া দেখলে লোক বুঝতে পারি।

রোহিত : বাঃ—তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান লোক হে! তা তোমার নামটি কি?

সুখময় : আজ্ঞে, সুখময়। তা হ্যাঁ বাবু, আপনার নামটি?

রোহিত : (পুনরায় হতভম্ব হইয়া গিয়া) অ্যাঁ······আমার নাম? মানে?

সুখময় : (বেশ সপ্রতিভ ভাবে) না—মানে—আপনার নামটি ? বাবুকে তো বলতে হবে।

রোহিত : (সুখময়ের সহিত সমান তালে সপ্রতিভ হইবার চেষ্টা করিয়া) ও—বাবুকে বলতে হবে—না ? বলো—রোহিতবাবু এসেছেন—সেদিন চায়ের দোকানে যাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো।

সুখময় : কি বললেন ? রোহিত···মানে রুই···

রোহিত : বাঃ—তুমি তো বেশ বাংলা জানো দেখছি।

সুখময় : (বেশ গম্ভীরভাবে আত্মচেতনতার সহিত) আজ্ঞে, এইট্ ক্লাশ অবধি পড়েছিলাম।

রোহিত : বাঃ—তুমি তো লেখাপড়ায় বেশ ভালো দেখছি—

সুখময় : (মুখে একটা গর্বের হাসি ফুটিয়া উঠে) আজ্ঞে তা নেহাত মন্দ ছিলাম না ! তবে রোহিত আর এমন কি ? জানেন ? আমাদের গাঁয়ে একটা লোক ছিলো—তার নাম কি ছিলো জানেন ? গোপাদ—মানে গরুর ঠ্যাং।

রোহিত : বাঃ বেশ বেশ। তাহলে এবার যাও, বাবুকে একটা খবর দাও।

সুখময় : আজ্ঞে হ্যাঁ—যাই—(প্রস্থান পথের দিকে অগ্রসর হয়)

রোহিত : ও ! শোনো······শোনো······(সুখময় ফিরিয়া আসিলে) তুমি ছেলেটি কিন্তু বেশ চালাক-চতুর······বুঝলে······

সুখময় : (বিগলিতভাবে) আজ্ঞে, তা যা বললেন—

রোহিত : (যেন কোনো গোপন কথা বলিতেছেন এমনভাবে) তবে আমিও কিন্তু খুব বোকা-সোকাটি নই।

সুখময় : (একগাল হাসিয়া) আজ্ঞে, সেটা কি আর আমি বুঝিনি—দেখেই বুঝেছি !

রোহিত : বুঝেছো বুঝি ! বাঃ বেশ বেশ ! (হঠাৎ কি রকম সন্দেহ হয়—ঠিক বুঝেছে তো ?) কিন্তু···কি করে বুঝলে ?

সুখময় : (মুখে বেশ একটু জটিল হাসি, তাহাতে কিছুটা অহঙ্কার, কিছুটা সবজান্তা ভাব) আজ্ঞে, বুঝবো না ? আমি যে বাবু

চরিয়ে খাই !

রোহিত : বাবু চরিয়ে খাও ? (নিজের কানে কথাটি একবার যেন বাজাইয়া নেন) বাবু চরিয়ে খাও ! বাঃ···বাঃ-বাঃ-বঃ ! বেশ কথাটি তো ! তুমি তো দেখছি বেশ ভালো ভালো কথা কও হে ! তোমায় তো দেখছি চার-আনা পয়সা দিতে হয়।

সুখময় : (একগাল হাসিয়া) আজ্ঞে, তা দিলে কিন্তু মন্দ হয় না।

রোহিত : কিন্তু একটা কথা আছে। আমি কিন্তু মিথ্যে কথা সহ্য করতে পারি না।

সুখময় : (গম্ভীরভাবে চোখ বুজিয়া) আজ্ঞে, মিথ্যে আমি বলি না।

রোহিত : বললেই কিন্তু আমি ধরে ফেলি।

সুখময় : (গম্ভীরভাবে, কিন্তু চোখ খুলিয়া) আজ্ঞে বললে তো ধরবেন ! আমার তো মিথ্যে বলা বারণ।

রোহিত : ও—বারণ বুঝি। তা বেশ ! আচ্ছা সুখময় তুমি যখন এতো ভালো, তখন তোমার কর্তাটি নিশ্চয় আরো ভালো ?

সুখময় : আজ্ঞে অমন ভালো বড়ো একটা দেখা যায় না।

রোহিত : আর গিন্নী ?

সুখময় : আজ্ঞে—তাকে তো ভালো বললে খারাপ বলা হয়। তিনি তো চমৎকার !

রোহিত : দুজনেই খুব সাদাসিদে···না ?

সুখময় : আজ্ঞে, সাদাসিদে বলে সাদাসিদে ! একফোঁটা কালো নেই, এতটুকু বাঁকা নেই !

রোহিত : (যেন কোনো গোপন কথা বলিতেছেন এমনভাবে) দুজনে খুব ভাব—না ?

সুখময় : আজ্ঞে, আজ তিন বছর কাজ করছি—একদিন এতটুকু ঝগড়া দেখলাম না—এক মিনিট এতটুকু তর্ক শুনলাম না। এক এক সময় তো মানুষ বলেই মনে হয় না। স্রেফ দু'টি পায়রা—বক্-বকম্—বক্-বকম্ ! আমার নিজেরই কি রকম লজ্জা-লজ্জা করে সার !

রোহিত : এই দেখ—কথায় কথায় ভুলে গিয়েছিলাম। এই নাও, তোমার চার আনা পয়সা।

সুখময় : (বেশ লজ্জা-লজ্জা ভাব) আজ্ঞে—একটু বেশী হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে—

রোহিত : (সুখময়ের লজ্জা দেখিয়া নিজেও যেন একটু লজ্জায় পড়িয়া গিয়াছেন) না না—এ আর এমন বেশী কি ! মোটে তো চার গণ্ডা পয়সা।

সুখময় : (পয়সা হাতে লইয়াছে। আবার যেন ফিরাইয়া দিতে পারে, এমন ভাব দেখাইয়া) দেখুন—আপনার কোনো অসুবিধে হবে না তো ? তাহলে না হয়······

রোহিত : পাগল নাকি ! চার আনা পয়সায় আবার অসুবিধে······ কোনো অসুবিধে নেই ! এখন তুমি কর্তা-গিন্নীকে একটু খবর দাও। বলো—আমি দেখা করতে এসেছি···কেমন।

সুখময় : আজ্ঞে, এই দিলাম বলে। (সুখময় পিছনে দক্ষিণ কোণের প্রস্থান পথের দিকে অগ্রসর হয়।)

রোহিত : (একটি চেয়ার মঞ্চের সম্মুখভাগে লইয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তারপর আপন মনে) হুঁঃ! বলে কিনা —অসুবিধে হবে না তো ! অসুবিধে ? আরে চার আনা পয়সা তো কম দিয়েছি ! জায়গা যা পেয়েছি, আর খবর যা দিয়েছে— তাতে তো আর একটু বললে কইলে আট আনাও দিয়ে ফেলতে পারতাম। বাবাঃ—এখনও বেশ ক'টা দিন এখানে থাকতে হবে। এ ভারী চমৎকার হলো ! হোটেলে শুধু খাওয়াটি আর শোয়াটি। আরে বাবা কিছু না হোক দুবেলা চা-জলখাবারটা তো হবে। খরচা অর্ধেক না হোক, অর্ধেকের কাছাকাছি তো কমে যাবে। তারপর ? দু-একদিন কি আর নেমতন্নটা হবে না, সকাল-রাত্তিরে খাওয়ার জন্যে ? বাস—বাস ? (নিজের মাথা নিজেই চাপড়াইয়া) সাবাস ভাই—চমৎকার ! ফন্দী যা এঁটেছো না। আহা ! কবে আমার সেদিন হবে ! বেড়াতে এলে শুধু ট্রেন ভাড়াটাই লাগবে—

খাওয়া-থাকা সবটাই পরের খরচায় ! আহা ! স্বামীর নাম দূর্বাদল, স্ত্রীর নাম শ্যামলিমা আর বাড়ীর নাম নবদূর্বাদলশ্যাম। আহা কি নাম রে ! কর্তা, গিন্নী, বাড়ী—সব যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে—আয়···ওরে আয়···তুই বড়ো শ্রান্ত···কোলে আয় ! (সুখময় কিন্তু তখনও যায় নাই। যে দিকে রোহিতবাবু বসিয়াছিলেন, তাহার বিপরীত দিকে দূরপ্রান্তের প্রস্থান পথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে চড়-কিল-ঘুসি মারার ও নাকে-কানে মোচড় দেওয়ার ইঙ্গিত করিতেছিলো। হঠাৎ তাহার নাকে কিসের গন্ধ আসিল।)

সুখময় : সর্বনাশ !

রোহিত : কেন···কেন ? কি হলো ?

সুখময় : (প্রস্থানোদ্যত) দুধটা ধরে গেল !

রোহিত : যাও···যাও···এখনও দাঁড়িয়ে আছে ! খাবার জিনিস ! ধরা দুধে চা বড় খারাপ হয়।

সুখময় : আজ্ঞে যাই ! আর আপনার আসার খবরটাও তো বাবুকে দিতে হবে। (দ্রুত প্রস্থান করে।)

রোহিত : (হতভম্বের ন্যায়) এখনও দাও নি। (ততক্ষণে সুখময় প্রস্থান করিয়াছে) নাঃ—মাথা বলে কোনো পদার্থ নেই ! (তারপর আপন মনে ঘাড় নাড়িয়া সমর্থন জানাইতে জানাইতে) কিন্তু তা হোক···ছোকরাটা বেশ চটপটে ! বাড়িটিও ভালো, ঘরটি তো চমৎকার ! আসবাব-পত্তরও মন্দ নয়···চেয়ার-টেয়ারে বসে আরাম আছে। (নিজেরই দাড়ি ধরিয়া নিজেকেই শুনাইতে লাগিলেন) ওরে বাবা···যা পেয়েছিস বেশ পেয়েছিস। এর চেয়ে ভালো আর পাবি না। এখন যদি আলাপটা জমিয়ে নিতে পারিস—তো আয় না, প্রত্যেক বছর আয় ! চেঞ্জকে চেঞ্জও হবে অথচ খরচও অর্ধেকের কম। (কাহারা যেন আসিতেছে বলিয়া মনে হয়) ঐ বোধ হয় কর্তা গিন্নী আসছেন। (খুব তাড়াতাড়ি) ঘরটি ভালো, বাড়িটি ভালো, বসবার জায়গাপত্তর বেশ ভালো, চাকরটিও বুদ্ধিমান !···

আহা…কর্তা-গিন্নী যদি এই রকম ভালো হয় না?…আহা বাড়ি নয়তো…যেন মধুভাণ্ড! (জিভে মধু চাটিবার শব্দ করিয়া) আহা—হাঁ…হা-হা…!

[শ্রী ও শ্রীমতী দূর্বাদলের প্রবেশ]

শ্রীদূর্বাদল : আজ আমরা আপ্যায়িত হলেম রোহিতবাবু।

শ্রীমতী দূর্বাদল : আমাদের কি ভাগ্য… ..আজ আপনি আমাদের এখানে এসেছেন।

শ্রী : ভালো আছেন তো রোহিতবাবু?

শ্রীমতী : সত্যি…আপনি যে মনে করে এখানে এসেছেন…

শ্রী : আর আসা বলে আসা! একেবারে ঠিক সময়ে……

রোহিত : সত্যি?

শ্রীমতী : সত্যি মানে? একেবারে ঠিক যে সময়টিতে দরকার।

রোহিত : (গদগদ ভাবে) না—মানে—এভাবে যে আপনাদের কাজে লাগতে পারবো……

শ্রীমতী : আচ্ছা রোহিতবাবু……

রোহিত : আজ্ঞে?

শ্রী : (রোহিতবাবুর বাঁ হাত ধরিয়া সজোরে নিজের দিকে টানিয়া) মাফ করবেন। আমি কিন্তু প্রথম…

শ্রীমতী : (রোহিতবাবুর ডান হাত ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া) কক্ষনো না—প্রথম আমি!

শ্রী : (রোহিতবাবুকে নিজের দিকে টানিয়া) কিছুতেই না! হতেই পারে না! (স্ত্রীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) উঃ!

শ্রীমতী : কি শুনছেন ওর কথা, রোহিতবাবু! দেখছেন না? আবোল-তাবোল বকছে।

শ্রী : আবোল-তাবোল?

শ্রীমতী : একশোবার আবোল-তাবোল! নিশ্চয়ই আবোল-তাবোল!

শ্রী : দেখেছেন রোহিতবাবু, আমার শাশুড়ি ঠাকরুণ মেয়েটাকে ছোটবেলায় ভদ্রতা পর্যন্ত শেখান নি!

শ্রীমতী : ভদ্রতা ! তুমি কি ভদ্দর লোক নাকি, যে তোমার সঙ্গে ভদ্রতা করে কথা কইতে হবে ?

শ্রী : কি বললে ?

শ্রীমতী : বললাম তুমি ছোটলোক !

শ্রী : আর তুমি কি জানো ? তুমি বজ্জাত ! নির্বোধ মেয়ে মানুষ কোথাকার !

শ্রীমতী : গর্দভ বেটাছেলে কোথাকার !

শ্রী : কি বললে ?

শ্রীমতী : বললাম তুমি একটি গাধা !

শ্রী : আহা ! মেয়েটার মাথায় বজ্রাঘাত হয় না গো ! স্বামীকে বলে গাধা ! দেখো, তুমি ওঁকে বিরক্ত করছো ! ওঁকে তুমি ছেড়ে দাও বলছি !

শ্রীমতী : বিরক্ত আমি করছি না তুমি করছো ? ছেড়ে দাও বলছি !

শ্রী : আমি কিন্তু তোমায় শেষবার বলছি—ছেড়ে দাও।

(এতক্ষণ সামনে রোহিতবাবুকে লইয়া টানাটানি চলিতেছিল। রোহিতবাবু আর সহ্য করিতে পারিলেন না। আকুল কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন—উঃ !)

শ্রী : (তখন রহিতবাবু শ্রীমতীর আয়ত্তে) শুনতে পাচ্ছ ? তোমার টানাটানিতে ওঁর লাগছে। উনি চেঁচাচ্ছেন !

রোহিত : (কোনমতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়াছেন। নিজের গায়ে-পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে) মাফ করবেন ! এখন দেখছি আপনারা একটু ব্যস্ত। আমি না হয় পরে একদিন আসবো।

শ্রী : না না, ব্যস্ত কোথায় !

শ্রীমতী : আমাদের এখন কোনো কাজ নেই ! আপনি এলেন, না বেঁচে গেলাম ! তবু একজন গল্প করার লোক পাওয়া গেল।

রোহিত : না না—মানে তবুও···

শ্রী : তবুও-টবুও নয় ! বরং উলটোটাই ! আসুন আপনাকে বলি। (একটি চেয়ার টানিয়া) বসুন।

শ্রীমতী : সত্যি একেবারে উল্‌টো ! (আর একটি চেয়ার টানিয়া আনিয়া) বসুন—আপনাকে বলি তাহলে।

রোহিত : ধন্যবাদ। (শ্রীমতী প্রদত্ত চেয়ারে বসিতে যইতেছিলেন)

শ্রী : না না, ওটা নয়···এইটে !

রোহিত : ও, মাফ করবেন—(চেয়ারে বসিতে গেলেন)

শ্রীমতী : না না—ওটাতে নয়—এটাতে বসুন।

শ্রী : না !

শ্রীমতী : হ্যাঁ !

শ্রী : আচ্ছা—আর কতক্ষণ চালাবে বলো তো ! একটু শান্তি অন্ততঃ রোহিতবাবুকে দাও !

রোহিত : মিছিমিছি কাজের সময়ে এসে আমি আপনাদের ব্যস্ত করলাম। আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।

শ্রীমতী : কিন্তু কেন ?

শ্রী : না না—ওসব কথা আপনি একেবারে মনে আনবেন না।

শ্রী ও শ্রীমতী : (একসঙ্গে যে যার নিজের চেয়ার ধরিয়া) বসুন। (রোহিতবাবু চেয়ারে বসিতে আসিলে, শ্রীমতী তাঁহার চেয়ারটি রোহিতবাবুর পিছনে আনিয়া দিলেন। রোহিতবাবু বসিতে যাইবেন এমন সময় শ্রীদূর্বাদল—'না ওটাতে নয়'—বলিয়া চেয়ারটি সরাইয়া লইতেই রোহিতবাবু পড়িয়া গেলেন।)

শ্রীমতী : হলো তো ? সাধে তোমায় গাধা বলি ?

শ্রী : (তাঁহার পক্ষে ক্রুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক) কি ! দোষটা বুঝি আমার একার ? আর তোমার দোষ নয় ? ওঁর ওই চেয়ারটা পছন্দ নয়, আর তুমি ওইটাতেই ওঁকে জোর করে বসাবে ! কথা মন্দ নয় ! আহা—মুখটা যদি ওঁর থেঁতো হয়ে যেতো তো বেশ হতো ! পুলিশে খবর দিতাম—হাতে হাত-কড়া দিয়ে ধরে নিয়ে যেতো একেবারে। গাধা !—গাধা আমি না তুমি ! আশ্চর্য, আমি দেখেছি, যতো কিছু জোটে কিনা আমারই বরাতে ! (ততক্ষণে রোহিতবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন) লাগেনি তো রোহিতবাবু ?

রোহিত : (রোহিতবাবুর লাগিয়াছে বিলক্ষণ—কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে পিছনে হাত ঘসিতে ঘসিতে) নাঃ—তেমন কিছু নয়।

শ্রী : শুনে বড়ো আনন্দ হলো। আসুন এদিকটায় বসুন।

(রোহিতবাবু এবার পড়ি-কি-মরি অবস্থায় দৌড়াইয়া গিয়া চেয়ারটিতে বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী সামনে আসিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে)

শ্রীমতী : সত্যি আপনার লাগেনি তো ?

শ্রী : (শ্রীমতীকে পাশ কাটাইয়া আসিবার চেষ্টা করিয়া) সত্যি যদি লেগেও থাকে তবে তার জন্যে দায়ী তুমি !

শ্রীমতী : আমি ? না, তুমি ?

শ্রী : তুমি !

শ্রীমতী : কক্ষনো না।

(দুইজনে রোহিতবাবুকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।)

শ্রী : তুমি থামবে কিনা ?

শ্রীমতী : আমার ইচ্ছে না হলে নয়।

শ্রী : তোমার ইচ্ছে না হলে নয় ?

শ্রীমতী : না—আমার ইচ্ছে না হলে নয়।

রোহিত : (নিজেকে) না এলে কি চলতো না রোহিত ?

শ্রী : ভগবান সাক্ষী ! আমার কিন্তু হাত চলবে।

শ্রীমতী : য্যাঃ—য্যাঃ। ওরকম হাত-চালানে-ওয়ালা আমার অনেক দেখা আছে।

শ্রী : পাজী মেয়েমানুষ !

শ্রীমতী : বজ্জাত বেটাছেলে !

শ্রী : বাঁদর।

শ্রীমতী : গাধা।

শ্রী : ওঃ—জীবন একেবারে দুর্বহ করে তুললে !

শ্রীমতী : তা তো বলবেই। চোর, জোচ্চোর ! (বুড়ো আঙুল নাড়িয়া)

· আমার বাবার পয়সায় খাচ্ছ! লজ্জা করে না কথা বলতে!

শ্রী : তোর বাবা……।

শ্রীমতী : হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার বাবা!

শ্রী : সে তো জালিয়াৎ!

শ্রীমতী : আর তোর? সে তো জেলে যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছিল!

শ্রী : (রোহিতবাবুকে) শুনছেন……! শুনছেন আপনি!

রোহিত : গত দু-হপ্তা কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা গেছে…কি বলেন?

শ্রী : (শ্রীমতীকে) দেবো নাকি হাটে হাঁড়ি ভেঙে?

রোহিত : কি রকম একটু অসময়ের ঠাণ্ডা বলে মনে হলো না?

শ্রীমতী : কে কার হাঁড়িটা ভাঙে একবার দেখি না?

শ্রী : (পা ঠুকিয়া) চুপ!

শ্রীমতী : (পা ঠুকিয়া) কক্ষনো না!

রোহিত : (মিটাইবার চেষ্টায়, শ্রীকে আস্তে আস্তে, যেন শ্রীমতী শুনিতে না পান) বলুন না মশাই, তুমিই ঠিক বলছো—তা হলেই ল্যাঠা চুকে যায়।

শ্রী : (চোখ পাকাইয়া) কি বললেন?

রোহিত : না মানে…কিছু বলিনি তো!

শ্রী : (শান্ত কণ্ঠস্বরে) আপনাকে কিন্তু আমি আস্ত রাখবো না।

রোহিত : না—মানে…সত্যি কিছু বলিনি! যদি বা মুখ ফস্কে কিছু বেরিয়ে গিয়েও থাকে…আপনি ভুলে যান না মশাই!

শ্রী : (ক্রুদ্ধস্বরে) দেখুন—আমার বেশ একটু বয়েস হলো।

রোহিত : আজ্ঞে, তা হলো…

শ্রী : (গলার স্বর ক্রমশঃ চড়িতেছে) অনেক রকম পাগলের অনেক রকম আবোল-তাবোল আমায় শুনতে হয়েছে…

রোহিত : আজ্ঞে, তা হয়েছে…

শ্রী : কিন্তু এ রকম অর্থহীন আবোল-তাবোল আমি কোনো দিন শুনিনি!

রোহিত : (বেশ কিছুটা নার্ভাস হইয়া) কি রকম বলুন তো?

শ্রী : এই আপনি যা বললেন !

রোহিত : না, মানে আমি বলছিলাম···

শ্রী : চুপ !···সুখময়···ছড়ি-গাছটা নিয়ে আয় তো ! মেরে পিঠের ছালটা তুলে নিই ! বলে কিনা···বলছিলাম···। একটা বজ্জাত মেয়েছেলে···বাপটা চোর। ধিকি ধিকি করে সারা জীবনটা আমার তুষের আগুনে জ্বলিয়ে দিলে······আর বলে কিনা—তুমিই ঠিক বলেছো···। একটা বুড়িধাড়ি মেয়েমানুষ···রক্তচোষা ছারপোকা ! মাথা থেকে পা পর্যন্ত কুরে কুরে খেয়ে গেল, আর বলে কিনা উনিই ঠিক।

রোহিত : দয়া করে যদি একটু শোনেন···

শ্রীমতী : আপনি কান দিচ্ছেন কেন, রোহিতবাবু। (স্বামীকে দেখাইয়া) দেখছেন না···বেহেড—পাগল।

শ্রী : আচ্ছা রোহিতবাবু···?

রোহিত : আজ্ঞে···?

শ্রী : আপনার তো বেশ বয়স হলো ?

রোহিত : আজ্ঞে···তা হলো।

শ্রী : তবে বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এরকম গাধা হয়ে যাচ্ছেন কেন বলুন তো ?

রোহিত : আজ্ঞে···?

শ্রী : (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে মুখ ভেংচাইয়া) আজ্ঞে ! আপনি বললেন না—আমি যেন ওকে বলি—তুমিই ঠিক বলেছো ?

রোহিত : না—মানে···

শ্রী : মানে একটাই। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকে গাধা হয়। কিন্তু একটু একটু করে বাড়ে···একটু একটু করে গাধা হয়। আপনার মতো এতো অল্প বাড়ে এতো বেশী গাধা হতে আমি আর কাউকে দেখিনি।

রোহিত : (মনে আঘাত পাইয়া শুষ্ক স্বরে) চমৎকার ভদ্রলোক আপনি !

শ্রী : আমার মতো অবস্থায় পড়লে, আপনিও ঠিক এই রকম বলতেন। ধরুন রোহিতবাবু—রোজ যদি আপনাকে রোহিত মৎস্যের মতো খামি-খামি করে কেটে, নুন-হলুদ মাখিয়ে জ্বলন্ত উনুনে, ফুটন্ত তেলে ভাজা হতো, তা হলে কি রকম হতো ?

রোহিত : বলেন কি ! ফুটন্ত তেলে জ্বলন্ত উনুনে ?

শ্রী : আজ্ঞে হ্যাঁ। ফুটন্ত তেলে জ্বলন্ত উনুনে !

(শ্রীমতী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিলেন—কখনও বা রাগে ঘুরপাক খাইতেছিলেন।)

শ্রী : কিন্তু কি যেন বলছিলাম আপনাকে ? নাঃ—কিচ্ছু মনে নেই ! (মাথার চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে) রোহিতবাবু ! আমার বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীমতী : (পিছন দিক হইতে রোহিতবাবুকে ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতে দিতে) ঠিক ! ওটার মাথাই খারাপ হয়ে গেছে রোহিতবাবু, ওটাকে রাঁচিতে পাঠিয়ে দিন !

শ্রী : (সামনের দিক হইতে রোহিতবাবুকে ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতে দিতে) আপনারও মাথা খারাপ হয়ে যেতো রোহিতবাবু—যদি আপনাকে রোজ রোহিত মৎস্যের মতো টুকরো টুকরো করে ফুটন্ত তেলে ভাজা হতো !

শ্রীমতী : আপনার সামনে একটা পাগল দাঁড়িয়ে—রোহিতবাবু। আপনি গারদে খবর দিন।

শ্রী : ইস্ ! আপনার পেছনে একটা ডাইনি দাঁড়িয়ে রোহিতবাবু !

শ্রীমতী : আপনার সামনে একটা বদ্ধ পাগল, রোহিতবাবু। পালিয়ে আসুন···কামড়ে দেবে !

শ্রী : রোজ আমার খাবারে একটু করে সেঁকো বিষ মিশিয়ে দেয়, রোহিতবাবু। পেটভর্তি আমার বায়ু।

শ্রীমতী : চায়ে রোজ এক চামচে করে টিংচার আইডিন মিশিয়ে দেয়, রোহিতবাবু। পিত্তিতে গলা আমার জ্বলে যায়।

শ্রী : মিথ্যে কথা !

শ্রীমতী : কি! মিথ্যে কথা? আমি এক্ষুনি এনে দেখিয়ে দিচ্ছি!
(ঝড়ের গতিতে বাহির হইয়া যান।)

শ্রী : আনতে গিয়ে যেন তুই মারা যাস্। তোর মুখ যেন আর আমাকে দেখতে না হয়।

রোহিত : (দর্শকদের দিকে ফিরিয়া) এখান থেকে কেটে পড়াই শ্রেয় —কি বলেন?

শ্রী : আমার বড়ো দোষ হয়ে গেছে, রোহিতবাবু। আপনার সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারিনি।

রোহিত : (বিস্মিত হইবার ভান করিয়া) বাঃ। কখন? কোথায়?

শ্রী : কেন? এইমাত্র। এখানে!

রোহিত : সত্যি, আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এমন ভদ্র ব্যবহার আমি আর কোথাও পাইনি। আপনাদের অভ্যর্থনা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আচ্ছা—আজ তাহলে আসি। (হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন।)

শ্রী : (হতভম্ব অবস্থায় নমস্কার করিতে করিতে) সেকি! এখনি চলে যাবেন?

রোহিত : (যাইতে উদ্যত) একটু জরুরী কাজ আছে।

শ্রী : (ততক্ষণে নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। খপ করিয়া রোহিতবাবুর একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া) এ আপনি ঠাট্টা করছেন।

রোহিত : (হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে) আজ্ঞে না।

শ্রী : (আরও জোরে হাত চাপিয়া ধরিয়া, প্রায় ঘরের মধ্যস্থলে টানিয়া আনিতে আনিতে) পারবো না বললেই হলো! পারতেই হবে আপনাকে!

রোহিত : (কাতর স্বরে) আমায় ছেড়ে দিন! আমার কাজ আছে! সত্যি বলছি।

শ্রী : (ততক্ষণে চেয়ারে বসাইয়া দিয়াছে) আপনি চলে গেলে আমি মনে বড্ড আঘাত পাবো রোহিতবাবু! ভাববো—আপনি আমার

ওপর বিদ্বেষ নিয়ে চলে গেলেন! সুখময়! (সঙ্গে সঙ্গে সুখময়ের প্রবেশ) আমাদের জন্যে চা! (সুখময়ের মাথা নাড়িয়া হ্যাঁ বলিয়া দ্রুত প্রস্থান।)

রোহিত : আমি যে এখানে রয়ে গেলাম—একটা কিন্তু সর্ত রইলো!

শ্রী : কি বলুন?

রোহিত : আপনাদের ঘরোয়া ব্যাপারের মধ্যে আমাকে জড়াবেন না!

শ্রী : বেশ! কথা রইলো।

রোহিত : ঠিক তো?

শ্রী : (উৎসাহের চোটে সজোরে রোহিতবাবুর পিঠ চাপড়াইয়া) নিশ্চয়! (রোহিত ভালো করিয়া বসিয়া দূর্বাদলবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া একটু মৃদু হাসিলেন।)

শ্রী : সত্যি, আপনার মতো লোক হয় না! দু'দিন বাদেই দেখবেন—চলতে ফিরতে আপনি! আপনাকে ছাড়া আমার চলছেই না!

রোহিত : সত্যি! (বিনয়ে গদগদ হইয়া) না না, এ আপনি বাড়িয়ে বলছেন!

শ্রী : একটুও বাড়িয়ে বলছি না! আর কেন হবে না—বলুন না? স্বভাবটি ঠিক আমার মতো! একেবারে খাপে-খাপ মিলে গেছে! শুধু যে বাইরেটাই ভদ্র—তা তো নয়! ভেতরটাও সহজ, সরল। গাল-গল্পে হাসি-তামাসায় কথাবার্তার ধরনটিও চমৎকার! কি? —বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি কিন্তু বাজি রাখতে পারি! যেমনটি বলছি—আপনি ঠিক সেই রকম।

রোহিত : (বিনীতভাবের অন্তরালে আত্ম-অহঙ্কার) না না, বাজি রাখতে হবে না—আমিও খুব একটা অস্বীকার করতে পারছি না!

শ্রী : বাঃ চমৎকার! বললাম না—খাপে-খাপ মিলে যাবে! আচ্ছা এবার তাহলে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন! আপনার ঐ সহজ সরল মন নিয়ে……

রোহিত : বলুন?

শ্রী : আপনার জীবনে খুব বীভৎস একটা কিছু কখনো দেখেছেন কি?

রোহিত : (না বলিলে ছোটো হইয়া যাইবেন মনে করিয়া) আজ্ঞে, তা দু-একটা দেখছি বই-কি !

শ্রী : কিন্তু আমার স্ত্রার মুখের মতো বীভৎস কিছু নিশ্চয়ই কখনো দেখেন নি ? তাই না ?

রোহিত : এই দেখুন—আবার আরম্ভ করলেন···

শ্রী : (বাধা দিয়া) তাহলে আপনি মেনে নিচ্ছেন ?

রোহিত : মাফ করবেন···

শ্রী : শুধু যদি মুখটা হতো, তাহলে কোনো কথা ছিলো না ? কিন্তু ভেতরটা ! রোহিতবাবু, সে যে কতো নীচ একটা ব্যাপার বললেই বুঝতে পারবেন !

রোহিত : (ব্যস্ত হইয়া) না দেখুন, এইমাত্র কিন্তু আমাদের মধ্যে কথা হয়ে গেল—

শ্রী : চুপ করুন ! আমার শেষ হলে আপনি বলবেন। জানেন ? রোজ রাত্তিরে আমি বিছানায় শুতে যাই, কিন্তু ঘুম ভাঙে কোথায় জানেন ? মাটিতে ! কেন জানেন ? সারারাত আমাকে এইভাবে —এইভাবে—(রোহিতবাবু পায়ের গোছে লাথি মারিতে মারিতে) লাথায় ! জিজ্ঞেস করলে বলে—(পুনরায় লাথি মারিয়া)—ঘুমের ঘোরে মেরেছি তো হয়েছে কি ! (প্রত্যেকটি লাথির সঙ্গে সঙ্গে রোহিতবাবু—ওঃ ! উঃ ! লাগছে !···সত্যি লাগছে ! ইত্যাদি করিতে থাকেন।)

শ্রী : কতবড়ো বজ্জাত মেয়েমানুষ তা জানেন ? এইভাবে চুল টেনে বলে (রোহিতবাবুর চুল ধরিয়া টানিয়া) স্বপ্ন দেখছি !

রোহিত : আঃ লাগছে যে !

শ্রী : ঠিক তাই ! আমারও ঐরকম লাগে ! জানেন ? আড়ামোড়া ভাঙবার নাম করে (আড়ামোড়া ভাঙিবার নাম করিয়া সজোরে রোহিতবাবুকে ঘুঁষি মারিয়া) এইভাবে আমাকে ঘুঁষি মারে।

রোহিত : (প্রায় কাঁদ-কাঁদ অবস্থায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া) না, কক্ষনো না ! এইভাবে মারধোর খাবার জন্যে আমি এখানে আসিনি ! (চলিয়া

যাইতে উদ্যত। এমন সময় সামনে শ্রীমতী শ্যামলিমা, হাতে চায়ের বাটি।)

শ্রীমতী : এটা খেয়ে ফেলুন!

রোহিত : এটা কি?

শ্রীমতী : আপনার সকালবেলার চা! গরম করে নিয়ে এলাম!

শ্রী : ওঃ—এটা এখনও বেঁচে আছে?

শ্রীমতী : নিশ্চয়! হাড়ে দুব্বো—এই যাঃ (জিভ কাটিয়া) ফুব্বো গজালে তবে মরবো! (রোহিতবাবুকে) আপনি হাঁ করে দেখছেন কি? নিন—খেয়ে দেখুন!

রোহিত : (প্রায় কাঁদ-কাঁদ অবস্থায়) কিন্তু কেন?

শ্রীমতী : না খেলে বুঝবেন কি করে—টিংচার আইডিন মেশানো আছে কিনা!

শ্রী : আচ্ছা—আমিও নিয়ে আসছি! (ঝড়ের গতিতে বাহির হইয়া গেলেন।)

শ্রীমতী : ভগবান! আর যেন না ফেরে! আমি যেন বিধবা হই!

রোহিত : (জনান্তিকে) ওঃ এ কাদের পাল্লায় পড়েছি রে বাবা!

শ্রীমতী : আপনি খাবেন কিনা?

রোহিত : আজ্ঞে না!

শ্রীমতী : কেন? পরিষ্কার বাটি! এ বাটিতে আমি চা খাই!

রোহিত : আজ্ঞে, তা আমি অস্বীকার করছি না? কিন্তু এখন আমি আসি—

শ্রীমতী : বাঃ আসি মানে···?

রোহিত : আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার একটা জরুরী কাজ আছে!

শ্রীমতী : যাবার আগে যদি দয়া করে আমার একটা অনুরোধ রাখেন!

রোহিত : (সহজে মুক্তি পাইবেন এই আশায়) নিশ্চয় রাখবো! কি বলুন?

শ্রীমতী : যদি আমাকে নিয়ে ইলোপ করেন!

রোহিত : মানে··· ?

শ্রীমতী : যদি আমাকে নিয়ে ইলোপ করেন !

রোহিত : (সরিয়া আসিয়া নিজের মাথায় থাপ্পড় মারিয়া) কি রে ! শুনতে পেয়েছিস ? মেয়েটা তাকে নিয়ে ইলোপ করতে বলছে !

শ্রীমতী : (কাছে আসিয়া) তাহলে দয়া করে···

রোহিত : (তড়াক করিয়া পিছাইয়া আসিয়া) আজ্ঞে না ! আমি পারবো না।

শ্রীমতী : কেন ?

রোহিত : কলকাতায় আমার বউ ছেলে আছে।

শ্রীমতী : আপনি তাহলে না বলছেন ?

রোহিত : অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে।

শ্রীমতী : এখানে এই মুহূর্তে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, সমস্ত দায়-দায়িত্ব কিন্তু আপনার !

রোহিত : (হতভম্বের ন্যায়) আমার !

শ্রীমতী : আজ্ঞে হ্যাঁ ! আপনার। এই মুহূর্তে আমি এখানে লাস হয়ে পড়ে যাবো। যে রক্তপাত আপনি ঘটাবেন—তার সমস্ত অভিশাপ যেন বাজের মতো আপনার মাথার ওপর নেমে আসে !

রোহিত : (বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে) কেন আপনি আমাকে এভাবে পাগল করছেন ? আমি আপনার কি করেছি ?

শ্রীমতী : তারের বাজনায় পিড়িং করার একটা সীমা আছে রোহিতবাবু ! আপনার জানা উচিত, বেশী জোরে পিড়িং করলে তার ছিঁড়ে যায় ! আজ দশ বছর ধরে আমার যা ছিলো তাই ওকে দিয়েছি ! আর দেবার মতো আমার যে যথেষ্টই ছিলো, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

রোহিত : (ঐ একই সুরে) নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি ! কিন্তু আমার তাতে কিছু এসে যায় না।

শ্রীমতী : আপনার কেন এসে যাবে বলুন ! আপনার এসে যাবার তো কথা নয় ! (রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করিয়া) আপনি তো ঐ শুয়োর-ছানাটার মতো স্বার্থপর ! (স্বামীর গমন-পথের দিকে

ইঙ্গিত করিয়া) ফেলতো আমার মতো হাত-পা বেঁধে ঐ জানোয়ারটার সামনে! পিটিয়ে একেবারে মাতুর করে দিতো আপনাকে। তাহলে আপনারও এসে যেতো।—জানেন? রোজ আমাকে মারধোর করে! ও—বিশ্বাস হচ্ছে না?

রোহিত : (পিছাইতে পিছাইতে) আজ্ঞে হ্যাঁ—নিশ্চয়ই বিশ্বাস হচ্ছে!

শ্রীমতী : (বাঘের মতো অগ্রসর হইতে হইতে) শুধু মারে নয়। এইভাবে হাত মুচকে দেয়! (রোহিতবাবুর হাত মুচকাইয়া দেন। রোহিতবাবু চিৎকার করিয়া উঠেন) এইভাবে চিমটি কাটে (রোহিতবাবু পিছাইতে পিছাইতে চিমটি কাটিয়া দেখাইতে) না না, ওভাবে নয়—এইভাবে···যাকে বলে মোড়া চিমটি! (রোহিতবাবুকে চিমটি কাটিলে রোহিতবাবু আবার চিৎকার করিয়া উঠেন।)

[হাতে এক গামলা ঝোল ও চামচ লইয়া দূর্বাদলবাবুর প্রবেশ]

শ্রী : (চামচ করিয়া ঝোল বাড়াইয়া দিয়া) নিন্ খেয়ে দেখুন···

রোহিত : কিন্তু···কেন?

শ্রী : সেঁকো বিষ আছে বলে! খাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন পেট বায়ুতে ভর্তি হয়ে গেছে!

রোহিত : আমি আপনার কথাতেই বিশ্বাস করছি!

শ্রীমতী : (চায়ের বাটি বাড়াইয়া দিয়া) আমারটাও তাহলে খেয়ে দেখতে হবে!

রোহিত : না!

শ্রী : খেতেই হবে!

রোহিত : কক্ষনো না!

শ্রীমতী : মাইরি বলছি! শুঁকে দেখুন কি বিশ্রী গন্ধ!

শ্রী : কালীর দিব্যি বলছি! সাক্ষাৎ সেঁকো বিষ! (ইতিমধ্যে দুইজনেই রোহিতবাবুকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। দুইজনেই রোহিতবাবুকে জোর করিয়া খাওয়াইবেন। রোহিতবাবু দাঁতে দাঁত চাপিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। ঝোল ও চা জামাকাপড়ের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে।)

শ্রীমতী : (রোহিতবাবুর উদ্দেশ্যে) দেখ—দেখ—বোকাটার রকম দেখ !

শ্রী : (রোহিতবাবুর উদ্দেশ্যে) শুয়োরের মতো জেদ করে কোনো লাভ নেই ! খেতে তোমাকে হবেই বাছাধন !

শ্রীমতী : (স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া) আ মোলো যা ! গাধার মতো করছে দেখ ! উনি কি ছোটো ছেলে নাকি ! যে জোর করে ঝোল খাওয়াবে !

শ্রী : ও—উনি বুঝি তোমার কোলের খোকাটি ! যে জোর করে চা খাওয়াবে !

শ্রীমতী : ফের কথা ! (চায়ের বাটি ছোঁড়েন। কিন্তু সেই বাটি আসিয়া পড়ে রোহিতবাবুর উপর।)

শ্রী : বেশ করছি ! (ঝোলের গামলা ছোঁড়েন। সেটিও রোহিতবাবুর উপর আসিয়া পড়ে। রোহিতবাবু কাঁদিয়া ফেলেন।)

শ্রীমতী : তবে রে ! (টেবিলের উপর হইতে একটি পাথরের কাগজ-চাপা তুলিয়া নেন।)

শ্রী : (রোহিতবাবুকে সামনে রাখিয়া) খবরদার ! ওটা ছুঁড়ে মেরো না বলে দিচ্ছি ! মাথা ফেটে রক্তা-রক্তি হয়ে যাবে !

রোহিত : (কাঁদিতে কাঁদিতে) ও বাবা ! এ যে খুনে ! (দূর্বাদলকে) দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন আপনারা ! আপনাদের যা ইচ্ছা তাই করুন !

শ্রীমতী : রোহিতবাবু আপনি সরে যান বলে দিচ্ছি ! আমি কিন্তু সত্যি ছুঁড়ে মেরে দেবো !

শ্রী : Don't move রোহিতবাবু ! Don't move ! খুনে মেয়েছেলে, সব পারে ও ! পুলিশ ! পুলিশ !

রোহিত : এখানে না এলে কি চলতো না রোহিত ? (আকুল হইয়া ক্রন্দন করেন।)

শ্রীমতী : তাহলে সরবে না তুমি ? বেশ, তবে চলুক ! আমি কিন্তু ছুঁড়লাম।

শ্রী : (ততক্ষণে রোহিতবাবুর আড়ালে আড়ালে আলোর সুইচের কাছে আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন, আলোটি নিভাইয়া দিয়া) বেশ, তাহলে ছোঁড়ো। (মঞ্চ অন্ধকার। শ্রীমতী সঙ্গে সঙ্গে পাথরটি ছুঁড়িয়া দেন। রোহিতবাবুর কাতর চিৎকার শোনা যায়, তাঁহার লাগিয়াছে।)

শ্রী : কি! আমাকে খুন করার চেষ্টা! (ঘুঁষির আওয়াজ শোনা যায়। রোহিতবাবু কোঁক করিয়া উঠেন।)

শ্রীমতী : তবে রে! (সঙ্গে সঙ্গে চপেটাঘাতের আওয়াজ শোনা যায়। রোহিতবাবু বলিয়া উঠেন—বড্ড লেগেছে! আর কখনও করবো না।)

শ্রী : দেখা যাক—এবার কে তোকে বাঁচায়—বজ্জাত মেয়ে মানুষ কোথাকার! (হাতের কাছে যাহা পাইলেন তাহাই ছুঁড়িয়া মারিলেন।)

রোহিত : ওরে বাবারে গেছিরে পা-টা ভেঙে দিয়েছে রে!

শ্রীমতী : তবে রে! দাঁড়া! ভেঙে আমি সব চূরমার করে দিচ্ছি! (ঘরের জিনিসপত্র ভাঙার শব্দ শোনা যায়, তার মধ্যে অনেকগুলিই রোহিতবাবুর উপর আসিয়া পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে রোহিতবাবুর চিৎকার)—বাবা রে! গেছি রে! মেরে ফেললে রে!

শ্রী : কি! আমার ঘর তছনছ করা! দাঁড়া, ঘরে আমি আগুন ধরিয়ে দিচ্ছি। কি করে তছনছ করবি—কর্! (অন্ধকার ঘরে ভীষণ রকম ছোটাছুটি, দাপাদাপি, চিৎকার শোনা যায়।)

রোহিত : ওগো—কে কোথায় আছো—আমাকে বাঁচাও—দুটো পাগল মিলে ক্রমাগত আমাকে মাড়িয়ে যাচ্ছে!

শ্রী : কাকে কি বলছেন! ওটা কি মেয়েছেলে? ওটা তো উট!

শ্রীমতী : আর তুই কি?—তুই তো ছাগল!

শ্রী : চোপ। তোর বাপ না চোর।

শ্রীমতী : তুই চোপ! তোর বাপ না জোচ্চোর। (রোহিতবাবু গোঙাইতে থাকেন। হঠাৎ ঘরের মধ্যস্থল ও দুই পাশে আগুনের আভা দেখা যায়।)

রোহিত : আগুন—আগুন—আগুন!

[সমস্ত মঞ্চ রক্তিমাভ হইয়া উঠে। সুখময় দুই হাতে দুই বালতি জল লইয়া প্রবেশ করে]

সুখময় : আগুন! তাই তো। (বালতি উপরে তুলিয়া উপুড় করিয়া দেয়। সমস্ত জল আসিয়া পড়ে রোহিতবাবুর উপর। রোহিতবাবু ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার অবস্থা পাগলের মতো। চারিদিক হইতে—তবে রে! আস্পর্দার শেষ নেই! ফের কথা! ইত্যাদি আওয়াজ, দমকলের ঘণ্টার শব্দ, ক্যানেস্তারা বাজানোর আওয়াজ শোনা যায়। পাগলের মতো রোহিতবাবু প্রস্থান-পথের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে হঠাৎ গানের সুরে গাহিয়া উঠেন—কালীমা রণে মেতেছে। শিবের গলায় পা দিয়ে জিভটি কেটেছে। যখন প্রায় প্রস্থানোদ্যত, একেবারে পিছনে মধ্যস্থলে পর্দার উপর দূর্বাদলবাবু এবং তাঁহার পত্নীর ছায়ামূর্তি দেখা যায়।)

শ্রী ও শ্রীমতী : (একসঙ্গে) যাবেন না, রোহিতবাবু। চা হয়ে গেছে।

বর্বর

চরিত্র-লিপি

শ্রীমতী বনলতা বায়েন—বিধবা যুবতী, ভূসম্পত্তির অধিকারিণী

শ্রীহলধর হালদার—সৈন্যবিভাগ হইতে অবসরপ্রাপ্ত।
সম্পত্তির অধিকারী। সম্প্রতি ক্ষেত-খামারে
মনোনিবেশ করিয়াছেন।

বংশী—শ্রীমতী বনলতা বায়েনের পুরাতন গৃহভৃত্য।

স্থান—শ্রীমতী বায়েনের বাড়ির বসিবার ঘর।

কাল—বর্তমান

[শহরের উপকণ্ঠে শ্রীমতী বনলতা বায়েনের উদ্যান-বাটির ভিতরের দিকের একটি বসিবার ঘর। শ্রীমতী বনলতা বায়েন একটি সোফায় বসিয়া সামনের দেওয়ালে টাঙানো এক যুবকের আবক্ষ প্রতিকৃতির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন। আর উপস্থিত বাড়ির পুরাতন ভৃত্য বংশী। বংশী অন্য সব পুরাতন ভৃত্যের মতই বয়স্ক, আর শ্রীমতী বনলতা বায়েন অন্য সব নায়িকার মতই তরুণী, কিন্তু বিধবা। অবশ্য ঠিক তন্বী তরুণী নয়, বরং অল্প ভারি বিষাদ-মলিন যুবতীই বলা চলে]

বংশী : এটা কিন্তু ঠিক নয়, বউ দিদিমণি! আপনি শোকে তাপে এই ভাবে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলছেন! বিধবা কে না হয় বলুন? আজকাল যে সে যেখানে সেখানে বিধবা হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু তাই বলে এই রকম? ঝিকে দেখুন, রাঁধুনীকে দেখুন—মাঘের হাওয়ায় একটু যেই টান পড়েছে—যে যার বাগানে বেরিয়ে গেছে কুল পাড়তে! এমন কি বেড়ালটাকে দেখুন—কিছু না পায় তো এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক—চুড়ুই পাখিগুলোর পেছনেই উঠোনে ছুটোছুটি করছে! আর আপনি? বাড়ির মধ্যে আছেন তো আছেনই! যেন ঠাকুরঘরে ঢুকে খিল বন্ধ করে জপ করছেন তো করছেনই—বাইরের কাক পক্ষীতে মুখ দেখে না! আজ বোধ হয় মাস আষ্টেক হলো বাড়ির বার হন নি একবারও!

বনলতা : বাড়ির বার তো আর কখনো হবো না বংশীদা। সে পুড়েছে শ্মশানে, আর আমি পুড়ছি এই চার-দেওয়ালের মশানে! আমরা দুজনেই তো মরেছি, দুজনেই তো চিতার ছাই।

বংশী : এই আবার আরম্ভ করলেন বউ দিদিমণি! আমার আজকাল শুনতেও ভয় করে! ভীষণ ভয় করে! দাদাবাবুর মৃত্যু হয়েছে —এই তো? তা সে ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়েছে, ঈশ্বর তাঁকে চিরশান্তি দিয়েছেন। আপনিও তো এতদিন শোক-তাপ করলেন। তা সে যথেষ্টই করলেন। কিন্তু এবার তো থামার সময় হলো। চিরকাল ধরে কি কেউ শোক তাপ করে? করে না। এই ধরুন না ঈশ্বরের

ইচ্ছায় ক'বছর আগে আমার বউটি মারা গেল। তা, শোক-তাপ আমিও করলুম—পুরো একমাস—তারপর থামিয়ে দিলুম—মানে, আপনিই থেমে গেল। শোক-তাপ শেষ হয়ে গেল। চিরকাল ধরে কি মানুষ সুর করে কাঁদবে? আমার দাদাবাবু—মানে, শ্রীবলরাম বায়েন, তিনি তো আপনার অতো দামের স্বামী ছিলেন বউদিদিমণি! (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আপনি পড়শীদের ভুলেছেন, পাড়া-বেড়ানো ছেড়েছেন। আপনিও যান না, আপনার কান-ভাঙাতে মন-ভাঙাতে পাড়ার কেউ আপনার এখানে আসেও না। ফিটন গাড়িটা উইয়ে কাটছে, আমার হাঁক-বরদারের পোশাক ইঁদুরে কাটছে—যেন জাঁক দেখাবার মতো ভালো লোক দুনিয়ায় আর নেই! ঘরের ভেতর অন্ধকারে কেমন যেন মাকড়সার মতো হয়ে গেছি—চারধারে কেমন যেন জাল বুনছি। হবেই তো—দিনের আলো যে আর চোখে পড়ে না বউ দিদিমণি—বাইরে তো আর বেরই না! নইলে, ভাবুন তো বউ দিদিমণি, চারধারে কত নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর ভদ্রলোক সব বাড়ি-টাড়ি করেছেন! আজ এ-বাড়ি গেলেন, জন্মদিনের নেমন্তন্ন ; কাল ও-বাড়ি গেলেন, —মেয়ের বিয়ে। বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবার হরিশ হোড়ের বাড়ি চায়ের আসর, শুক্রবার শুক্রবার গোপাল গোসাঁইয়ের বাড়ি সেলাই-এর আড্ডা! কতো সব সুন্দর সুন্দর লোকের আসা-যাওয়া, কেমন সব সুন্দর মেয়ে! আপনিও দেখলেন, আমিও দেখলুম! আর এই যে বেরচ্ছেন না—হয়তো বছর দশেক না বেরিয়েই রইলেন। পরে যখন বেরলেন, তখন দেখলেন সব বুড়ো-বুড়ি। কেউ আর সুন্দর নেই—আপনিও না!

বনলতা : (দৃঢ়স্বরে) এসব কথা আর কোনদিন ব'লো না, বংশীদা—দোহাই তোমার! আর কেউ না জানুক, তুমি তো জানো—আমার স্বামী বলরাম বায়েন নেই, আমি—শ্রীমতী বনলতা বায়েনও আর নেই! তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমিও শূন্য হয়ে গেছি! তুমি ভাবছ বংশীদা, আমি এখনও বেঁচে আছি। কিন্তু ওটা তোমার মনে হচ্ছে

মাত্র—সত্যি কিন্তু আমি আর বেঁচে নেই বংশীদা। ওঃ! ওপর থেকে তোমার দাদাবাবুর দেহত্যাগী মৃত্যুহীন প্রাণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখুন না বংশীদা, আজও বনলতা বায়েন তাঁর স্বামী বলরাম বায়েনকে—কতই না, কতই না ভালবাসেন! তোমার কাছে তো কিছু গোপন নেই বংশীদা, আমার ওপর অনেক অন্যায় তিনি করেছেন—নিষ্ঠুর তিনি—অন্য ইয়ে নিয়ে চরিত্রের দোষও তাঁর ছিলো! আমি কিন্তু বংশীদা, চিরনিদ্রায় নিদ্রিত তাঁর প্রতি বিশ্বস্তই থাকবো! ঐ পরপার থেকে তিনি দেখবেন, তাঁর মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আমি যেমনটি ছিলাম, আজও ঠিক তেমনটিই আছি, তেমনটিই থাকবো!

বংশী: এসব কথার কি দরকার, বউ দিদিমণি? তার চেয়ে বরং বাগানে একটু বেড়িয়ে আসুন না? চলুন না—আমরা দুজনে ফুল পেড়ে আনি! নয়তো কহু কিংবা দুদুকে ফিটনে জুতে বড়ো রাস্তা ধরে একটু এপাড়া-ওপাড়া করে আসি।

বনলতা: (ক্রন্দন করিতে করিতে) ওহ্।

বংশী: কি হলো? কি হলো বউ দিদিমণি? ঈশ্বর না করুন, আপনার কিছু কি হলো বউ দিদিমণি?

বনলতা: দুদুকে কি ভালই না বাসতেন উনি! এখানে-ওখানে যেতে হলে দুদুর পিঠে চড়েই যেতেন। কি ভালই না সওয়ার ছিলেন। যখন সজোরে লাগাম টেনে ধরতেন, কি ভালই না দেখাতো ওঁকে! দুদু! দুদু! আজ যেন দুদুকে বেশী করে দানা দেয়।

বংশী: নিশ্চয় দেবে বউ দিদিমণি।

[জোরে ঘন্টি বাজে]

বনলতা: (কেমন যেন একটু কেঁপে উঠে) কি হলো?

বংশী: কেউ একজন এসেছে বোধহয়।

বনলতা: যেই আসুক, বলে দিও—দেখা হবে না। আমি বাড়িতে থেকেও নেই!

বংশী: যে আজ্ঞে, বউ দিদিমণি। (মাঝের দরজা দিয়া প্রস্থান।)

বনলতা : (বলরাম বায়েনের ছবির দিকে দেখিতে দেখিতে) দেখ বলরাম, আমি কেমন তোমায় ভালবাসতে পারি, ক্ষমাও করতে পারি। যখন আমার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাবে, তখনই আমার প্রেম-স্পন্দনও স্তব্ধ হয়ে যাবে—আমিও মরবো, আমার ভালবাসাও মরবে—আমারই সঙ্গে সঙ্গে, তার আগে নয়। আচ্ছা, তোমার লজ্জা হচ্ছে না বলরাম বায়েন ? সত্যি ভালো বউ বলতে যা বোঝায় —ঐ যে কি বলে পতিব্রতা পত্নী—আমি তো তাই ছিলাম, আর আমরণ তাই থাকবো ! তাই না নিজেকে বন্দী করে রেখেছি ! আর তুমি—তুমি বলরাম বায়েন—প্রিয় ভূত আমার—না না, ভূত খুব ছোটো হয়ে যাবে—দানব—প্রিয় দানব আমার—তুমি কিনা নিজের সম্পর্কে এতটুকু লজ্জিত নও ! তুমি কিনা আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে, সপ্তার পর সপ্তা আমাকে একা ফেলে রেখে চলে যেতে—

[প্রচণ্ড উত্তেজিত অবস্থায় বংশীর প্রবেশ]

বংশী : বউ দিদিমণি গো ! কে একজন এসেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি কতো বললুম—কিছুতে শুনবে না—দেখা করবেই—একেবারে জবরদস্তি !

বনলতা : তুমি তো তাকে বলতে পারতে বংশীদা, স্বামীর মৃত্যুর পর আমি কারো সঙ্গে দেখা করছি না।

বংশী : বলবো না কেন ? বলেছি। শোনার পাত্রই নয়। বলে—খুব নাকি জরুরী ব্যাপার।

বনলতা : কিন্তু দেখা তো আমি করছি না।

বংশী : বললুম তো তাকে, কিন্তু কে কার কথা শোনে ! লোকটা একেবারে বুনো। সোজা বন থেকে গণ্ডারের মতো ছুটে এসে বিশ্রী বিশ্রী দিব্যি গালতে গালতে ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়লো—সামনের ঘরে। তারপরই সামনের ঘর থেকে এখন একেবারে খাবার ঘরে !

বনলতা : (উত্তেজিত) তাই ! গায়ের জোরে সোজা একেবারে খাবার ঘরে ! উদ্ধত, অসভ্য বর্বর ! কই ? নিয়ে এসো এখানে ! (বংশী মাঝের দরজা দিয়া বাহির হইয়া যায়।) কী বিরক্তিকর সব

লোকজন। আমার কাছে এদের প্রয়োজনটাই বা কি? শান্তিতে শোকে তাপে দগ্ধ হচ্ছি—কেনই বা এরা আমাকে বিরক্ত করতে আসে? না, পরিষ্কার বুঝছি—এখানে আর থাকা চলবে না। কোনো একটা আশ্রম-টাশ্রমেই চলে যাবো! যেতেই হবে!

[প্রায় কুচকাওয়াজ করিতে করিতে হলধর হালদারের প্রবেশ। থামেনও সৈনিকের কায়দায়। থামিয়াই বনলতা বায়েনকে সৈনিক রীতিতে অভিবাদন। তারপরই ঐ একই পদ্ধতিতে পিছন ফিরিয়া বংশীর প্রতি গর্জন করিয়া উঠিলেন]

হলধর : (বংশীকে) চুপ! সম্পূর্ণরূপে চুপ! এইটুকু যন্ত্র হইতে এই চিৎকার! নির্বোধ গর্দভ। সম্পূর্ণরূপে একটি গর্দভ! চুপ! (সঙ্গে সঙ্গে বনলতার দিকে ফিরিয়া) মাননীয়াসু। যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন করি অধীনের পরিচয়—হলধর হালদার, যুদ্ধাস্ত্র বিভাগের পদস্থ সেনানী ছিলাম। লেফ্‌টেন্যান্ট অর্থাৎ উপাধ্যক্ষ, বর্তমানে আপনার প্রতিবেশী, ক্ষেত-খামার করি। কোনো একটি প্রচণ্ড জরুরী ব্যাপারে নিতান্তই বাধ্য হইয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে এই গৃহে আগমন।

বনলতা : (কোনরূপ প্রত্যভিবাদন না করিয়া) হেতু?

হলধর : আপনার মৃত স্বামী—না না, আমি লজ্জিত—আপনার পরলোকগত স্বামী, শ্রী বলরাম বায়েনের সহিত পরিচিত হইবার সম্মান আমি লাভ করিয়াছিলাম। আর আমার সেই লাভের অব্যবহিত পরেই তিনি মারা—না না, আমি লজ্জিত—তিনি পরলোকে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু মারা যাইবার—না না, আবারও আমি লজ্জিত—পরলোকে যাইবার অব্যবহিত পূর্বে আমার নিকট দুইটি হাতচিঠি দিয়াছিলেন। যাইবার সময় সেই দুইটি আর লইয়া যান নাই। রাখিয়াই প্রস্থান করিলেন। হাতচিঠি দুইটির মূল্য দুই সহস্র চারিশত মুদ্রা। অর্থাৎ ঐ পরিমাণ মুদ্রা তিনি, শ্রীবলবাম বায়েন, আমার নিকট ঋণ রাখিয়া যাইলেন। কিন্তু ক্ষেত-খামারি কার্যব্যপদেশে কৃষি ব্যাঙ্ক হইতে আমাকে

কিঞ্চিৎ ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। আগামী কল্য সেই ঋণের বার্ষিক সুদ দিবার শেষ দিবস। অতএব মাননীয়াসু—আমার বিনীত অনুরোধ আপনি পূর্বোক্ত ঐ দুই সহস্র চারিশত মুদ্রা সত্বই আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া আপনার স্বামীর ঋণ পরিশোধ করুন।

বনলতা : কিন্তু এই টাকাটা আমার স্বামী আপনার কাছ থেকে কেন ধার করেছিলেন, জানতে পারি কি?

হলধর : অবশ্য পারেন। তিনি আমার নিকট হইতে অশ্বের জন্য দানা ক্রয় করিয়াছিলেন।

বনলতা : ঘোড়ার দানা কিনেছিলেন? দু'হাজার চারশো টাকার? কেন? নিজে খাবেন বলে?

হলধর : আজ্ঞে না। আমার জ্ঞান মতো—অশ্বেরা খাইবে বলিয়া।

বনলতা : ঘোড়ার দানা! দু'হাজার চারশো টাকার! দুদু! দুদু! (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া) বংশীদা—দুদুকে আজ যেন ওরা বেশী করে দানা দেয়!

বংশী : নিশ্চয় দেবে বউ দিদিমণি। (প্রস্থান।)

বনলতা : আমার স্বামী শ্রীবলরাম বায়েন যদি আপনার কাছে ধার রেখে থাকেন, তবে সে ধার আমি আপনাকে নিশ্চয়ই শোধ দেবো। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আজ আমার কাছে কোনো টাকাই নেই। কাল আমার ম্যানেজার শহর থেকে ফিরলে আমি তাঁকে আপনার ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দিতে বলবো। কিন্তু তার আগে তো আপনার অনুরোধ রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আর তাছাড়া আজ প্রায় আট মাস হলো আমার স্বামী মারা গেছেন। বিষয় আমার কাছে এখনও বিষ। টাকা-পয়সা, পাওনা-দেনা— এসব নিয়ে আলোচনা করার মতো মন এখন আমার নয়।

হলধর : আর আমার মনের অবস্থা কি অবগত আছেন? পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া যাইবে! দুই পদ উপরের দিকে তুলিয়া আমারই কলের চিম্‌নি বাহিয়া আকাশে উঠিয়া যাইব। আগামী-কল্য সুদ জমা না করিতে পারিলে আমার ক্ষেত-খামারে কল-

কারখানায় চাবি পড়িয়া যাইবে!

বনলতা : পরশু আপনি আপনার টাকা পাবেন।

হলধর : পরশু তো অর্থের আমার কোনো প্রয়োজন নাই। আমার প্রয়োজন তো অদ্য।

বনলতা : আমি নিতান্ত দুঃখিত—আজ আমি আপনাকে দিতে পারছি না।

হলধর : আমি আগামী পরশু পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে সমর্থ নই।

বনলতা : কিন্তু আমার কাছে আজ না থাকলে আমি কি করতে পারি বলুন ?

হলধর : অর্থাৎ অদ্য আপনি দিতে সক্ষম নন ?

বনলতা ঃ না, নই।

হলধর : ইহাই আপনার শেষ কথা ?

বনলতা : হ্যাঁ, ইহাই আমার শেষ কথা।

হলধর : সম্পূর্ণরূপে ?

বনলতা : একেবারে।

হলধর : ধন্যবাদ। (কাঁধ নাচইয়া কথাটি বুঝিতে না পারার ভঙ্গী করিয়া) আর আমায় কিনা এই সব সহ্য করিয়া যাইতে হইবে! লোকের আশা অল্প নহে। অব্যবহিত পূর্বে সমীর মণ্ডলের সহিত সাক্ষাৎ হইল—আয়কর বিভাগে চাকরি করেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, এতো কি চিন্তা করেন—কিসের দুশ্চিন্তা আপনার ? বলুন তো, আপনারাই বলুন—ঠাকুরের দিব্য, দুশ্চিন্তা ছাড়া পথ আছে, দুশ্চিন্তা করাই তো আমার উচিত! গলনালীর সম্মুখে আমার উদ্যত ছুরিকা—দুশ্চিন্তা না করিয়া উপায় কি ? যাহাদের ঋণ-কর্জ দিয়াছিলাম, কল্য প্রত্যুষে গৃহত্যাগ করিয়া তাহাদের বাড়ি বাড়ি গিয়াছিলাম—কিন্তু কেহ একটি পয়সাও ঠেকাইল না! বিনয় করিয়া দুই হাত জোড় করিয়া ঘষিতে ঘষিতে দশ অঙ্গুলির চর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইল কিন্তু একটি পয়সাও মিলিল না। ইহার পর কোথায় কোনো ভগ্ন-ছিন্ন পর্ণকুটিরে, না জানি কাহার পিধানে রাত্রি

অতিবাহিত করিয়া এত দূরে আসিয়াছি সামান্য কিছু প্রাপ্য অর্থ ফিরিয়া পাইবার জন্য! কিন্তু মেজাজ ছাড়া কিছুই পাইলাম না। সাক্ষাতের মুহূর্ত হইতে ইনি কেবলই দেখাইয়া যাইতেছেন—বিষণ্ণ, নীল মেজাজ। বলুন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হইবার কোনো হেতু আছে কি?

বনলতা : আমার তো মনে হয়, সোজা কথায় আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছি। আমার ম্যানেজার শহর থেকে ফিরলে আপনি আপনার টাকা পেয়ে যাবেন।

হলধর : আমি তো ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি নাই, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আপনার ম্যানেজার নরকস্থ হউন।—অশালীন ভাষা প্রয়োগের জন্য মার্জনা···আপনার ম্যানেজার সম্পর্কে কি আমার কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা আছে?

বনলতা : সত্যি কথা বলতে কি, আপনার ভাষা, আপনার আচার-ব্যবহার—এর কোনটিতেই আমি অভ্যস্ত নই। কথা আর বলবেন না, কারণ আমি আর শুনবো না। (বাম দিক দিয়া প্রস্থান।)

হলধর : বলুন আপনারা ইহার উত্তরে কি বলা যাইতে পারে? মন নাই, ভাব নাই, মেজাজ নাই। নীল বিষণ্ণ মেজাজ! মাত্র আট মাস হইল স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে! কিন্তু সুদ আমাকে দিতে হইবে কি হইবে না? প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করি, সুদ আমাকে দিতে হইবে কি হইবে না? স্বামী মৃত আরও সব কতো প্রকার কি হইয়াছে। ম্যানেজার—তিনি নরকস্থ হউন—কোথায় না কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এখন আপনারাই বলুন আমার কি করণীয়? আমি কি সুদ মিটাইবার ভয়ে বেলুনে চাপিয়া পাঁচ সপ্তাহে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিব—থুড়ি, পলাইয়া যাইব? কিংবা প্রস্তর প্রাচীরে মাথা কুটিয়া মরিব? পঞ্চাননের গৃহে গেলাম, তিনি ঠিক করিয়াছেন, আমি আসিলে তিনি গৃহে নাই। সিদ্ধেশ্বর সোজা আত্মগোপন করিয়াছে! পরেশের সহিত তো কলহই হইয়া গেল, ধাক্কা দিয়া তাহাকে দোতলার জানালা দিয়া বাহিরে প্রায় নিক্ষেপই

করিতেছিলাম! গোবর্ধন অসুস্থ, আর এই স্ত্রীলোকটি ভাবস্থ, মেজাজস্থ, বিষণ্ণ নীল মেজাজ! ইহাদের কেহই একটি পয়সাও ঠেকাইবে না! কারণ আমি ইহাদের প্রশয় দিয়াছি! কারণ, জোর করিয়া কিছু বলিতে পারি না, কেবল ঘ্যান ঘ্যান করিয়া যাই! আমি এক বয়স্ক ঘ্যানঘ্যানে, ইহারা আমাকে যেমন ইচ্ছা তেমনই ব্যবহার করে, থালা মুছিবার ন্যাতার ন্যায়! ইহাদের প্রতি আমি অত্যন্ত কোমল হৃদয়! কিন্তু তিষ্ঠ ক্ষণকাল! আমার সহিত আর কোনো কৌশল নয়, ইহারা সকলে নরকস্থ হউক! আমি এখানেই গ্যাঁট হইয়া বসিয়া থাকিব, যতক্ষণ না অর্থ পাই একচুলও নড়িব না! ব্রর্‌র্‌—ওঃ! আমি কি ভীষণ রাগিয়া গিয়াছি, কী প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হইয়াছি, আমার শিরা-উপশিরা সমস্ত কাঁপিতেছে! আমার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে, আমি অসুস্থ হইয়া পড়িতেছি! সেই ভৃত্যটি গেল কোথায়? কে আছো হেথায়?

[বংশীর প্রবেশ]

বংশী : আপনি কি ইচ্ছা করেন?

হলধর : তৃষ্ণা, আকণ্ঠ তৃষ্ণা, পানীয় কিংবা শুধু জল! (বংশীর প্রস্থান।) ভাল কথা, বলুন, আমি কি করিতে পারি? মহিলার নিকট অর্থ নাই। মহিলার ইহা কিরূপ যুক্তি? কণ্ঠের সম্মুখে উদ্যত ছুরিকা, অর্থের প্রয়োজন, ভদ্রলোক অর্থাৎ আমি, রজ্জুর ফাঁসে নিজেকে ঝুলাইয়া দিতে উদ্যত! উনি কিন্তু অর্থ দিবেন না, কারণ অর্থ-সংক্রান্ত কথাবার্তা কহিবার মতো মনোবল কিংবা মেজাজ মহিলার নাই: এই যুক্তি স্ত্রীলিঙ্গ, ইহা স্ত্রীলোকের যুক্তি! এই কারণেই আমি স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্তা কহিতে কখনই ইচ্ছুক নহি, আর অধিক কথা কিসের জন্য, এখনও ইহা আমার মোটেই মনোমত নহে। স্ত্রীলোকের সহিত বাক্যালাপ করা অপেক্ষা আমি বরং বারুদের স্তূপের উপর বসিয়া থাকিব। ব্রর্‌র্‌র্‌! ওঃ! আমি কিরূপ ঠাণ্ডা মারিয়া যাইতেছি! বরফের ন্যায় শীতল, বরফ-শীতল! ব্যাপারটি আমাকে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। এইসব প্রেমময়ী

অক্র-বক্র সখিদের দূর হইতে দেখিলেই আমি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হইয়া উঠি! আমার পায়ের ডিমে শির টানিয়া ধরিতেছে! এরূপ যন্ত্রণা সাহায্যের জন্য চিৎকার করার পক্ষে যথেষ্ট!

[বংশীর প্রবেশ]

বংশী : বউ দিদিমণির অসুখ—কারো সঙ্গে দেখা করছেন না।

হলধর : সোজা ঘুরিয়া যাও! সবেগে প্রস্থান করো, কুচকাওয়াজ করিতে কারতে! লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ রাইট্! অসুস্থ, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন না! ঠিক আছে, সাক্ষাতের কোনই প্রয়োজন নাই! আমিও কাহারও সাহত সাক্ষাৎ করিতেছি না! আমিও এই স্থানে বসিয়া থাকিব এবং থাকিবই! যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি অর্থ লইয়া আসিতেছেন, দেখি কিরূপ রমণী আপনি! আপনি যদি এক সপ্তাহ অসুস্থ থাকেন, আমিও এইস্থানে এক সপ্তাহ বসিয়া থাকিব। আর যদি এক বৎসর, আমিও এইস্থানে এক বৎসর। ঈশ্বর সাক্ষী, অর্থ আমাকে পাইতেই হইবে। আপনার শোকদগ্ধ চিত্ত লইয়া আমাকে বিরক্ত করিবেন না, অথবা আপনার গণ্ডদেশে টোল খাওইয়া আমার চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটাইবেন না। ঐ সব টোলের অর্থ আমরা অবগত আছি! (জানালার ধারে গিয়া) বলদেও গাড়ী হইতে অশ্ব দুইটিকে খুলিয়া দিয়া অস্তাবলে লইয়া গিয়া কিঞ্চিৎ দানা ভক্ষণ করাও। বামদিকের বদ ঘোড়াটি লাগামের ডাণ্ডা আবার বাঁকাইয়া দিয়াছে। (বলদেওকে অনুকরণ করিয়া) না না, ঐ রূপে নহে থামিয়া যাও, হল্ট্! আমি নীচে নামিয়া দেখাইয়া দিবো। (জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া) ভয়াবহ কাণ্ড, সম্পূর্ণরূপে বিভীষিকা! অসহ্য উত্তাপ, অর্থের দেখা নাই, গতরাত্রে এতটুকু নিদ্রা হয় নাই, আর অদ্য, শোকদগ্ধ চিত্তের ভাবস্থ অবস্থা! নীল বিষণ্ণ মেজাজ! শির দপ্‌দপ্ করিতেছে, সম্ভবতঃ কিছু পান করা উচিত, নিশ্চয়, এখনই আমাকে কিছু না কিছু পান করিতেই হইবে! কে আছো হেথায়!

বংশী : কি ইচ্ছা করেন, বলুন ?

হলধর : পান করা যায় এমন কোনো পদার্থ, বিষ ব্যতিরেক ! (বংশীর প্রস্থান। হলধর বসিয়া নিজের পরিচ্ছদ দেখিতে থাকেন।) ওঃ, আমার কি ছিরিই না হইয়াছে ! অস্বীকার করিয়া কোনো লাভ নাই ! ধুলা, ধূলিধূসর পাদুকা, অধৌত দেহ, অবিন্যস্ত কেশ, পরিচ্ছদের উপর কালি-ঝুলি, খড়, শুষ্কপত্র, তৃণ প্রভৃতি—মহিলা সম্ভবতঃ আমাকে ব্লকের মস্তান কিংবা গুণ্ডা বলিয়া মনে করিয়াছেন। (হাই তুলিয়া) এইরূপ পরিচ্ছদে ভিতরে আসা সামান্য অভদ্রোচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কোনরূপ ক্ষতি তো হয় নাই। আমি তো এইস্থানে কোনো নিমন্ত্রিত অতিথি নহি। আমি একজন পাওনাদার মাত্র। আর পাওনাদারদিগের জন্য পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ কি বিশেষভাবে নির্ধারিত আছে ? নাই।

বংশী : (পানীয় লইয়া প্রবেশ) আপনি কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন মশাই।

হলধর : (ক্রুদ্ধস্বরে) কি ?

বংশী : না, মানে বলছিলুম কি—

হলধর : কাহার সহিত কথা বলিতেছ জ্ঞান আছে কি ? অবোধ অজ্ঞান কোথাকার ! স্তব্ধ হও, সম্পূর্ণরূপে চুপ !

বংশী : (ক্রুদ্ধ হইয়া) চমৎকার কল তো ! এ তো দেখি যাবার নয় ! (প্রস্থান।)

হলধর : ঈশ্বর, আমি এমনই ক্রুদ্ধ হইয়াছি।—সমস্ত পৃথিবীকে ধূলিধূসর করিয়া দিতে পারি, পঙ্কিল কর্দম নিক্ষেপে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারি ! এমন কি—এমন কি—আমি অসুস্থ হইয়া পড়িতেছি ! কে আছো হেথায় !

[নতদৃষ্টি বনলতা বায়েনের প্রবেশ]

বনলতা : শুনুন, আমি এখন নির্জনবাসে আছি ! মানুষজনের কথাবার্তা শোনার অভ্যাস আমার চলে গেছে। তাছাড়া আপনার এই উচ্চ চিৎকার আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারছি না। অনুগ্রহ করে

আপনি এখন আসুন—আমার বিশ্রামে ব্যাঘাত করবেন না।

হলধর : আমার প্রাপ্য অর্থ আমাকে প্রদান করুন, আমি ঝটিতি প্রস্থান করি।

বনলতা : আমি তো একবার আপনাকে বলে দিয়েছি—সোজা কথায়, আপনার মাতৃভাষায়। আমার হাতে এখন টাকা নেই, পরশু অবধি অপেক্ষা করুন।

হলধর : আমিও তো যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর আপনারই মাতৃভাষায় আপনাকে অবগত করাইয়াছি, অর্থের আমার নিতান্তই প্রয়োজন, এবং তাহা আগামী পরশ্ব নহে, অদ্যই। আপনি যদি অদ্যই ঋণ পরিশোধ না করেন, তবে আগামীকল্যই আমাকে গলদেশে ফাঁস লাগাইয়া ঝুলিতে হইবে।

বনলতা : কিন্তু আজ আমার হাতে টাকা না থাকলে আমি কি করতে পারি বলুন ?

হলধর : আপনি তবে এই মুহূর্তে অর্থ দিবেন না ? দিবেন না তো ?

বনলতা : বললাম তো, এক্ষুনি পারছি না।

হলধর : তবে আমি এইস্থানেই বসিয়া রহিলাম, যতক্ষণ না পর্যন্ত অর্থ পাই (বসিলেন)। আপনি আগামী পরশ্ব অর্থ দিবেন ? সুন্দর ! আমিও এই স্থানেই রহিলাম আগামী পরশ্ব পর্যন্ত। (সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া উঠিয়া) আপনাকে একটি মাত্র প্রশ্ন করি—আমাকে কি ·আগামীকল্য সুদের টাকা জমা দিতে হইবে না ? আপনি কি মনে করেন আমি আপনার সহিত রঙ-তামসা করিতেছি ?

বনলতা : দেখুন, আমার একান্ত অনুরোধ—আপনি চেঁচাবেন না। এটা বসার ঘর, আস্তাবল নয়।

হলধর : আস্তাবল বিষয়ক কোনো কথাই আমি কহিতেছি না। আমার জিজ্ঞাস্য—আমাকে আগামীকল্য সুদ জমা দিতে হইবে কি হইবে না ?

বনলতা : ভদ্রমহিলার সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়—আপনার কোনো ধারণাই নেই।

হলধর : নিশ্চয় ধারণা আছে।

বনলতা : না, কোনো ধারণা নেই। আপনি অসভ্য—অশ্লীল, ঠিকমত মানুষই হন নি। ভদ্রলোকেরা ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে এই ভাষায় কথাবার্তা বলেন না।

হলধর : কি অদ্ভুত অসাধারণ! কোনো ভাষায় আপনার সহিত কথাবার্তা বলিতে হইবে? হিন্দী, দরবারী উর্দু?—জানি না। সম্ভবতঃ ফরাসীতে? সামান্য কিঞ্চিৎ জানি। মাদাম্, জ ভু প্রি—। আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিলাম, অনুগ্রহ করিয়া মার্জনা করিবেন। অদ্য আকাশ বাতাস কতই না সুন্দর! এই শোক-তপ্ত ভাবস্থ অবস্থা আপনার পক্ষে কতই না শোভন হইয়াছে! (প্রায় আভূমি নত হইয়া অভিবাদন জানাইলেন।)

বনলতা : ভাবছেন, খুব মজা হচ্ছে?—তাই না? মোটেই নয়! আপনি নিজেই জানেন না—আপনি কী অশ্লীল।

হলধর : কিছুমাত্র মজার নয়—অশ্লীল! আমি নাকি ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতে জানি না, মহিলাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতে পারি না! মাননীয়া মহাশয়া, আমার জীবন-প্রবাহে আমি চড়াই পক্ষী অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক স্ত্রীলোক দেখিয়াছি। তিনবার আমি মহিলাদের জন্য আস্তিন গুটাইয়া লড়িয়া গিয়াছি। বারোজনকে ডিগবাজি খাওয়াইয়াছি, ন'বার আমি ডিগবাজি খাইয়াছি। এক সময় ছিলো, বোকা বোবা ভাব করিতাম, মধুর মধুর বাক্য বলিতাম, ঘন ঘন অভিবাদন করিতাম, ঘন ঘন বিপদে পড়িতাম। প্রেম করিতাম, যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বিষণ্ণ থাকিতাম, চন্দ্রের দিকে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতাম, প্রেমের অত্যাচারে যন্ত্রণায় বিগলিত হইতাম। প্রচণ্ড বাসনা সহকারে ভালবাসিয়াছি, উন্মাদের ন্যায় ভালবাসিয়াছি, প্রতিটি সুরে ও স্বরে ভালবাসিয়াছি, দোয়েলের ন্যায় স্ত্রী-স্বাধীনতার সপক্ষে দোহার করিয়াছি, কোমল বাসনায়, বাসনার কোমলে অর্ধেক সম্পত্তি বিসর্জন দিয়াছি—আর বর্তমানে, ভগবান না হউক ভূতেরা অবগত আছে, প্রেমের যথেষ্টই হইয়াছে।

আপনার বশংবদ ভৃত্যটি যে আপনার দ্বারা নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ হইয়া নিজেকে চালিত হইতে দিতেছে সেইটি আর হইতে পারিবে না। যথেষ্ট! ঘুষাঘুষিতে কৃষ্ণচক্ষু যথেষ্ট, প্রেমায়িত ড্যাব্‌রায়িত চক্ষু তাহাও যথেষ্ট, প্রবালোপম ওষ্ঠাধর, গণ্ডদেশে টোল, ইহারাও যথেষ্ট ফুল্ল জ্যোৎস্নায় ফিস্‌ফিসানি, নম্রকোমল দীর্ঘশ্বাসানি—এ সমস্তেরই যথেষ্টই হইয়াছে-মাননীয়াসু—ইহাদের জন্য আমি আর একটি পয়সাও ঠেকাইতেছি না। আমি বর্তমান উপস্থিতির কথা বলিতেছি না কিন্তু সাধারণভাবে সমগ্র নারীজাতির কথা ধরিলে উহারা সকলেই বাচ্চাতম হইতে ধাড়ীতম পর্যন্ত, আপাদমস্তক মদোদ্ধত কপট বক্তিয়ার, বৃথা দম্ভে দাম্ভিক—অপ্রীতির বিতিকিশ্রী বঞ্চক, দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু উন্মাদ করা যুক্তিতে ক্ষুরধার নিষ্ঠুর, আর এইসব বিচারে, আপনারা আমার সারল্য মার্জনা করিবেন, একটি মাত্র চড়ুই-পক্ষীও উক্তরূপ দশটি পেটিকোট পরিহিতা ভাবস্থ ভাবিনীর সমমূল্যা। যখন এইরূপ কোনো প্রেমময়ী ভাবের-ঘরের সখি কাহারও দৃষ্টিগোচর হয়, তিনি কল্পনা করেন, তিনি যেন পূত-পবিত্র কিছু দেখিতেছেন, এতই আশ্চর্যময়ী, বিচিত্ররূপিণী যে, ঐ মনমুগ্ধকর প্রাণীর একটিমাত্র নিঃশ্বাসে তিনি যেন সহস্র মোহে মোহিত হইয়া সহস্র আনন্দের সাগরে দ্রবীভূত হইয়া যাইবেন। কিন্তু যদি অন্তর দেখা যাইত, তবে দেখিতেন, সামান্য সাধারণ নরখাদক কুম্ভীর ব্যতীত ঐ রমণী নামক প্রাণীটি আর অন্য কিছুই নহে। (আরাম কেদারাটি সজোরে চাপিয়া ধরিতেই তাহা দুইখণ্ড হইয়া গেল।) কিন্তু এই বিষয়ের সর্বাপেক্ষা মন্দ দিকটি কি জানেন? এই কুম্ভীরটি কল্পনা করেন তিনি যেন সৃষ্ট সমস্ত কিছুর মধ্যে চরমতম পরমতম নিদর্শন, আর যতো কিছু কোমল হৃদয়বৃত্তি, সমস্ত কিছুতেই যেন তাঁহার একচেটিয়া অধিকার। যদি স্ত্রীলোকের মধ্যে ভালবাসিবার মতো সামান্যতম কিছুও থাকে, তবে ভগবান—না না, ভগবান নহে, ভূত—ভুত কিংবা প্রেত যেন আমাকে, পা উপর দিকে তুলিয়া মাথা নীচের দিকে নামাইয়া, আপাদমস্তক

উল্‌টা ডিগবাজি দিয়া ঝুলাইয়া দেয়। যখন তিনি প্রেমে আছেন, তখন তিনি শুধু নালিশ জানান, আর অশ্রু বিসর্জন করেন। পুরুষ যদি কষ্ট পায়, যন্ত্রণা পায়, আত্মোৎসর্গ করে, তিনি ইতি-উতি ঘুরিয়া-ফিরিয়া, তাহার নাসিকায় রজ্জু আরোপ করিয়া তাহাকে ইচ্ছামত চালিত করিতে চেষ্টা করেন। দুর্ভগ্যবশতঃ আপনি নিজেও স্ত্রীলোক, স্বভাবতঃই স্ত্রীলোকের স্বভাব আপনি অবগত আছেন, আপনার সম্মানের শপথে আপনিই বলুন—স্বামীর প্রতি, সত্য, প্রেমিকার প্রতি বিশ্বস্ত, এমন কোনো স্ত্রীলোক আপনি আপনার জীবনে দেখিয়াছেন কি? কখনই দেখেন নাই, দেখিবেনও না। কেবল মাত্র বৃদ্ধারা, ও এঁকাবেঁকা রমণীরা যথার্থ ও বিশ্বস্ত হয়। বিড়ালের সিং দেখিতে পাওয়া সহজ, শ্বেতবর্ণের কাদাখোঁচা পাখিও, কিন্তু বিশ্বস্ত স্ত্রীলোক—সে তো কভু নহে, কভু নহে।

বনলতা : কিন্তু অনুমতি করেন তো জিজ্ঞাসা করি। প্রেমে যথার্থ আর বিশ্বস্ত কে? পুরুষেরা নিশ্চয়?

হলধর : নিশ্চয় অর্থে বাস্তবিক! পুরুষ! পুরুষ!

বনলতা : পুরুষ! (ব্যঙ্গের হাসি হাসেন।) প্রেমে পুরুষেরা নাকি যথার্থ আর বিশ্বস্ত! কথাটা নতুন শুনলাম! (তিক্তস্বরে) আপনি এমন কথা বলেন কি করে? পুরুষেরা নাকি যথার্থ! পুরুষেরা নাকি বিশ্বস্ত! যখন এতক্ষণ ধরে এতদূরই গেলাম, আর একটু যাওয়া যাক। বলতে পারি, জীবনে যতো পুরুষ জেনেছি, তাদের মধ্যে আমার স্বামী ছিলেন সবার সেরা; হৃদয়ের প্রচণ্ড আবেগ দিয়ে, সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁকে আমি ভালবাসতাম যেমন বুদ্ধিমান যুবতী মেয়েরা বাসে। আমি তাঁকে আমার যৌবন দিয়েছি, সুখ দিয়েছি, দিয়েছি আমার সৌভাগ্য, আমার জীবন। তাঁকে কার্তিক ঠাকুরের মতো দেখতাম, কার্তিক ঠাকুরের মতো পুজোও করতাম। কিন্তু কি হলো? তাঁর মৃত্যুর পর দেখলাম, তাঁর বাক্স অন্যের প্রেমপত্রে ভর্তি। যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিনই মাঝে মধ্যেই আমাকে মাসের পর মাস একা ফেলে রেখে—কি বলবো?

ভাবতেও আমার ভয় করে—অন্য মেয়েছেলের সঙ্গে—হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক সময় আমার সাক্ষাতেই তিনি আমাদের অর্থের অপচয় করেছেন, আমার কোমল সব অনুভূতি নিয়ে তামাসা বিদ্রূপ করেছেন—আর এসব সত্ত্বেও, আমি তাঁকে বিশ্বাস করতাম, তাঁর প্রতি যথার্থ ছিলাম।—তার চেয়েও বেশী। এখন তো তিনি বেঁচে নেই, এখনও আমি তাঁর প্রতি যথার্থ! আমি এই চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে বন্দী রেখেছি, আর চিতায় না ওঠা পর্যন্ত এই শোকতপ্ত চিত্তেই থাকবো।

হলধর : উঃ! শোকতপ্ত চিত্ত! আপনি আমাকে কিরূপ মনে করেন? এই যে নীলাভ বিষণ্ণ ভাবস্থ অবস্থা, এই যে কক্ষ-প্রাচীরের মধ্যে নিজকে বন্দী করিয়া রাখা—আমি কি কিছুই বুঝি না, আমার কি কিছুমাত্র বোধ নাই? নীচের পথ দিয়া পথিক যাইবে, আর উপরের জানালার দিকে তাকাইয়া ভাবিবে—মধুর মোহের মতো, বিচিত্র এক রূপবতী বিধবার বসতি এখানে, স্বামীশোকে বন্দী রাখে কক্ষ অন্তরালে। প্রেমে আপনি শিল্পী হইতে পারেন, কিন্তু আপনার এই শিল্প কৌশল আমি অবগত আছি।

বনলতা : (লাফাইয়া উঠিয়া) কি!—এসব বলে কি বোঝাতে চান আপনি?

হলধর : আপনি নিজকে বন্দী রাখিয়াছেন, কিন্তু নাসিকার অগ্রভাগে পাউডারের প্রলেপ দিতে বিস্মৃত হন নাই।

বনলতা : কোন্ সাহসে আপনি এসব বলেন?

হলধর : চিৎকার করিবেন না, আমি আপনার ম্যানেজার নহি, যাহার যাহা নাম, তাহাকে সেই নামেই ডাকিতে অনুমতি দিন। আমি রমণী নহি, রমণীমোহনও নহি, এবং পুরুষ বলিয়াই, আমার যাহা মনে হয় তাহা তাহা বলিতেই আমি অভ্যস্ত। সুতরাং, অনুগ্রহ করিয়া চিৎকার করিবেন না।

বনলতা : আমি মোটেই চিৎকার করছি না। চিৎকার করছেন আপনি। অনুগ্রহ করে এখন আপনি আসুন।

হলধর : আমার প্রাপ্য অর্থ আমাকে প্রদান করুন, আমি আসিতেছি।

বনলতা : আপনাকে আমি টাকা দেবই না।

হলধর : দিবেনই না? আমার টাকা আমাকে দিবেনই না!

বনলতা : যা খুশি তাই করতে পারেন। একটি পয়সাও পাবেন না। এখন আসুন!

হলধর : দেখুন, যেহেতু আপনার স্বামী হইবার কিংবা প্রেমিক হইবার আনন্দ লাভ করি নাই, সেই হেতু, অনুগ্রহ করিয়া নাটক করিবেন না। (বসিয়া) নাটক আমি বরদাস্ত করিতে পারি না।

বনলতা : (দ্রুত নিঃশ্বাস লইতে লইতে) আপনি এখনও বসতে যাচ্ছেন!

হলধর : বসিতে যাইতেছি নয়, বসিয়া পড়িয়াছি।

বনলতা : অনুগ্রহ করে আসুন, বেরোন বাড়ি থেকে।

হলধর : প্রাপ্য অর্থ দিন। আমাকে সুদ জমা দিতে হইবে।

বনলতা : দুর্বিনীত লোকেদের সঙ্গে আমি কথা বলি না। বেরোন!··· আপনি তাহলে যাচ্ছেন না?

হলধর : না।

বনলতা : না!

হলধর : না।

বনলতা : খুব ভালো কথা। (ঘণ্টা বাজাইলেন।)

[বংশীর প্রবেশ।]

বনলতা : বংশীদা, ভদ্রলোককে বাইরে যাবার দরজা দেখিয়ে দাও।

বংশী : (হলধরের নিকট গিয়া) মশাই, আপনাকে যখন হুকুম করা হয়েছে, যাচ্ছেন নাই বা কেন?

হলধর : (লাফাইয়া উঠিয়া) কাহার সহিত কথা বলিতেছ বলিয়া মনে করো? আমি তোমাকে গুঁড়াইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া বংশীচূর্ণে পরিণত করিব।

বংশী : (বুকে হাত দিয়া) হা ভগবান! (ধপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া) আমার শরীর খারাপ করছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

বনলতা : দশা কোথায়? (ডাকেন) দশারাম, পাঁচুলাল! দশা!

(ঘণ্টা বাজান।)

বংশী : ওরা কেউ নেই। কার বাগানে যেন কুল পাড়তে গেছে ! বড্ড অসুখ করছে ! জল !

বনলতা : (হলধরকে) বেরোন এক্ষুনি !

হলধর : অনুগ্রহ করিয়া সামান্য ভদ্র হউন। বেশী নহে, যেরূপ আছেন, অপেক্ষা সামান্য অধিক।

বনলতা : (হাতে তাল ঠুকিয়া, মাটিতে পা ঠুকিয়া) আপনি অশ্লীল, আপনি বর্বর, আপনি দানব !

হলধর : কি বলিবেন ?

বনলতা : বললাম—আপনি বর্বর, দানব !

হলধর : (বনলতার দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া) অনুমতি করুন, জিজ্ঞসা করি, আমাকে অপমান করিবার কি অধিকার আপনার আছে ?

বনলতা : তাতে কি হলো ? অধিকারের নিকুচি করেছে ! আপনি কি মনে করেন আমি আপনাকে ভয় করি ?

হলধর : আর আপনি কি মনে করেন, যেহেতু আপনি মঞ্জরিণী পল্লবিনী ভাবস্থ রমণী, সেই হেতু কোনরূপ দণ্ডের অপেক্ষা না করিয়াই আপনি আমাকে অপমান করিতে পারেন ? আমি আপনাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিব।

বংশী . ঈশ্বর, করুণাময় এক গ্লাস জল !

হলধর : আমি আপনার সহিত লড়িয়া যাইব। দেখিব—ঐ রমণী আকার কতো বল ধরে !

বনলতা : আপনি কি মনে করেন, আপনার চওড়া থাবা আর ষাঁড়ের মতো কাঁধ আছে বলে আমি আপনাকে ভয় করবো ?

হলধর : (তাল ঠুকিয়া) আমাকে আপমান করিতে আমি কাহাকেও অনুমতি দিই না। স্ত্রীলোক বলিয়া, অবলা বলিয়া, ইহাতে কোন-রূপ ব্যতিক্রম হইবে না।

বনলতা : (চিৎকার করিয়া থামাইয়া দিবার চেষ্টা করেন) বর্বর—

গেঁয়ো-চাষার মতো বর্বর ! বর্বর !

হলধর : পুরুষের ব্যবহার শ্লীল হইবে সন্তোষজনক হইবে—এই পুরাতন সংস্কার পরিহার করিবার সময় হইয়া গিয়াছে বহুকাল। যদি সমতার কথাই আসে, তবে সর্ববিষয়েই সমতা হউক। অতিক্রমের একটি সীমা তো আছেই !

বনলতা : আপনি তো মিলিটারি ! মস্তান ! লড়ে যেতে চান—তাই না ?

হলধর : এই মুহূর্তে।

বনলতা : নিশ্চয় ! এই মুহূর্তেই ! কিন্তু শুধু হাতে নয়—পিস্তল নিয়ে। আমার গতপূর্ব স্বামীর পিস্তল আছে—একজোড়া আমি এখনই নিয়ে আসছি। (প্রস্থান-পথের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দাঁড়ান।) ওঃ ! আপনার ঐ উদ্ধত দুর্বিনীত মস্তিষ্কে একটি গুলি পুরে দিতে পারলে কি সুখই যে পাবো ! ঈশ্বর—না না, ঈশ্বর নয়—ভূত প্রেতেরা আপনাকে নরকে নিক ! (প্রস্থান।)

হলধর : আমি উহাকে গুলিবিদ্ধ করিবই ! নহি নহি—আমি তো নবোদ্ধত-পক্ষ পক্ষীশাবক নহি, সোহাগলুব্ধ বিলাতি কুক্কুর-শাবকও নহি। আমার অভিধানে অবলা বামা বলিয়া কোনো শব্দই নাই।

বংশী : (হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া) মশাই, আমি বুড়ো মানুষ, আমার ওপর দয়া করে আপনি এখান থেকে চলে যান। এর মধ্যেই আমি ভয়ে প্রায় মরেই গেছি, এখন আবার আপনারা লড়ে যেতে চাইছেন !

হলধর : (বংশীর দিকে কোনরূপ দৃষ্টি না দিয়া) দ্বন্দ্ব ! অর্থাৎ লড়িয়া যাওয়া ! ঠিক আছে, লড়িয়াই যাইব। এই পথেই সমতা আসিবে, নারীর মর্যদা আসিবে, স্ত্রী-স্বাধীনতাও আসিবে। এই রূপেই অবলাবামা সবল পুরুষের সহিত সমান হইবে। নীতি হিসবে ঐ রমণীকে আমি গুলিবিদ্ধ করিব। এরূপ এক স্ত্রীলোককে আর কি বলা যাইতে পারে ? (বনলতাকে অনুকরণ করিয়া) "ভূত-প্রেতেরা আপনাকে নরকে লউক। আপনার ঐ উদ্ধত,

দুর্বিনীত মস্তিষ্কে একটি গুলি পুরিয়া দিতে পারিলে কি সুখই যে পাইব।" ইহার উত্তরে কী-ই বা বলা যাইতে পারে? তিনি ক্রুদ্ধ, তাঁহার চক্ষু জ্বল জ্বল করিতেছিল, তিনি লড়িতে সম্মত হইলেন। আমার সম্মানের দিব্য—এরূপ স্ত্রীলোক আমি আমার জীবনে এই প্রথম দেখিলাম।

বংশী : মশাই, হাত জোড় করছি, এখান থেকে চলে যান, দোহাই আপনার, এখান থেকে চলে যান।

হলধর : স্ত্রীলোক বটে নিশ্চয়! একমাত্র আমিই তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি। সত্যই, বাস্তবিক স্ত্রীলোক একখানি। কোনরূপ ইনানি বিনানী নাই, আছে আগুন, আছে বারুদ—আছে শব্দের কোলাহল। এইভাবে ঐরূপ এক স্ত্রীলোককে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলে এক শোকাবহ ঘটনাই ঘটিবে।

বংশী : (কাঁদিতে কাঁদিতে) ও মশাই, দোহাই আপনার, যান না এখান থেকে!

[বনলতার প্রবেশ]

বনলতা : পিস্তল এনেছি। আমি কিন্তু পিস্তল-টিস্তল নিয়ে কোনদিন নাড়াচাড়া করিনি। লড়বার আগে আপনি কিন্তু আমাকে গুলি ছোঁড়া শিখিয়ে দিচ্ছেন?

হলধর : নিশ্চয় দেবো। দেখি। বাহ্—জর্মন রিভলবার, বেশ মূল্যবান, দুই-পাঁচ সহস্র তো হইবেই। এই—এইভাবে রিভলভার ধরিতে হয়। (জনান্তিকে) আহা—কি চক্ষু—কি চক্ষু—আঁখিপদ্মের ন্যায়! স্ত্রীলোক বটে একখানি!

বনলতা : এইভাবে?

হলধর : হ্যাঁ, ঠিক ঐ ভাবেই। তাহার পর এই ক্ষুদ্র হাতুড়ির মতো আঁকশিটি পিছনে টানিবেন। অমনি নল খুলিয়া যাইবে! লক্ষ্য স্থির করিবেন। মাথাটি পিছনে অল্প হেলাইয়া দিবেন। অনুগ্রহ করিয়া বাহু বাড়াইয়া দিবেন। তাহার পর অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিবেন। এই মতো—আর কিছুই করিতে হইবে না। শিখিবার

মতো প্রধান বিষয়বস্তু ইহাই। উত্তেজিত হইবেন না। লক্ষ্য দ্রুত স্থির করিবেন না। দেখিবেন, আপনার হস্ত যেন কম্পিত না হয়।

বনলতা : ঘরের ভেতর গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি করা ভালো নয়। চলুন—বাগানে যাই।

হলধর : তাহাই চলুন! তবে, এইবার আপনাকে বলি—আমি কিন্তু শূন্যে গুলি ছুঁড়িব।

বনলতা : এবার কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন। কেন, শুনি?

হলধর : কারণ—অকারণ। কারণ—উহাই আমার অভিপ্রেত কর্ম বলিয়া।

বনলতা : বুঝেছি, আপনি ভয় পেয়েছেন। হ্যাঁ, নিশ্চয় ভয় পেয়েছেন। না মশাই, এখন পেছলে চলবে না। আসুন, অনুগ্রহ করে আমার পেছন পেছন আসুন। আপনার মাথায় যতক্ষণ না একটা ফুটো করতে পারছি, ততক্ষণ আমার বিশ্রাম নেই। কী ঘেন্নাই আপনাকে করি! সত্যিই ভয় পেয়েছেন তো?

হলধর : সত্যই ভীত হইয়াছি।

বনলতা : উঁহু! আপনি মিথ্যে বলছেন। আপনি একটা ভীরু মস্তান। কেন লড়বেন না শুনি?

হলধর : কারণ—কারণ—আমার আপনাকে বড়ই পছন্দ হয়।

বনলতা : (ক্রুদ্ধ হাসি হাসিয়া) আপনার আমাকে বড়ই পছন্দ হয়! লোকটার সাহস দেখ—বলে কিনা—ওনার আমাকে বড়ই পছন্দ হয়! চলুন, বাগানে চলুন।

হলধর : (রিভলভারটি নীরবে টেবিলের উপর রাখিয়া অগ্রসর হন। একটু থামিয়া বনলতার দিকে নীরব দৃষ্টিপাত করিয়া ইতস্তত স্বরে) অনুগ্রহ করিয়া বলুন—আপনি কি এখনও ক্রুদ্ধ? আমি ভূত-প্রেতের ন্যায় উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বুঝিবার প্রয়াস করুন—আমি কিভাবে নিজেকে স্বপ্রকাশ করিতে পারি? বিষয়টি এইরূপ—অর্থাৎ—এই সমস্ত বিষয় ঠিক—(অল্প উচ্চ গ্রামে) আপনি আমার নিকট

অর্থদায়ে ঋণী, ইহা কি আমার অপরাধ? (চেয়ারের পিছনে ভার দিয়া ধরিলে চেয়ারটি ভাঙিয়া যায়।) ঈশ্বর অবগত আছেন—ঈশ্বর অবগত না থাকেন ক্ষতি নাই, ভূত-প্রেতেরা নিশ্চয়ই অবগত—আপনার আসবাবপত্র বড়ই ভঙ্গুর। আমি—আমি আপনাকে পছন্দ করি! উপলব্ধি হইয়াছে কি? আমি—আমি আপনাকে প্রায় ভালবাসি বলিলেই হয়।

বনলতা : বাগানে চলুন এখনই! আমি আপনাকে ঘৃণা করি।

হলধর : ঈশ্বর—ঈশ্বর! কী একখানি স্ত্রীলোক! জীবনে এরূপ স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই! সেই কপালকুণ্ডলার মতো।—'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' নিশ্চয় হারাইয়াছি, বিধ্বস্ত হইয়া গেলাম! নেংটি মুষিকের ন্যায় পাতা কলে ধরা পড়িয়া গিয়াছি।

বনলতা : বাগানে চলুন, নয়ত এখানেই গুলি করবো।

হলধর : করুন গুলি! আপনার কোনো ধারণাই নাই, ঐ সুন্দর পদ্ম-আঁখি কিংবা আঁখিপদ্মের দৃষ্টিপাতে; ঐ কোমল বাহুধৃত রিভলভারের গুলিতে মরিতে আমার কী না আনন্দ। আমি উন্মাদ হইয়া গিয়াছি। আপনি এই মুহূর্তে আমাকে বিবেচনা করুন, কারণ এইস্থান একবার ত্যাগ করিলে আর ফিরিয়া আসিব না। আমাদের আর কখনই সাক্ষাৎ হইবে না। যাহা বলিবার মতিস্থির করিয়া বলুন। আমি একজন উচ্চবংশের মান্যগণ্য ভদ্রলোক, বৎসরে পনেরো সহস্র মুদ্রার মতো আয়, সৈন্যবিভাগে উপাধ্যক্ষ ছিলাম, শূন্যে মুদ্রা নিক্ষেপ করিয়া, ভূমিতে পড়িবার পূর্বেই উহাকে গুলিবিদ্ধ করিতে পারি। আমার কিছু সুন্দর অশ্ব আছে—আর অশ্ব এক মহান জন্তু—আপনি কি আমার পত্নী হইবেন?

বনলতা : (রিভলভার দোলাইতে দোলাইতে) গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।

হলধর : আমার বোধ কি রকম অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে? ঠিকমত উপলব্ধিই করিতে পারিতেছি না। কে আছো হেথায়? জল!

পানীয় জল! যে কোনো কম বয়সী ছোকরার ন্যায় আমি প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি। (বনলতার হাত নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করেন। বনলতা যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া উঠেন। হলধর, প্রায় নাচিতে নাচিতে) ভালোবাসি, ভালোবাসি—আমি আপনাকে ভালোবাসি! (হাঁটু-গাড়িয়া বসিয়া) এরূপ ভালো পূর্বে কখনও কাহাকেও বাসি নাই। বারোজন স্ত্রীলোকের সহিত ছিনালি করিয়াছি, নয়জন আমার সহিত করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের একজনকেও, আপনাকে যেরূপ ভালোবাসিয়াছি, সেরূপ ভালোবাসি নাই। আমি বিজিত, কপালকুণ্ডলার নবকুমারের ন্যায় পথভ্রষ্ট, নির্বোধের ন্যায় আপনার পদতলে পড়িয়াছি, উন্মাদের ন্যায় আপনার পাণি ভিক্ষা করিতেছি। ধিক! কি কলঙ্ক, কি লজ্জা! গত পাঁচ বৎসর আমি প্রেমে পড়ি নাই, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়াছি! আর এখন, একটি জুড়ী-গাড়ি আর একটির সহিত আটকাইয়া গেলে যেরূপ হয়, আমিও সেইরূপে আটকাইয়া গিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছি! আমি আপনার পাণি প্রার্থনা করি! বলুন—হ্যাঁ কিংবা না? আপনি কি গ্রহণ করিবেন—ভালো! (উঠিয়া দ্রুত দরজার দিকে অগ্রসর হন।)

বনললা: এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন!

হলধর: (থামিয়া) বলুন?

বনলতা: কিছু নয়। আপনি যেতে পারেন, কিন্তু—আচ্ছা একটু অপেক্ষা করুন। না না, বেরিয়ে যান আপনি। আপনাকে আমি ঘেন্নাই করি। ও—না না, যাবেন না। ওহ—আপনি যদি জানতেন, আমি কি ভীষণ রেগে গেছি, কী ভীষণ! (রিভলভারটি চেয়ারে ছুঁড়িয়া দিলেন।) এটা ধরে আমার আঙুল ফুলে গেল। (রাগিয়া গিয়া রুমাল ছিঁড়িয়া) আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বেরিয়ে যান!

হলধর: বিদায়!

বনলতা: হ্যাঁ, বিদায়। (চিৎকার করিয়া) যাচ্ছেন কেন? দাঁড়ান

—না, বেরোন! ওহ্‌ কি ভীষণ রেগে গেছি আমি! কাছে আসবেন না, খুব একটা কাছে আসবেন না—না না, আর নয়, যথেষ্ট এগিয়েছেন—আর কাছে নয়, আর কাছে নয়।

হলধর: (নিকটবর্তী হইতে হইতে) কী ভীষণ ক্রুদ্ধই না হইয়াছি নিজের উপর। বিদ্যালয়ের এক বালকের মতই প্রেমে পড়া, হাঁটু গাড়িয়া বসা—আমার কিরূপ যেন সর্দি হইয়াছে। আমি তোমাকে ভালোবাসি। চমৎকার—এইরূপ প্রেমে পড়ারই প্রয়োজন ছিলো। আগামীকল্য আমাকে সুদ জমা দিতে হইবে, খড়-তোলা আরম্ভ করিতে হইবে, আর এমন সময় তোমার আবির্ভাব! (বনলতাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া) আমি নিজেকে কোনদিনই ক্ষমা করিতে পারিব না।

বনলতা: সরে যান! হাত সরিয়ে নাও বলছি! আমি···আমি··· তোমাকে ঘেন্না করি···তুমি···তুমি একটা বর্বর···এটা কি হচ্ছে কি···(একটি কুড়ুল লইয়া বংশীর প্রবেশ, সঙ্গে মালীর খুরপি, গড়োয়ান বড়ো একটি খন্তা আর কাজের লোকেরা বাঁশ লইয়া)।

বংশী: (আলিঙ্গনাবদ্ধ দুইজনকে দেখিয়া) দয়াময়! দয়াময়! এ কি দেখালে?

বনলতা: (দৃষ্টি নত করিয়া) বংশীদা, আস্তাবলে বলে দিও আজ যেন তুতুকে বেশী দানা না দেয়।

নব-স্বয়ংবর

[অগ্রণী নাট্য-সংস্থার মেলা-মেশার আসর। অনুগ্রাহক, সমর্থক ও দরদীরা নিজ নিজ আসনে বসিয়া আছেন। মঞ্চে অগ্রণীর নাট্য-সম্পাদক উপস্থিত]

সম্পাদক : আজ আবার আমাদের মেল-মশার আসর। আপনারা হয়তো বলবেন—'এত ঘন ঘন মেলামেশার আসরের দরকারটা কি? এই তো সেদিন একটা হয়ে গেল! তার চেয়ে, আপনারা মশাই নাটুকে দল—নাটক করুন, আমরা হাততালি দিয়ে বাড়ি যাই।' এর উত্তরে সেবারও বলেছিলাম, এবারও আমাদের বলতে হচ্ছে যে—আমরা নাটক পাচ্ছি না। এখানে কথা উঠতে পারে—'সেকি মশাই! বাজারে এতগুলো নাটক হচ্ছে, সকলে সেগুলোকে নাটক বলে দেখতে যাচ্ছে—আর আপনারা বললেই হবে, নাটক পাচ্ছেন না! তার চেয়ে বলুন না, নাটক করবেন না।' এখানে কিন্তু একটা কথা আছে। সর্ববাদীসম্মত নাটক আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ধরুন, পুরোনো দিনের মাইকেল মধুসূদন দত্ত বা দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়দের কথা। এঁদের তো বাংলা নাট্য সাহিত্যের জনক বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু আমরা বললে কী হবে? বেশ কিছু লোক এঁদের নাটক সম্বন্ধে অনেক কিছু কথা বলে থাকেন। দীনবন্ধু মিত্রের কথায় বলেন,—না না, ও ঠিক সভ্য নাটক নয়, অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। আমরা পেছিয়ে গিয়ে ধরলাম মাইকেলের 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' আর 'একেই কি বলে সভ্যতা'। মাথাওয়ালা লোকেরা এসে ধমকে দিলেন—নাটক করবো বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছো কেন?—বললেই পারতে, স্টেজে দাঁড়িয়ে মুখ খারাপ করবো—আপনারা এসে শুনুন। ভয়ে ভয়ে গিরীশচন্দ্রে হাত দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ধারক আর বাহকেরা তেড়ে এলেন। শুনতে পেলাম—উনি নাকি ভক্তিবাদ, সমাজবাদ, ইতিহাস, সব কিছু মিলিয়ে নাটক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বলিদান হয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথে এলাম। কিছু

লোক দেখতেও এলেন। শেষ হয়ে গেলে জিজ্ঞেস করলাম—কেমন দেখলেন? গম্ভীরভাবে বললেন—ওটা রবীন্দ্রনাথ হয়নি, কার্ল্ মার্ক্স্ হয়েছে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কেন? অভিনয় কি ভালো হয়নি? বললেন—অভিনয় ভালো হয়েছে বলেই তো অপত্তি। রবীন্দ্রনাথের নাটকে অভিনয় করা নিয়ম নয়, জানেন তা?—ও শুধু এঁকেবেঁকে ইনিয়ে বিনিয়ে বলে যেতে হবে, আর ভক্তিভরে শুনতে হবে!—যেটুকু অভিনয় করবেন সেটুকু কার্ল্ মার্ক্স্ হয়ে যাবে, বুঝলেন। তাঁরা ধমকে বেরিয়ে গেলেন, ভয়ে আমরা কথা বলতে পারলান না—চোখগুলো শুধু বড়ো বড়ো হয়ে গেল। শেষে ভাবলাম, ঠিক আছে। ভীষ্ম-আলমগীর-প্রতাপাদিত্যই করবো। রিহার্সাল আরম্ভ করবার আগে কেউ ভীষ্ম, কেউ আলমগীর, কেউ প্রতাপাদিত্য সেজে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। কেমন দেখায় দেখতে হবে। দেখলাম, সব সাড়ে-বত্রিশভাজার সেল্স্ম্যান্ হয়ে গেছি—শুধু পায়ে ঘুঙুরটা নেই। শেষে সমকালীন নাট্যকারদের নাটক নিয়ে কাজ আরম্ভ করবো ঠিক করলাম। কিন্তু সমকালীন বাংলা সাহিত্যের যাঁরা ম্যানেজিং ডিরেকক্টর, যেমন ধরুন—পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক,—এঁদের মতে সাহিত্যে নাটক অপাংক্তেয়। কাজেই বাংলা নাটক নিয়ে যুগোপযোগী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার সুযোগ সাহিত্যিকদের নেই বললেই চলে। এমন অবস্থায় যা দু-একখানা নাটক পেয়েছি তা আপনাদের সামনে অভিনয় করেছি। কিন্তু তাতে আপনাদেরও চাহিদা মেটেনি, আমাদেরও না। শেষ পর্যন্ত সব তুলে দেবো ঠিক করছি, এমন সময় আর একজন এসে পথ দেখালেন। তিনি বললেন—আপনারা সত্যিকারের থিয়েটারকে বাদ দিয়ে চলেছেন, তাই আপনাদের এই অবস্থা। জিজ্ঞেস করলাম—সত্যিকারের থিয়েটার? বললেন—হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। ওই যাকে বলে কলকাতার থিয়েটার—বেস্পতি-শনি-রবি. প্রত্যেক হপ্তায় তিনদিন করে থিয়েটার করে চলেছে, তিনশো থেকে পাঁচশো নাইট ধরে। ভেবে দেখলাম—সত্যিই ভুল

করেছি। এরাই তো সত্যিকারের থিয়েটার। আর সত্যিকারের থিয়েটার বলেই তো এদের আমোদ-কর দিতে হয় না। সরকারী মতে সত্যিকারের থিয়েটার হতে গেলে ভালো নাটক, ভালো অভিনয়—এসব কিছু তো থাকার দরকার নেই। শুধু নিজদের একটা থিয়েটার-বাড়ি থাকলেই হলো। সেটা এঁদের আছে। মালিককে মাসে দু-তিন হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে বাড়িটা এঁরা নিজেদের করে নিয়েছেন। এঁদের ঐ হপ্তায় তিন দিনের নাটক দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতার অলি-গলিতে নাকি থিয়েটারের ভিয়েন বসে গেছে। সপ্তাহের বাকি চারদিন দলের পর দল এঁদেরই নাটকের ধারায় অনুপ্রণিত হয়ে তিন থেকে চারশো টাকা ভাড়া দিয়ে এঁদেরই বোর্ডে নাটকের পর নাটক নামিয়ে চলেছেন। এঁরা বুদ্ধিমান লোক। নিজদের ভাড়াটার প্রায় দ্বিগুণ পরের ভাড়ায় তুলে নিয়ে শত-রজনী করে চলেছেন। এক একটা শত-রজনী আসে, আর ধারক আর বাহকেরা নেমন্তন্ন নিয়ে থিয়েটার দেখতে এসে বক্তৃতার তোড়ে সব ভাসিয়ে দিয়ে যান। আর শুধু থিয়েটার! সাহিত্য! (ততক্ষণে সম্পাদকের মুখে চোখে সম্পাদক ভাব আর নাই। মনে হইতেছে, তিনি যেন এক অভিনেতা। রঙ্গমঞ্চে সম্পাদকের ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন।) এঁদের অনুপ্রেরণায় কলকাতার রকে রকে থিয়েটার-কাম-সাহিত্য পত্রিকা সব ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে। খুলে দেখুন, আস্ত একখানা উপন্যাস থেকে আরম্ভ করে বি জি বেঙ্গল ক্লাবের শ্রীঢনঢনিয়ার গলায় মালা-দেওয়া-থিয়েটার—আবার ঐ গলায় মালা-দেওয়া-থিয়েটার থেকে আরম্ভ করে অলি-গলির থিয়েটারের গ্রীন-রুমের কেলেঙ্কারী। সত্যিই তো। এরাই তো আসল ট্র্যাডিশনাল থিয়েটার! আমরা কি? কিচ্ছু নয়। থিয়েটারের স্কুল থেকে মাঝে মাঝে রেপারটরি হয়ে যাই—আবার রেপারটরি থেকে মাঝে মাঝে লিট্‌ল্ থিয়েটার মুভমেণ্ট হয়ে যাই। এই তো আমাদের অবস্থা! নাঃ—ট্র্যাডিশনাল থিয়েটার দেখতেই হবে!

গেলাম দেখতে। গিয়ে দেখি চমৎকার ব্যবস্থা। সেখানে কোনো লেখা-নাটক নেই, সব কলের নাটক! এক-একটা কল এক এক রকমের। কোনোটাতে উপন্যাস ফেলে দিন—সংলাপটুকু ছেঁকে নাটক হয়ে বেরিয়ে আসছে। আবার কোনটাতে—পাগলা অধ্যাপক, শিক্ষিত বেকার, আমরা খেতে পাচ্ছি না, তরুণী নায়িকা, মাঝামাঝি জায়গায় এক ভিলেন—এই ধরনের কিছু চরিত্র ছেড়ে দিন, দেখবেন বিরাট এক ট্র্যাজেডি মহানাটক হয়ে অভিনীত হয়ে বেরিয়ে গেল, হাততালির আর শেষ নেই! আমিও হাততালি দিয়ে বেরিয়ে এসে বাজারে কল কিনতে গেলাম। পেলাম না। শুনলাম থিয়েটারের কর্তারা পেটেন্ট করিয়ে নিয়ে নিজদের জন্য দু-তিনটি তৈরি করে রেখেছেন, বাজারে চালু করেন নি। তাহলেই বুঝে দেখুন, নাটক থেকেও আমাদের কাছে নাটক নেই। যাওবা আছে, তাও খুব কম, আর আমাদের মনের মতো নাটক তো আরও কম। তবু কিন্তু টিঁকে ছিলাম। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের মাধ্যমে দেশের নাট্যধারাকে উন্নত করবো, এই সব বড়ো বড়ো কথা ভেবেই ইবসেন-চেখফ-গর্কির অনুসরণ-নাটক নিয়ে নামলাম। সঙ্গে সঙ্গে এ-কাগজ ও-কাগজে বড়ো বড়ো চিঠি। আমরা নাকি বাংলায় মৌলিক নাট্যসৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছি। আপনারাই বলুন—এর পর আমাদের আর কিছু করবার রইলো কি? নিশ্চয় রইলো। আমরা তিনটের যে কোনো একটা কাজ এখনও করতে পারি। এক—আপনাদের ঐ বাজার-চলতি কয়েকখানা নাটক পর পর অভিনয় করে, তিনি মেলাবেন, তিনি মেলাবেন বলতে বলতে বাজারের সঙ্গে মিশে গিয়ে ভেলভেট কার্টেন তুলে থিয়েটারের বাগানবাড়ি তুলে ফেলতে পারি। মানে, সে এক বিরাট ব্যাপার। এপাশে মোটর গাড়ির আস্তাবল, ওপাশে সাইকেল স্ট্যাণ্ড্। ঢুকেই নাট্যশালার ইতিহাস, পাশেতে বাগান। ভেতরে ডানলোপিলো সিট্‌স্, আর সামনে ঘুরন্ত স্টেজ। ভালো না লাগে, বেরিয়ে এসে ইতিহাসে বিচরণ করুন।

তাতেও যদি ভালো না লাগে, নাট্যোন্নয়ন করতে করতে সেমিনার হয়ে যান। আর তুই—(পাশ দিয়া টলিতে টলিতে মঞ্চে এক মাতালের আবির্ভাব)

মাতাল : আর তুই, টিকেট কেটে হাওয়াই জাহাজে ভেসে পড়ো মানিক।

সম্পাদক : ঠিক—ঠিক—ঠিক—কিন্তু না, ঠিক নয়, তুমি কে ?

মাতাল : আমি মাতাল মানিক। মায়ের চরণাশ্রিত। তিন বোতল 'মা' মার্কা টেনে পয়মাল হয়ে আছি।

সম্পাদক : মাতাল ! মাতাল তো এখানে কি ! যাও এখান থেকে ! দেখছো না এখানে সভা হচ্ছে ! ও—দাঁড়াও দাঁড়াও—তুমি কি করে জানলে আমি টিকেট কাটার কথা বলছি ?

মাতাল : আমি জানি গোপাল, তোমার যে পেট গরমের ধাত। হাত-পা নেড়ে যে রকম গরম গরম বুলি দিচ্ছিলে, পেট গরম না হলে তো ও হয় না মানিক ! ওই এক ওষুধ ! হাওয়াই জাহাজের টিকিট কেটে হাল্‌কা হাওয়ায় ভেসে পড়ো—আপ্‌সে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে গোপাল !

সম্পাদক : আচ্ছা আচ্ছা—বেশ হয়েছে—এখন যাও এখান থেকে ! যাও বলছি !

মাতাল : গেলুম না।

সম্পাদক : গেলুম না ! মানে ?

মাতাল : গেলুম না মানে গেলুম না। যাও বললে তো আমি যাবো না মানিক। যাও বলতে নেই। এসো বলো—সুড়-সুড় করে চলে যাচ্ছি। তবে হ্যাঁ, জয় গোপাল বলতে বলতে—

সম্পাদক : আচ্ছা, ঠিক আছে—এখন যা-যা যাও, মানে এসো !

মাতাল : এই তো—পথে এসো মানিক—আমি সুড়-সুড় করে চলে যাচ্ছি ! তবে হ্যাঁ, পাশেই রইলাম। গরম গরম বুলি হলেই চলে আসবো কিন্তু—শুনতে ভারী ভালো লাগে ! জয় গোপাল, জয় গোপাল বলে—বল মন—মন, একবার জয় গোপাল বলো তো ! (প্রস্থান।)

সম্পাদক : (অস্ফুট স্বরে) ওঃ আচ্ছা আপদ যা হোক। (দর্শকদের দিকে ফিরিয়া) হ্যাঁ, তারপর সেই যে বলছিলাম—দু-নম্বর রাস্তা হচ্ছে এই, নেই-নাটকের দেশ থেকে প্লেনে চেপে হ্যাঁ-নাটকের দেশে চলে যাওয়া! মানে—যে দেশের পথে-ঘাটে আমাদের মতো নাটক সব কুড়িয়ে পাওয়া যায়। আর তিন, নাটকের কল যখন পেলামই না, তখন লেবরেটরি থিয়েটারে ঢুকে পড়ে টেস্ট-টিউবে নাটক প্রডিউস্ করা! মানে $3Cu + 8HNO_3 = 3Cu(NO_3)_2 +$ জল না করে জারিয়ে নাটক বার করা। এখন এ তিনটের কোনটাই আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই গতবারের মেলামেশাতেই আমরা আপনাদের বলেছিলাম, এবার বোধহয় আমরা উবে যাবো। এবার আমরা ঠিক করেই এসেছি, এই আমাদের শেষ। এবার আমরা নির্ঘাৎ উবে যাচ্ছি। জ্যান্ত মানুষ উবে যাওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। তাই আমরা নাটক বন্ধ করে রোজ উবে যাওয়া রিহর্সাল দিচ্ছিলাম। এমন সময় গত পরশুদিন আমাদের নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায় মশাই এসে হাজির—হাতে একখানি খাতা। ঘরে ঢুকেই হাত-পা নেড়ে বললেন—উবে যাওয়াই যখন ঠিক করেছেন, তখন শেষ-বেশ এই নাটকটা করেই উবে যান! নাটকে আরম্ভ করেছিলেন, এখন শেষ যদি করতে হয় তো নাটকেই করুন! খাতা খুলে দেখি—নাটকের নাম আর চরিত্রলিপি—এই পর্যন্ত আছে, আসল নাটক-টাই নেই। জিজ্ঞেস করলাম, নাটকটা কই ? বললেন—'নাটকটা লিখতে ভরসা পেলাম না। চরিত্রলিপি পর্যন্ত লিখেছি, এমন সময় জনা-পাঁচেক কর্তা-ব্যক্তি আঙুল উঁচিয়ে তেড়ে এলেন—নাটক তো লিখছেন। নাটক কাকে বলে জানেন কি ? ভয়ে ভয়ে বললাম—নাটক মানে জীবন—মানে—নো! নেভার! নাটক মানুষের আদিম প্রকাশভঙ্গি—শুধু ড্যান্স্। কক্ষনো না! নাটক মাস্ট্ বি প্রগ্রেসিভ্—শুধু শ্লোগান! কে বললে ? নাটক হবে বুদ্ধিদীপ্ত দর্শন—শুধু বিষাদের রেশ! আজ্ঞে না! ওর ফর্মুলা

আছে ! ফর্মুলায় ফেলে, শুধু অঙ্কের মতো কষে যান !
এদের কথা শুনবেন না মশাই, এরা পাগল ! নাটক মানে—বাড়ি, গাড়ি, পার্টি, আর চাঁদের আলোয় লারে লাপ্পা ! তবে হ্যাঁ, —হয় নায়ক কিংবা নায়িকার এক পয়সাও থাকছে না ! শেষে কিন্তু শাঁখ বাজিয়ে বড়লোক করে দিতে হবে ! মানে, সাধারণ লোক দেখবে—এই পেয়েছি এই পেয়েছি বলে হাত বাড়াবে, কিন্তু পাবে না ! পাঁচজনই যাবার সময় শাসিয়ে গেলেন—এর বাইরে নাটক লিখেছেন কি ঘরে আগুন দিয়ে দেবো !
নাট্যকার ভয়ে নীল হয়ে গিয়ে চরিত্র-লিপি পর্যন্ত লিখে খাতাটি আমাদের দিয়ে গেছেন। তাঁর একান্ত অনুরোধ—বাকি জায়গাটায় আমরা যেন আমাদের মনের মতো একটা নাটক বসিয়ে নিই। (পাশে রাখা একখানি খাতা তুলিয়া) এই সেই নাটক, আর নাটকটা আমদের খুব পছন্দও হয়েছে। নাটকটা আমি আপনাদের খুলে দেখাচ্ছি। আর দেখলে আপনাদেরও পছন্দ হবে। (নাটকটিকে দর্শকদের দিকে ফিরাইয়া উপরের মলাট খুলিয়া) নাটকের নাম—নব-স্বয়ংবর। চরিত্রলিপিতে আছেন গোপালবাবু, গোপালবাবুর ভগ্নী শ্রীমতী শীলা দে—যিনি স্বয়ংবরা হবেন, আর বরের দল, যাঁরা গুটি গুটি স্বয়ংবর সভায় এসে হাজির হচ্ছেন। এক—মিস্টার কোকাকোলা, দুই—এক যুবক, ভাবে-ভঙ্গিতে প্রগ্রেসিভ্ জঙ্গী, রোম্যান্টিক্যালি এক্সেনট্রিক্, তিন—এক অধ্যাপক, প্রফেশনালি আঙ্কিক, চার—এক প্রৌঢ়, ইনটেলেক্চুয়ালি দার্শনিক, পাঁচ—এক ধনী, অনুভূতিতে জৈবিক, ছয়—আপনার আমার মতো এক ভদ্রলোক, নরমালি সিনথেটিক্ ! এইবার নাটক। (পাতা উল্টাইয়া) প্রথম পাতা ফাঁকা ! (পাতা উল্টাইয়া) পরের পাতা ফাঁকা ! (ক্রমাগত পাতা উল্টাইয়া যাইতে যাইতে) ফাঁকা—ফাঁকা—ফাঁকা—ফাঁকা……এই নিন (শেষ-পাতায় আসিয়া) যবনিকা পতন—মানে শেষ। নাট্যকারের প্রস্তাব—ফাঁকা জায়গায় নাটকটা যেন আমরা বসিয়ে নিই। উত্তম

প্রস্তাব, চমৎকার কথা! সাদা খাতাটা নিয়ে তাই চলে এলাম—এক্ষুনি, এক্ষুনি মনের মতো নাটকটা ফাঁকটায় বসিয়ে আপনাদের সামনে করে দেবো! (পাশে মুখ ফিরাইয়া হাঁক পাড়িয়া) রমেন···(রমেনের প্রবেশ)

রমেন : কী হলো ?

সম্পাদক : হয়েছে আমার শ্রাদ্ধ! সব কথা বলা হয়ে গেছে। মনের মতো নাটকটা কই ?

রমেন : আরে নাটক তো তোমার পেছনে! সামনে দাঁড়িয়ে বক-বক করছো বলে আমরা কার্টেন তুলতে পারছি না! গোপালবাবুর বৈঠকখানা, গোপালবাবুর বোন হাজির, এক নম্বর বর মিস্টার কোকাকোলা কথাবার্তা কইতে আরম্ভ করে দিয়েছেন—আর এদিকে তোমার বকুনির শেষ নেই! নাও, এখন সরে এসো, আমরা কার্টেন তুলে দিই!

সম্পাদক : ও, তাই নাকি! তা এতক্ষণ বলতে হয়! আচ্ছা, আমরা তাহলে চলি। আপনারা নাটক দেখুন—নাট্যকারের সাদা পাতায় আমাদের বসানো নাটক নব-স্বয়ংবর। [মাতালের প্রবেশ।]

মাতাল : নবস্বয়ং যদি বর হয়—আমাকে তাহলে কনে করে দাও মানিক।

সম্পাদক : ওঃ—আবার সেই মাতালটা এসে জুটলো! এই—যা বলছি এখান থেকে!

মাতাল : (কীর্তনের সুরে) আমি যাবো না, যাবো না যাবো না গো—ব্রজের কৃষ্ণেরে ফেলে আমি যাবো না গো! বলেছি তো গোপাল—কনে করে দাও, এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।

সম্পাদক : তুই যাবি কি না ? (মাতাল ঘাড় নাড়িল!)

রমেন : (সম্পাদককে বাধা দিয়া) দাঁড়াও দাঁড়াও—তুমি পারবে না। আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভাগিয়ে দিচ্ছি। (মাতালকে) দেখ বাবা, কনের তো এখানে দরকার নেই, দরকার বরের। তুমি যদি বর হতে চাও তো গোপালবাবুর বাড়ি চলে যাও—আমরা ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।

মাতাল : কেন ? এই যে শুনলাম নবস্বয়ং নাকি বর হবে ! আমাকে তুমি কনে করে দাও গোপাল—লক্ষ্মী গোপাল আমার, দাও তো !

রমেন : আরে না না—নবস্বয়ং বর হবে না—গোপালবাবুর বোনের নবস্বয়ংবর হবে। সেখানে গিয়ে বর হয়ে বসো।

মাতাল : কিন্তু আমার তো ঘুরপথে যাবার উপায় নেই, মানিক—গা-হাত-পা যে টলছেঁ—

রমেন : তাহলে চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকো। এক্ষুনি পর্দা উঠবে। পর্দা উঠলেই গোপালবাবুর বৈঠকখানা। টুক করে একটু সরে গিয়ে বৈঠকখানায় সামিল হয়ে যেও। (সম্পাদক কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া) আরে থাক, বাড়িও না ! ও যদি বেশি মাতালামো করতে আরম্ভ করে দেয় তো সব পণ্ড হয়ে যাবে ! আর বাপু, সাদা পাতার তো নাটক—ও না হয় একটা বাড়তি চরিত্র হয়ে যাবে। (মাতালকে) কিন্তু দেখো, সাবধান ! যেন কোনো গোলমাল না হয়—তাহলেই মাতাল বলে বার করে দেবে।

মাতাল : গোলমাল ? মাইরি বলছি গোলমাল নয়—একেবারে চুপ ! (নিজের মাথায় চাঁটি মারিয়া) চুপ ! (আবার চাঁটি মারিয়া) চুপ ! চুপ ! একেবারে চুপ ! (নিজের গালে চড়াইতে চড়াইতে) ফের কথা বলে ! চুপ করতে বলছি না ! এই দেখ, আবার কথা বলে। চুপ ! চুপ ! (নিজের মুখের সামনে আঙুল নাড়িয়া চিৎকার করিয়া) তবে রে, স্ট্যাচু ! (বলিয়া একেবারে নিশ্চল দাঁড়াইয়া যায়। এই সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়া গিয়া গোপালবাবুর ঘরের সামনে আসে। সম্পাদক ও রমেন তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া যায়।)

[গোপালবাবুর বৈঠকখানা—গোপালবাবুর ভগ্নী বসিয়া আছেন। সামনে মিস্টার কোকাকোলা নানা কসরত করিয়া নিজের গুণপনার পরিচয় দিতেছেন। গোপালবাবুর ভগ্নী কখনো বা বসিয়া দেখিতেছেন, কখনো বা উঠিয়া জানালার ধারে যাইতেছেন। মুখে চোখে একটা নিস্পৃহ অথচ আমুদে ভাব। যেন, যতটুকু ভালো লাগে ততটুকু দেখি, ভালো না লাগলে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকি।]

কোকাকোলা : আই এম ওয়েল ভার্স্‌ড্‌ ইন ল্যাটিন ম্যাদ্‌মোয়াজেল্‌। র‍্যাডাম্যান্‌থাস্‌ পিরোমাস্‌ প্রোটিসিলাস্‌ প্রোটিয়াস পিয়ান্‌ল্যাক্‌টাম্‌ ডিটেনাম্‌। ও, পছন্দ হচ্ছে না বুঝি? আই নো গ্রীক্‌ টু। (গানের সুরে) অ্যালফা বিটা গামা ডেল্‌টা এপ্‌সিলন্‌ জেটা। ও, নট টু ইয়োর লাইকিং এ্যাঃ? দেন্‌ এটা থিটা আয়োটা কাপ্‌পা ল্যামডা মু—(গোপালবাবুর সহিত এক যুবকের প্রবেশ। পরনে আধময়লা ধুতি ও পাঞ্জাবি। মুখে চোখে একটা জঙ্গী ভাব, রোমান্টিক্যালি এক্‌সেন্‌ট্রিক্‌)

যুবক : সেই কথাই তো আপনার ভগ্নীকে বলতে এলাম। এ ছাদের তলায় জীবন হয় না। জীবন চান তো মাঠে আসুন। ধু ধু করছে মাঠ—ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ—

গোপাল : বুঝেছি, কিন্তু আমি তো আর আপনার সঙ্গে যাবো না। যাবেন আমার ভগ্নী। মানে—স্বয়ংবরা হয়েছেন তিনি। দেখুন, তিনি রাজি আছেন কিনা। আমি বরং আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই—

যুবক : না না, পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। আমি নিজেই নিজের পরিচয়। কমরেড সামন্তর অভিবাদন গ্রহণ করুন মিস দে—আসুন আমরা মাঠে যাই! ইন-কিলাব জিন্দাবাদ—

কোকাকোলা : হিয়ার ইজ গ্রীক্‌ ইন মিউজিক্‌ এগেন মাই ডারলিং। নু জি ওমিক্রন পি রো সিগ্‌মা—হো লা-লা লা লা—

যুবক : চলুন কমরেড, আমরা মাঠে যাই। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর, ধু ধু মাঠ—

কোকোকোলা : টাউ ফি ডি সি ওমেগা—হো লা লা—লা লা।

যুবক : ধু ধু মাঠ—পত্‌ পত্‌ নিশান—

কোকোকোলা : টেক্‌ দিস্‌-রক্‌ ন্‌ রোল্‌—

আমি কোকাকোলা
ও মোনোভোলা
আহা দোলে দোলা
হু-হু-করে-নোলা

যুবক : পত্‌ পত্‌ নিশান! ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা। এধারে বস্তি,

ওধারে নালা—সামনে কারখানা—

কোকোকোলা : রক্ ন্ রোল্—লা মাস্ত্রে-লভ্স্তকি

আমি কোকাকোলা

জি-না-বাস্তে-কু ও মোনোভোলা.........

যুবক : পিপ্ পিপ্—ধোঁয়া উঠছে ! দুনিয়ার মজদুর—খোলা মাঠ। জীবন হাতছানি দিয়ে ডাকছে—ইন-কিলাব জিন্দাবাদ! আমরা এগিয়ে চলি কমরেড—ধরবই—জীবনটাকে ধরবই। গ্রাস্প্ ইট, গ্রাস্প ইট্।

মাতাল : ঐ যাঃ—ফস্কে গেল—

যুবক : (চমকাইয়া) কে ! তুমি কে ?

মাতাল : মাতাল।

যুবক : মাতাল ? তা এখানে কি !

মাতাল : ওঁকে বিয়ে করতে এসেছি। নবস্বয়ং বর থুড়ি কনে হয়েছে, আমি তাই বর সেজেছি।

যুবক : বর সেজেছ ! এই দেখুন কমরেড! জীবনকে ফেস্ করবার সাহস নেই, তাই মদ খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ! দেখতে পাচ্ছেন না, ভয়ে মুখটা ঝুলে পড়ে বেঁকে গেছে !

মাতাল : না, বেঁকে যায়নি। ওটা লক্ জ।

যুবক : লক্ জ ! লক্ জ কি ?

মাতাল : ওঁকে দেখে লক জ হয়ে গেছি। (মেয়েটিকে মৃদু হাসিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে দেখিয়া, এক হাত সোজা বাড়াইয়া দিয়া বরণ করিতে করিতে) না-না—মাইরি বলছি, না—ভালো হবে না—পাগল হয়ে যাবো—বুক কেমন করবে—আর নয়—প্যারালিসিস্ হয়ে যাবো—প্যারালিসিস্—প্যারালিসিস্।

যুবক : (কোকাকোলা গাহিতে গাহিতে, নাচিতে নাচিতে, মেয়েটির সামনে আসিতেছিলেন, তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া, সামনে আসিয়া) ছেড়ে দিন, ওটা একটা মাতাল! দেখছেন না, পালিয়ে বেড়াচ্ছে ! আসুন আমরা এগিয়ে যাই কমরেড—ফরওয়ার্ড মার্চ ! ইন্-কিলাব

জিন্দাবাদ ! গ্রাস্প্ ইট্ ! গ্রাস্প ইট ! একটা থাপ্পোড় মেরে জীবনটাকে ধরে ফেলি কমরেড ! (ইতিমধ্যে এক প্রৌঢ় বুদ্ধিজীবী গোপালবাবুর সঙ্গে ঘরে ঢুকিতেছিলেন)

প্রৌঢ় : আর জীবন যদি তোমাকে একটা থাপ্পোড় দিয়ে—হুঁ—(মেয়েটিকে) ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন ! দেখছেন না, কতো অল্প বয়স ! কিই বা দেখেছে, আর কিই বা শুনেছে ? জীবনের বোঝেই বা কি বলুন ? জানে কি-যে, জীবনটা সাম্‌টোটাল্ অব কোটেশন্‌স্—ইয়াকি করলে বানান ভুল হতে পারে ? জানে না। (কোকাকোলা নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে সামনে আসিয়া পড়িয়াছিলেন) এই দেখুন ! যা দেখছেন শুধু বাইরেই ! ভেতরে কিচ্ছু নেই—একেবারে ফাঁকা ! জীবন নেই, শুধু তার একো আছে—জীবনের খাঁজে খাঁজে রাম, শুধু আম, আম হয়ে বেরিয়ে আসছে ! এদের সে বোধ নেই মিস্, সে ব্যথা নেই, সে পরিধি নেই। আমার কিন্তু আছে মিস্। আমি দেখেছি দিনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাড়ে তেইশ ঘণ্টা শুধু মূঢ় অপব্যয়, শুধু খুচরো কাজ —প্রাউড, সেল্‌ফিস্, স্টুপিড সমস্ত কাজ ! তাই তো আপনাকে নিতে এলাম ! এদের সঙ্গে গেলে রোজ মোটে আধঘণ্টা বাঁচবেন। আর আমার সঙ্গে ? চব্বিশ ঘণ্টা শুধু বেঁচে থাকা ! ব্রাইট্, বিউটিফুল, ইন্‌টেলিজেণ্ট, ইডিওসির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া !

যুবক : বিশ্বাস করবেন না মিস দে ! উনি জোচ্চোর ! নিজেকে ঠকাচ্ছেন ! উনি নৈরাশ্যবাদী ! তাই সাড়ে তেইশ ঘণ্টা ওঁর কাছে মূঢ় অপব্যয় ! আপনি সঙ্গে চলে আসুন মিস্—আমরা ফাঁকা মাঠে চলে যাই। সেখানে দুনিয়ার মজদুর আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে !

কোকোকোলা : (নচিতে নাচিতে) ও, ফোক্ ? ইউ ওয়াণ্ট্ ফোক্ ? হিয়ার ইজ ফোক্—পিওর ইণ্ডিয়ান্ ! (গাহিতে আরম্ভ করিলেন)

হামারা শ্বশুরিয়া, পিয়ারা জিলেবিয়া

হুকালা—হো লা লা

হুকালা পারা লালিয়া

রামা হো—হো লা লা—

প্রৌঢ় : মিথ্যে ! বুঝতে পারছেন মিস্—একেবারে ফাঁকা ! এ দুটোই এক্‌সেন্‌ট্রিক ! একটা হাওয়াইয়ান, আর একটা রোমান্টিক্ ! বোঝে না যে, ঐ ইন-কিলাব জিন্দাবাদ, ঐ আওয়ারা মার্কা হাওয়াই সার্ট, সব ফুস হয়ে উড়ে যাবে ! থাকবে শুধু নেড়া, বোঁচা, ট্যারা, টেকো একটা জীবন !

যুবক : শুনবেন না মিস্ দে—ওঁর কথায় কান দেবেন না ! পিসিমিস্টিক্ ফিলসফি, এ বুর্জোয়া রিঅ্যাক্‌সনারি ! আসুন আমরা ঝাণ্ডা হাতে করে বেরিয়ে পড়ি ! দুনিয়ার মজদুর এক হয়ে যাক—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ !

প্রৌঢ় : এই এতটুকু—নিজের চারপাশে ছোট্ট একটা গোল ! দুঃখবোধ নেই, তাই পরিধিও বড়ো নয় ! থট্ এক্‌স্‌প্যাণ্ড্‌স্, সরো এক্‌স্‌প্যাণ্ডস্। টু থিঙ্ক ইজ টু বি স্যাড ! আমি ভাবি, তাই দুঃখ পাই, অ্যাণ্ড সরো এক্‌স্‌প্যাণ্ডস্ দি সার্‌ক্‌ল্।

যুবক : বাজে কথা ! উনি আপনাকে ধাপ্পা দিচ্ছেন মিস্ দে ! ওঁর পায়ের তলায় মাটি নেই !

প্রৌঢ় : কারো পায়ের তলায় মাটি মেই মিস্ দে ! ম্যানকাইণ্ড ইজ লিভিং অন্ এ লিনিং টাওয়ার। মানুষের পাস্ট নেই, প্রেজেন্ট নেই, ফিউচার নেই ! শুধু দেয়ার ইজ এ সার্‌ক্‌ল অ্যাণ্ড এ সার্‌কাম্‌ফারেন্স ! শুধু পরিধিটা আছে। আমার পাশে আপনি এসে দাঁড়ান মিস্ দে, দেখবেন সে পরিধি কতো বড়ো—তার কোনো মাপ নেই ! (গোপালবাবুর সঙ্গে গণিতের অধ্যাপক প্রবেশ করিলেন।)

অধ্যাপক : মাপ নেই ? কে—কে বলে মাপ নেই ? পরিধির মাপ পাই আর স্কোঅ্যার ! আপনার পরিধি ? সে তো মুখে মুখে বলে দেওয়া যায়। আপনার রেডিয়াস্ কতো ?

প্রৌঢ় : আমার কী ?

অধ্যাপক : রেডিয়াস্—রেডিয়াস্ ? মানে নাভি থেকে পায়ের টো পর্যন্ত ? ম্যাক্সিমাম্ তিন ফিট্ হোক ! তাহলে টোয়াইস্ পাই আর $= 2 \times \frac{22}{7} \times 3 = \frac{132}{7}$ ফিট্ ! ওর চেয়ে আমার পরিধি বড়ো । আমার রেডিয়াস অন্তত $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি বেশি হবে ।

প্রৌঢ় : মূর্খ ! জীবনটা কি অঙ্কের খাতা, যে খস খস করে কষে গেলাম, আর উত্তর মিলে গেল !

অধ্যাপক : জীবনের প্রত্যেকটা উত্তর আমার হাতে করে মেলানো । তাই তো আপানাকে বলতে এলাম মিস্ দে—লাইফ ইজ পিওর ম্যাথমেটিকস্ । শুধু পিওর ম্যাথমেটিক্স কেন ? ইট পারটিকুলার সেক্শন অব ম্যাথমেটিক্স্—মানে অ্যালজেব্রা ! সব ছকে বাঁধা, সব ফর্মুলায় ফেলা ! খালি একটা ফর্মুলা মিস্ দে—এ প্লাস বি হোল্স্কোঅ্যার্টা আমি মেলাতে পারিনি । এ স্কোঅ্যার প্লাস্ বি স্কোঅ্যার আমি আমার জীবন থেকেই পেয়েছি, এখন দরকার খালি প্লাস্ টোয়াইস এবি-টার ! আপনি আমার পাশে এসে দাঁড়ান মিস্ দে, আমি প্লাস্ টোয়াইস্ এ বি দিয়ে ফর্মুলাটা মিলিয়ে দিই ।

যুবক : না মিস্ দে, না ! জীবনটাকে উনি ছকে বেঁধে ফেলেছেন ! মানুষ কি শুধুই সংখ্যা মিস্ দে, অ্যালজেব্রিক্যাল কোয়ানটিটি ? মানুষ মানুষ ! জীবনের তার কতো দিক ! গণ-জীবন, সমাজ-জীবন, রাষ্ট্র জীবন ! তার কতো অ্যাঙ্গল্ পপুলেশন্, অ্যাঙ্গল্, পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গল্, ইকনমিক অ্যাঙ্গল্ ! চলুন আমরা বেরিয়ে পড়ি মিস্ দে !

প্রৌঢ় : উঃ ! বেরিয়ে পড়ুন মিস্ দে ! জীবনের গোলকধাঁধার রাস্তা চেনো তুমি ?

মাতাল : (গম্ভীরভাবে) দরকার নেই । আমার পকেটে স্ট্রীট গাইড আছে । দাম ছ-আনা । এক বোতল পাকি খাওয়াও—এমনি দিয়ে দেবো মানিক ।

অধ্যাপক : না না—স্ট্রীট গাইডে কি হবে ? পাশাপাশি রাস্তা চললে প্যারালাল স্ট্রেট্ লাইনে চলতে হয়—সে জ্ঞান তোমার আছে ?

প্যারালাল স্ট্রেট লাইন কাকে বলে তা তুমি জানো ? শেষ পর্যন্ত তারা ইন্‌ফিনিটিতে মিট্ করে ? ইন্‌ফিনিটি কি, কতদূর, কি তার ক্যালকুলেশন্—বলতে পারো ? রাস্তা চলবে ? রাস্তা অমনি চললেই হলো !

কোকাকোলা : (বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করিতে করিতে) পাসারা পাপারাসা পাপারাসালা—হোলালা—নাউ উইথ্ এ ক্ল্যাসিকাল টুরিস্ট্— ইয়েঁা দর্দ ভরি—

যুবক : আপনি এখনো দাঁড়িয়ে রইলেন মিস্ দে ! বাইরের জীবন যে হাতছানি দিয়ে ডাকছে ! চলুন আমরা সেখানে চলে যাই— যেখানে কুলিরা মোট বয়, চাষীরা চাষ করে—যেখানে কড়া রোদ্দুরে মেয়েরা ছাদ পেটায় ! (গোপালবাবুর সঙ্গে স্থানীয় বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী বি আর সেনের প্রবেশ)

সেন : (যুবকের পাশ দিয়া যাইবার সময়) তারপর টি বি হলে ট্রিটমেণ্টের খরচা, আঙুর-বেদানা-আপেলের খরচা—সব জোগাতে পারবে তো ? (অধ্যাপক ও প্রৌঢ়ের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মেয়েটির নিকটে আসিয়া) এতক্ষণ এই সব বাজে ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে, খুব বিরক্ত বোধ করছেন তো ? যাকগে, আর ভাবনা নেই— আমি তো এসেই পড়েছি ! (মেয়েটি কিছু বলিবে আশা করিয়া) মানে—আমাকে চিনতে পারছেন তো ? আপনাদের প্রায় নেক্স্ট-ডোর নেবার বললেই হয়। বি আর সেন—মানে ব্রজরঞ্জন সেন। আপনার দাদা আমাকে খুব ভালো করেই চেনেন। ব্যারাকপুর পেপার অ্যাণ্ড পাল্প, শ্যামনগর হোসিয়ারী—এসব আমাদেরই— মানে আমারই ! এ ছাড়া শেয়ারমার্কেট, ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশন্, উল্টোডাঙার টাব্স, অ্যাণ্ড টাব্স, মানে বালতির কারখানা, এসব তো আছেই। (তখনও মেয়েটিকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া) ওঃ দেখেছেন—কী ভুল ! আসবার পথে পাশের জুয়েলারি দোকানের শো-কেশে এটা দেখে পছন্দ হয়ে গেল—নিয়ে এলাম আপনার জন্যে। পছন্দ কিন্তু ভুল হয়নি। ভারী চমৎকার মানাবে আপনার

হাতে! আস্থন, আমরা তাহলে যাই, আবার ওদিকে দেরি হয়ে যাবে! না না—আপনি কিছু ভাববেন না। সব ব্যবস্থা করে তবে আমি এসেছি। সেই জন্যেই তো নতুন মডেলের কিংসওয়েটা নিয়ে এলাম। আপনার যদি কিছু নিয়ে যাবার থাকে তো আমি আর্দালিটাকে বলে দিচ্ছি—ও গাড়িতে তুলে দেবে। হ্যাঁ, ভালো কথা—এ গাড়িটা আপনিই ব্যবহার করবেন, আমার আরও দু'খানা আছে।

কোকাকোলা: (নাচিতে নাচিতে) লেট্ মি ট্রিট্ ইউ টু অ্যান ইণ্ডিয়ান্ ড্যান্স্ প্রোগ্রাম, অফ্ কোর্স উইথ্ অ্যান হাওয়ইয়ান মিক্স্চার——ধা—ধা—ধেকেটে—ধা— তেরে— কেটে—ধা— হো—লা—লা—

সেন: আপনার মনে নি কোনো দ্বিধা আছে মিস্ দে, কোনো সঙ্কোচ?

যুবক: ও ভুল করবেন না মিস্ দে। আপনি তার চেয়ে বরং এই অধ্যাপক, কি এই বুদ্ধিজীবীকে বিয়ে করুন। বাট্ নট্ দিস্ ম্যান! হি ইজ এ ড্যামড্ ক্যাপিটালিস্ট! এরা প্রগতিকে বন্ধক রেখে কাজ করতে চায়! ডাউন্ উইথ ক্যাপিটালিজম্—ডাউন্—ডাউন্—

অধ্যাপক: মিস্ দে, আপনি আমার সঙ্গে আস্থন! আমি টোয়াইস এ বি-টা যোগ করে নিয়ে ফর্মুলাটাকে মিলিয়ে নিই।

প্রৌঢ়: ভুল করবেন না মিস্ দে—জীবন ফর্মুলাও নয়, বন্ধকী গহনাও নয়। লাইফ্ ইজ এ স্যাড্ থট্। আপনি আমার চিন্তার পরিধির মধ্যে ঢুকে পড়ুন মিস্ দে, সেখানে নিশ্চিন্তে খেলে বেড়ান।

সেন: বাজে সময় নষ্ট করে লাভ কি মিস্ দে—চলুন আমরা যাই। আপনি তো নিজেই বোঝেন, এসব ফাঁকা কথায় জীবন হয় না। লাইফ্'স্ ওয়ে ইজ্ এ কিং'স ওয়ে, অ্যাণ্ড মানি রুল্স্ দেয়ার!

কোকাকোলা: অ্যাণ্ড ড্যান্সিং আই ট্রেড্ অন ইট্। টেক্ দিস্—আল্ফা বিটা গামা জেটা—ধা ধা—ধেরে—কেটে—ধা—

প্রৌঢ়: ভুল, ভুল—সব ভুল। লাইফ্ ইজ্ এ সাম্টোটাল্ অব্ কোটে-শন্স্। মিস্ আপনি আমার সঙ্গে আস্থন, একটাও বানান ভুল

হবে না।

অধ্যাপক : মিথ্যে! জীবনটা একটা ফর্মুলা। আপনি আমার সঙ্গে আসুন মিস্ দে, আমরা স্মুদ্‌লি চলে যাই।

সেন : জীবনের পথে চলতে হয় মিস্ দে—অ্যাণ্ড্ দ্যাট্ ওয়াক্ মাস্ট বি এ ফাইন ওয়াক্! আমার প্রচুর টাকা। আমি আপনার পথ কার্পেট দিয়ে মুড়ে দেবো মিস্—গায়ে পায়ে আঁচড়টি লাগবে না।

কোকাকোলা : অল্ বোগাস্! লাইফ ইজ্ এ ড্যান্স্—ধেকেটে—ধেকেটে—ধা—

মাতাল : (অগ্রসর হইয়া আসিতে আসিতে) সব ভুল গোপালের দল, সব ভুল। জীবনটা একটা পাকি মালের বোতল। সেই বোতল আমি তিন-তিনটে খেয়ে হজম করতে পারি মিস্! জীবনে চলতে হয় না মিস্, শুধু টলতে হয়। আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমরা টলতে টলতে বেরিয়ে যাই—(এমন সময় গোপালবাবুর সঙ্গে আর এক ভদ্রলোকের প্রবেশ। বয়স পঁয়ত্রিশের মধ্যে, চোখে চশমা, গায়ে হ্যাণ্ডলুম-এর কাপড়ের পাঞ্জাবি, পরনে সাধারণ ধুতি, পায়ে স্যাণ্ডাল। খুব একটা ফিট-ফাট কিছু না হইলেও, তেমন কিছু খারাপও নয়।)

ভদ্রলোক : একটু আগেই আসবো ভেবেছিলাম। কিন্তু একা মানুষ তো—সব গুছিয়ে আসতে করতে একটু দেরিই হয়ে গেল।

গোপাল : না-না, তাতে কি হয়েছে—আমি তো কাগজে এগারটা অবধি সময় দিয়ে রেখেছিলাম। আসুন—আমার ভগ্নীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

ভদ্রলোক : চলুন, কিন্তু এঁরা—

গোপাল : এঁরা সব আপনারই মতো আর কি—

ভদ্রলোক : ও—নমস্কার—

গোপাল : (মেয়েটির নিকট আসিয়া) ইনি আমার ভগ্নী শ্রীমতী শীলা দে, আর ইনি শ্রী অসীম রায়। (ময়েটি নৃত্যরত কোকাকোলার দিকে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। দাদার কথায় চটকা

ভাঙিয়া এদিকে মুখ ফিরাইতেই দেখে এক ভদ্রলোক সলজ্জভাবে মৃদু হাসিতে হাসিতে তাহাকে নমস্কার করিতেছে। সেও মৃদু হাসিয়া বেশ সপ্রতিভভাবে প্রতিনমস্কার করিল।)

ভদ্রলোক : না—মানে—তেমন কোনো পরিচয় আমার নেই। সাধারণ ভদ্রলোক, আমার শিক্ষা-দীক্ষাও সাধারণ। মার্চেন্ট অফিসে একটা চাকরি করি, সবসুদ্ধ মিলিয়ে মাসে দুশো কুড়ি টাকা। আর পেলে ছাত্র পড়াই, এখন দুটো আছে। একাই ছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি বড়ো একা মনে হতে লাগলো। তাই ঠিক করলাম, আপনাদের, মানে মেয়েদের যদি কেউ রাজী হন, তাহলে একটা বিয়েই করি। সেই উদ্দেশ্যেই এখানে আসা, অবশ্য আপনার পছন্দ হলে। তবে ও কথাটাও আমি ভেবে দেখেছি যে, আপনিও আমাকে চেনেন না, আমিও আপনাকে চিনি না। তারপর মনে হলো, জন্তু-জানোয়ার তো আর নই— মানুষ। থাকতে থাকতে ঠিকই একসঙ্গে মিলে-মিশে যাবো।

শীলা : কিন্তু ধরুন যদি না মেলে ?

অধ্যাপক : মিলবে।—কি করে মিলবে ? অঙ্ক মেলানোর অভ্যাস থাকা চাই !

প্রৌঢ় : যতো সব বাজে কথা ! অঙ্ক মিললেও কি জীবন মেলে ? আপনাকে আমি বলছি তো মিস্—লাইফ্ ইজ এ স্যাড্ থট্ ! এ সারক্‌ল্ অ্যাণ্ড এ সারকাম্‌ফারেন্স্ ! আপনি একটু কাছে সরে আসুন মিস, আমি ভাবের ল্যাসো মেরে আপনাকে আমার সঙ্গে মিলিয়ে নিই !

যুবক : না মিস্ দে, না—এরা আপনাকে পেছনে টানছে ! জীবন মানে শুধু এগিয়ে যাওয়া—চলুন আমরা এগিয়ে যাই কমরেড—চাবো না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন—

সেন : (যুবকের মুখের সামনে একটা আঙুল তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে বাধা দিয়া মেয়েটিকে) ছোট্ট একটা কথা মিস্ দে—টাকা ! দেখবেন কোথাও অমিল নেই। আসুন—মাই কিংস্‌ওয়ে ইজ্

ওয়েটিং ফর্ ইউ!

মাতাল : স্রেফ এক বোতল পাকি মাল মিস্! সব মিলে গোল হয়ে যাবে!

কোকাকোলা : লেট্ আস্ ড্যান্স, উই উইল বি ওয়ান্-ধা-ধা-ধেকেটে ধা—

ভদ্রলোক : দেখুন, এঁদের কথা শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল। বলবো?

শীলা : নিশ্চয়! এঁরা যখন বলছেন, তখন আপনিই বা বলবেন না কেন!

ভদ্রলোক : একবার এক অন্ধ একটা হাতীকে গায়ে হাত দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছিল। ল্যাজে হাত দিয়ে বললে হাতী দড়ির মতো—শুঁড়ে হাত দিয়ে বললে সাপের মতো—পায়ে হাত দিয়ে বললে থামের মতো, আর কানে হাত দিয়ে বললে—না না, বুঝেছি—হাতী কুলার মতো! তাই দড়ি হলো, সাপ হলো, থাম হলো, কুলো হলো, কিন্তু হাতী হলো না। তাই ইনি টাকা হয়েছেন, উনি ফর্মুলা হয়েছেন, ইনি ভাবছেন, আর উনি শুধুই এগিয়ে যাচ্ছেন! আর এই ত্বজনের একজন নাচছেন, আর একজন নেশা করে উল্টো পথে হাঁটছেন! সব হলো, কিন্তু জীবন হলো না। এঁরা অ্যানালিসিস করে জীবনকে টুকরো টুকরো করে ভেঙেছেন! কিন্তু স্বাভাবিক জীবন তো অ্যানালিসিস নয় মিস্ দে, সেটা সিন্‌থেসিস্। এঁরা ভাঙা টুকরো নিয়ে আছেন—তাই আপনাকে না পেলেও এঁদের চলবে। কিন্তু আমি জীবনভোর সিন্‌থেসিস্ করবার চেষ্টা করে এসেছি, তাই আমায় আপনাকে পেতেই হবে, আপনারও আমাকে চাই! নইলে আমাদের সিনথেসিস্ পুরো হবে না মিস্ দে—উই উইল নেভার বি নরম্যালি সিন্‌থেটিক্।

শীলা : বিয়ে আমাদের রেজিষ্ট্রী করেই হবে তো?

ভদ্রলোক : আমার তো সেই ইচ্ছেই আছে—তবে আপনার যদি—

শীলা : না না—আমার কোনো আপত্তি নেই—

ভদ্রলোক : (ঘরের সকলের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া) আচ্ছা নমস্কার, আমরা তাহলে চলি, কেমন—(গোপালবাবুকে) আসছেন তো আপনি ?

গোপাল : আপনারা এগোন, আমি যাচ্ছি—(ভদ্রলোক ও শীলার প্রস্থান।)

সেন : এ পেয়ার্ অব্ ফুল্স্ ! (গহনার বাক্সটা তুলিয়া লইয়া গট্ গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।)

প্রৌঢ় : যাচ্ছ যাও—কিন্তু আবার ফিরে আসতে হবে ! লাইফ্ ইজ্ এ স্যাড্ থট্—হ্বাট্ কাম্স্ ব্যাক্ এগেন্। (প্রস্থান।)

অধ্যাপক : (এতক্ষণ যেন খানিকটা হতভম্বের ন্যায় হইয়া গিয়াছিলেন) মিস্ দে চলে গেলেন ! কিন্তু আমার টোয়াইস্ এ-বি-টা, মিস্ দে ! (ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে) আমার লাইফের ফর্মুলাটা মিলবে না মিস্ দে—আপনি ফিরে আসুন—(বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেলেন।)

যুবক : (গোপালবাবুকে) আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছেন কি ? আমি মুশড়ে পড়িনি ! আমার পেছন দিক নেই, শুধু সামনে ! তোমরা এগোও কম্রেডস্ আমি যাচ্ছি—ইন-কিলাব জিন্দাবাদ—(বলিতে বলিতে প্রস্থান।)

মাতাল : কিন্তু আমি এখন যাই কি করে ? আমার যে নেশা কেটে যাচ্ছে ! (গাপালবাবুর নিকটে আসিয়া) দুটো টাকা দাও না মানিক—একটু নেশা করি—নইলে যে সোজা হয়ে চলতে পারবো না গোপাল ! (গোপালবাবু টাকা দিলে) জিতা রহো মানিক—জিতা রহো—(চলিয়া যাইতে যাইতে) তোমার জন্ম জন্ম স্বয়ংবর হোক বাবা—জন্ম জন্ম আমি পাকি খাই—(প্রস্থান।)

কোকাকোলা : ফার্স্ট টু কাম্ বাট লাস্ট টু গো ! বাট্ আই উইল্ ডান্স দেম্ আউট—ধা—ধা ধেকেটে—ধা—(নাচিতে নাচিতে প্রস্থান।)

আজকের উত্তর

॥ চরিত্র-লিপি ॥

—অতীতের—	—বর্তমানের—
চার্বাক	ফণিভূষণ
দধীচি	
নচিকেতা	বৈদ্যনাথ
ঘৃতসেন	
অধমদাস	ঝুনঝুনদাস

[মঞ্চ প্রায় অন্ধকার। নেপথ্য থেকে শোনা যায় ভাব গম্ভীর কণ্ঠস্বর। বোধহয় ইতিহাসের কণ্ঠস্বর।—"প্রাচীন ভারত। উপনিষদের যুগ। সে যুগে নচিকেতা এসেছিলেন তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশ্ন নিয়ে যমের কাছে। যম দিয়েছিলেন উত্তর। সে উত্তর ছিলো যুগধারণার দ্বারা সীমাবদ্ধ। পুরাণে এসেছিলেন দধীচি। তাঁরও প্রশ্ন ছিলো—সুরাসুরের দ্বন্দ্বে অসুর নিধনেই বোধ হয় মানবকল্যাণ। সে যুগের সীমাবদ্ধ জ্ঞান অভিজাত সুরের অত্যাচার তাঁকে কল্পনা করতে দেয়নি। লোকায়ত দর্শনে এসেছিলেন চার্বাকের দল। প্রশ্ন ছিলো শেষে কি? সত্যকে পরম বলে তাঁরা গ্রহণ করেন নি। ক্ষুরস্য ধারায় চলতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'এ। ভেবেছিলেন এই বুঝি শেষ। কিন্তু নচিকেতার যমের কাছ থেকে লব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান, দধীচির অস্থিতে নির্মিত বজ্র, চার্বাকের ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ মহাকালের যাত্রাপথে পুর্ণচ্ছেদ টানতে পারেনি। চরৈবেতির মন্ত্রে চালিত হয়ে মহাকাল এসে পৌঁছেছেন বর্তমানের এই মুহূর্তে। যবনিকা অপসারিত হয়ে আলো এসে পড়েছে আজকের যুগের ফণিভূষণের উপর। নচিকেতার পূর্ণচ্ছেদ, দধীচির সমাধান, চার্বাকের শেষ আশ্রয়, তার মনে জিজ্ঞাসার বক্রচিহ্নে পরিণত হয়েছে মঞ্চে ক্রমশ আলোর আভাস দেখা যায়। অন্ধকার ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। মহাকালের কাছে তার দাবী—সত্যকে পরিবর্তনশীল, গতিশীল বলে স্বীকার করে নাও—হে বর্তমান, তুমি উত্তর দাও—বর্তমানের উত্তর—আজকের উত্তর।" ···ততক্ষণে মঞ্চ সম্পুর্ণরূপে আলোকিত। অপরাহ্নের আলো—আর সে আলোয় কি যেন এক স্বপ্নাবেশ। সামনে দেখা যায় পার্কের একাংশ। লম্বা একটি বেঞ্চ। বেঞ্চের উপর বসিয়া বাইশ তেইশ বছর বয়সের এক যুবক চীনাবাদাম খাইতেছে। আর একজন যুবকের প্রবেশ। বয়সে প্রথম যুবকের সমবয়সীই হইবে। পোশাক-পরিচ্ছদে বেশ একটু সৌখিন। যুবকটি প্রথম যুবকের সামনে আসিয়াছে,

এমন সময় দ্বিতীয় যুবকটির পা কলার খোসার উপর পড়িয়া যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে আছাড়। প্রথম যুবকটি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে]

দ্বিতীয় যুবক : (উঠিয়া, প্রথম যুবককে) হাসলেন কেন ?

প্রথম যুবক : (মুখে তখনও হাসির রেশ লাগিয়া আছে) আপনি পড়ে গেলেন বলে।

দ্বিতীয় যুবক : আমি পড়ে গেলাম বলে আপনি হাসলেন ? আপনার লজ্জা হওয়া উচিত।

প্রথম যুবক : মোটেই নয়। বরং আমার যা করা উচিত, তাই আমি করেছি। হো হো করে হাসা উচিত, ঠিক হো হো করেই হেসেছি।

দ্বিতীয় যুবক : ও ! আর আমি যে পড়ে গেলাম, আমার যে লাগলো, সেটা বুঝি কিছু নয় ?

প্রথম যুবক : বাঃ সেটাই তো সব ! সেই জন্যেই তো হাসলাম।

দ্বিতীয় যুবক : (মনে হইল যেন মনের মতো উত্তর পাইয়া গিয়াছে) ও, তাই বলুন ! ঐ জন্যে হেসেছেন। (ধুলা ঝাড়িয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়া গেল।)

[অধমদাসের প্রবেশ। বেশ অতি সাধারণ। পরিধানে আধময়লা ফতুয়া ও খাটো ধুতি। হাতে একখানি ছেঁড়া ময়লা গমছা। সেটি দিয়ে মাঝে মাঝে হাওয়া খায়, মাঝে মাঝে ঘাম মোছে। বয়স চল্লিশের উপর।]

অধমদাস : (প্রথম যুবকের কাছে আসিয়া) হ্যাঁ কর্তা, আমাদের মুনিবরকে এই পথে যেতে দেখেছেন ?

প্রথম যুবক : কাকে ?

অধমদাস : আমাদের মুনিবর—মানে শ্যালক-প্রবরকে ?

প্রথম যুবক : না তো—

অধমদাস : দেখেন নি ! তবে যে দধীচি বললেন, তিনি এদিকেই এসেছেন ?

প্রথম যুবক . ও হ্যাঁ হ্যাঁ—এইমাত্র এক ভদ্রলোক এদিকে গেলেন

বটে। তা তিনি কি আপনার শালা?

অধমদাস : কি রকম দেখতে বলুন তো?

প্রথম যুবক : বেশ বাবু বাবু চেহারা—গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি—

অধমদাস : বাস—আর বলতে হবে না। লোকটা মশাই চিরকালের বাবু! যখন গেরুয়া পরতো, তখনও দেখেছি—সে গেরুয়ার জেল্লাই অন্যরকম—হাত পড়লে, হাত পিছলে যেতো।

প্রথম যুবক : ও, ভদ্রলোক সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন বুঝি!

অধমদাস : আরে সন্নিসী তো সে চিরকালের! তবে সে বলে সে বাঁচার সন্নিসী, মরার নয়—তাই নিয়েই তো ঝগড়া!

প্রথম যুবক : ঝগড়া! কার সঙ্গে? আপনার স্ত্রীর সঙ্গে বুঝি?

অধমদাস : আমার কি?

প্রথম যুবক : আপনার স্ত্রী—মনে তাঁর বোন?

অধমদাস : কিন্তু আমার তো স্ত্রী নেই—মানে তাঁরও তো বোন নেই!

প্রথম যুবক : তবে আপনি যে বললেন, তিনি আপনার শ্যালক?

অধমদাস : আজ্ঞে হ্যাঁ—শুধু আমার শ্যালক কেন, তিনি তো আপনারও শ্যালক।—মানে আমার কর্তা ঘৃতসেন বলেন, মুনিবর নাকি সার্বজনীন শ্যালক?

প্রথম যুবক : সার্বজনীন শ্যালক?

অধমদাস : আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার কর্তা ঘৃতসেন বলেন—শ্যালক ছয় প্রকারের—স্ত্রীর ভ্রাতা হচ্ছেন সাধারণ শ্যালক, আর বাকী পাঁচজন হচ্ছেন শ্যালকপ্রবর—মানে শ্যালকশ্রেষ্ঠ।

প্রথম যুবক : যেমন?

অধমদাস : যেমন ধরুন, রাজা এক শ্যালক, আর তাঁর সঙ্গে রাজনীতি যাঁরা করেন তাঁরা আর এক শ্যালক। পাওনাদার এক শ্যালক, আর তার সঙ্গে দেনদার আর এক শ্যালক। আর শেষ শ্যালক হচ্ছেন আপনি, মানে যাঁরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন।

প্রথম যুবক : তা এর মধ্যে আপনার মুনিবর কোন্‌টি ?

অধমদাস : আজ্ঞে উনি দেনদার—মানে কর্তার কাছ থেকে ধার করে ঘি খেয়েছিলেন।

প্রথম যুবক : ও, আপনার কর্তার বুঝি ঘিয়ের দোকান ?

অধমদাস : আজ্ঞে হ্যাঁ—তিনি তো চিরকালের ঘিওয়ালা।

প্রথম যুবক : আর আপনি ?

অধমদাস : আমি তাঁর পাওনা আদায় করে বেড়াই।

প্রথম যুবক : তাহলে তো আপনিও এক শ্যালক। আপনারও তো একটা পাওনা হয়।

অধমদাস : আজ্ঞে, না। কর্তা বলেন, আমার পাবার কোনো অধিকার নেই। তাঁর কর্মফলে তিনি সব কিছু পেয়ে থাকেন, আর আমার কর্মফলে আমাকে যা দেওয়া হয়, তাই নিতে হয়।

প্রথম যুবক : ও, তাই বলেন বুঝি ?

অধমদাস : আজ্ঞে শুধু উনি কেন ? শাস্ত্রেও তো তাই বলে।

প্রথম যুবক : আজ্ঞে না, শাস্ত্রে বলে না। শাস্ত্রকে দিয়ে বলানো হয়।

অধমদাস : শাস্ত্রকে দিয়ে বলানো হয় ?

প্রথম যুবক : আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার ঘৃতসেন বাকী দু'রকম শ্যালকের কথা উল্লেখ করতে বোধ হয় ভুলে গেছেন। কর্মফলের যুক্তি যারা দেয় তারা এক শ্যালক, আর সে যুক্তিকে যারা নিজের সুবিধে মতো কাজে লাগায় তারা এক শ্যালক।

অধমদাস : দধীচিও কিন্তু সেই কথাই বললেন। বললেন, তুমিও এক শ্যালক অধমদাস, তোমারও একটা পাওনা আছে।

প্রথম যুবক : আমিও আপনাকে তাই বলি অধমদাস। আগে নিজের পাওনাটা আদায় করে নিন্‌ তারপর পরের পাওনাটার জন্যে তাগাদা দেবেন।

অধমদাস : তাহলে মুনিবরের পেছনে না গিয়ে ঘৃতসেনের পেছনেই যাই—কি বলেন ?

প্রথম যুবক : নিশ্চয়—সে কথা আর বলতে।

অধমদাস : (যে পথে আসিয়াছিল সেই পথেই ফিরিয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল। হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া সংশয়পূর্ণ স্বরে) তাহলে ঠিক বলছেন তো ? মানে—আমি সত্যিই শালা বটে—কি বলেন ?

প্রথম যুবক : আপনার বুঝি শালা হবার ভয়ানক শখ ?

অধমদাস : না—মানে ঘৃতসেন বলেন, শালা না হলে জাতে ওঠে না। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

প্রথম যুবক : আপনি নির্ভয়ে এগিয়ে যান অধমদাস। আপনি ঘৃতসেনের পাওনাদার, সে হিসেবে আপনি তার প্রত্যক্ষ শ্যালক।

অধমদাস : (যেন তখনও বিশ্বাস করিতে পারে নাই) সত্যি বলছেন ? (প্রথম যুবককে মাথা নাড়িয়া হ্যাঁ বলিতে দেখিয়া উল্লসিত কণ্ঠস্বরে) তাহলে চলি কর্তা। বেলাবেলি বেরিয়ে না পড়লে ঘৃতসেনকে ধরা বড়ো কঠিন। কোথায় কোন্ বাজারে ঘি বেচছে তার ঠিক কি ? আচ্ছা কর্তা—চলি তাহলে—(নত হইয়া নমস্কার করিয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথেই ফিরিয়া গেল। অধমদাস চলিয়া গেলে প্রথম যুবক পুনরায় স্বস্থানে বসিয়া চীনাবাদাম চিবাইতে আরম্ভ করে। এমন সময় ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত অবস্থায় দ্বিতীয় যুবকের প্রবেশ)

দ্বিতীয় যুবক : (প্রথম যুবকের নিকট আসিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে) দেখুন—তখন আপনি বললেন, আমার লাগলো বলে আপনি হাসলেন—

প্রথম যুবক : আজ্ঞে হ্যাঁ—সেই জন্যেই তো হাসলাম।

দ্বিতীয় যুবক : (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) ও—তাই হাসলেন ! আমি পড়ে গেলাম, আর উনি হেসে দিলেন ! অসভ্য অভদ্র কোথাকার ! (বলিয়া প্রথম যুবককে এক চড় মারি। প্রথম যুবকও উঠিয়া প্রত্যুত্তরে বেশ জোর একটি চড় কষাইয়া দেয়।)

দ্বিতীয় যুবক : (বেশ কাঁদ কাঁদ স্বুরে, গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে) আপনি আমাকে মারলেন ?

প্রথম যুবক : (সহজ কণ্ঠস্বরে) হ্যাঁ, মারলাম।

দ্বিতীয় যুবক : (ততক্ষণে নিজেকে আয়ত্তের-মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে) কেন জানতে পারি কি ?

প্রথম যুবক : নিশ্চয় ! আপনি আগে মারলেন বলে।

দ্বিতীয় যুবক : আমি মেরেছি আপনি অসভ্য বলে।

প্রথম যুবক : আর আমি মেরেছি আপনি মূর্খ বলে।

দ্বিতীয় যুবক : (তখন তর্কের নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে) তার মানে ? অন্যের দুঃখে আপনি হো হো করে আসেন, আর আপনি বলতে চান আপনি সভ্য ?

প্রথম যুবক : আজ্ঞে হ্যাঁ। আজকের সভ্যতার ঐটেই তো বড়ো লক্ষণ। অন্যের দুঃখে হো হো করে হাসা। আমি তা জানি তাই আমি সভ্য, আর আপনি তা জানেন না—তাই আপনি মূর্খ।

দ্বিতীয় যুবক : দেখুন—আপনি ওরকম ব্যক্তিগত গালাগাল দেবেন না ! আমার কিন্তু হাত নিশ-পিশ করছে—আমি ক্ষেপে গিয়ে আর এক ঘা মেরে বসতে পারি।

প্রথম যুবক : তাতে কি খুব সুবিধে হবে ? আপনি ক্ষেপে গিয়ে এক ঘা দিলেন, আর আমিও ঠাণ্ডা মাথায় আপনাকে পাল্টা এক ঘা দেবো। এর বেশী তো আর গড়াবে না।

দ্বিতীয় যুবক : কিন্তু আপনি যে নয়কে হয় করছেন। সভ্যতা কি কখনও ওরকম হৃদয়হীন হয় ?

প্রথম যুবক : আমি তো দেখছি, আপনিই নয়কে হয় করছেন। হৃদয়বানকে হৃদয়হীন বলছেন।

দ্বিতীয় যুবক : মানে ?

প্রথম যুবক : মানে—আহা বলে পিঠ চাপড়ালে আপনি হয়ত বিচলিত হতেন—চাই কি ভ্যাঁক করে কেঁদেও ফেলতেন, কিন্তু দেখে পথ চলতে শিখতেন না।

দ্বিতীয় বুবক : দেখুন, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে বড়ো বড়ো কথা অনেকেই বলে। পড়ে গেলে বুঝতেন।

প্রথম যুবক : আজ্ঞে না, কিছু বুঝতাম না।

দ্বিতীয় যুবক : তার মানে ?

প্রথম যুবক : মানে আপনার মতো বুঝতাম না।

দ্বিতীয় যুবক : তার মানে আপনি বলতে চান, পড়ে গেলে আপনার লাগতো না ?

প্রথম যুবক : লাগতো না আবার—নিশ্চয় লাগতো।

দ্বিতীয় যুবক : তবে ?

প্রথম যুবক : পড়া মাত্রই হো হো করে হেসে উঠতাম।

দ্বিতীয় যুবক : (ক্রুদ্ধ স্বরে) দেখুন, আপনি হয়তো আমাকে পাগল-টাগল ভেবেছেন—আমি কিন্তু তা নই।

প্রথম যুবক : কি আশ্চর্য, আপনি কথাটা বিশ্বাস করলেন না ?

দ্বিতীয় যুবক : কি করে করি বলুন ? পড়েও যাবেন আপনি, আবার হেসেও উঠবেন আপনি। কাকে দেখে হাসবেন শুনি ? আমাকে দেখে ?

প্রথম যুবক : আপনাকে দেখে হাসবো কেন ? নিজের মুখ্যুমিতে নিজেই হেসে উঠতাম।

দ্বিতীয় যুবক : জীবনে বোধ হয় দুঃখ-টুঃখ বিশেষ পান নি—তাই না ?

প্রথম যুবক : না, দুঃখটা আর পেলাম কোথায় ? বাবা স্কুলমাস্টার ছিলেন। পুষ্যি ছিলো মা, আমরা পাঁচ ভাই, আর চার বোন। কাজেই দুঃখটা আর পেলাম কই বলুন ? বেশ সুখেই ছিলাম, এখনও আছি।

দ্বিতীয় যুবক : কিন্তু তাহলে—?

প্রথম যুবক : না না, এর মধ্যে তাহলে তো কিছু নেই। এ তো হবেই ! এর মধ্যেই তো আমরা জন্মেছি। চারপাশে অন্ধকার ছিলো বলেই তো আমাদের সুবিধে। (পিছন দিক হইতে আর একজন প্রবেশ করিয়াছিল। বয়সে বৃদ্ধ। পরিধানে হাফসার্ট ও খাটো ধুতি। পায়ে ছেঁড়া চটি ও নাকের উপর ঝুলিয়া পড়া নিকেলের চশমা। বৃদ্ধ শেষের কথাগুলি শুনিতে পাইয়াছিলেন।)

বৃদ্ধ : (দ্বিতীয় যুবককে) কি হে চার্বাক, (প্রথম যুবকের দিকে ইঙ্গিত

করিয়া) গাঁজা-টাঁজা খায় নাকি ?

চার্বাক : আরে দধীচি যে ! নচিকেতা কোথায় ? সে তো তোমার সঙ্গেই ছিলো ।

দধীচি : আরে ছিলো তো আমার সঙ্গেই । হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, সব গ্যাড়াকল, সব ফক্কিকারি, ইহই ব্রহ্ম ইহই ব্রহ্ম, ইহই ব্রহ্ম বলতে বলতে সেই যে ছুট দিলে, তার আর পাত্তা পেলাম না ! ভালো কথা—অধমদাস তোমার খোঁজ করছিলো ।

চার্বাক : অধমদাস ? কেন ?

দধীচি : বলছিলো, কি সব ঘিয়ের দাম-টাম নাকি বাকী আছে ।

চার্বাক : ঘিয়ের দাম ? তা সে ওর কাছে কি ? সে তো ঘৃতসেনের কাছে ।

দধীচি : বলছিলো, তাগাদার ভারটা নাকি ওর ?

চার্বাক : আর ঘৃতসেনের কাছে ওর পাওনাটা ? সেটা আদায়ের ভার কার ? আমার নাকি ?

দধীচি : সেই কথাই তো ওকে বললাম । বললাম, অধমদাস—আগে নিজেরটা বুঝে নাও, তারপর পরেরটার জন্যে তাগাদা দিও ।

চার্বাক : তা কি বললে ?

দধীচি : প্রথমে তো তোমার খোঁজেই গেল । পরে দেখি ফিরতি পথে ফেরত যাচ্ছে । বোধহয় আমার কথাটা সম্যক অনুধাবন করেছে । তারপর এখানে কি ? (প্রথম যুবকের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) ভদ্রলোকের তো দেখছি শিব-শম্ভু অবস্থা !

চার্বাক : আর বলো কেন ? নচেটার পাল্লায় পড়ে, অনেকদিন তো আর ঘি-টি পেটে পড়েনি । তাই ধারে ঘি পাবার তালে এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম । আমার দোষের মধ্যে সামনে পড়েছিল এক কলার খোসা—তাইতে পা পড়ে যেতে—

দধীচি : (কথা শেষ হইবার পূর্বেই) দড়াম করে এক আছাড়— (বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল) ।

চার্বাক : তুমিও হাসলে দধীচি ?

দধীচি : কি জানি চার্বাক ! তুমি দড়াম করে আছাড় খেয়েছ শুনেই আমার কি রকম হাসি পেয়ে গেল।

চার্বাক : (ক্ষুব্ধ স্বরে) তবে আর এঁর দোষ কি ? তোমার সঙ্গে আমার কতকালের চেনা। তুমি যদি হাসতে পারো তাহলে ইনি তো হাসবেনই।

দধীচি : কি করি বলো ? হাসি যে পেয়ে গেল।

চার্বাক : কই, ইন্দ্রের বেলায় তো হাসো নি ? সে যখন উচু থেকে পায়ে এসে পড়েছিল, তখন তো হাড় ক'খানা দিয়ে দিয়েছিলে।

দধীচি : (ক্ষুব্ধ স্বরে) চার্বাক !

চার্বাক : কেন, এখন চার্বাক কেন ? আমি পড়ে গেলে হাসতে পারো, আর ইন্দ্র পড়ে গেলে হাসতে পারো না ?

দধীচি : চার্বাক, দোহাই তোমার ! চুপ করো ! ও কথা আর মনে করিয়ে দিও না। তখন আমি ভুল করেছিলাম চার্বাক।

চার্বাক : ভুল করেছিলে ! এ কি বলছো তুমি ?

দধীচি : এখন তো তাই দেখছি। হাড় ক'খানা ইন্দ্র নিলে, দধীচি ম'ল। কিন্তু কই ? যে মানুষের হাড়ে ইন্দ্র সুবিধে করে নিলে, সে মানুষের তো কোনো সুবিধে হলো না। ঘরের বৌকে ঘরে ফেলে রেখে, সে তো দেখলাম উর্বশীকে নিয়ে মত্ত !

চার্বাক : তাহলে দধীচি ! যা জেনেছি সবই তো ভুল ? আমি তো তবু ঠিকের একটু-আধটু কাছে গেছি ! তোমরা তো একেবারেই ভুল ! তুমি, নচিকেতা—সব ভুল !

দধীচি : (শ্রান্ত কণ্ঠস্বরে) এতদিন খোঁজার পর আজ তো তাই মনে হচ্ছে !

চার্বাক : (প্রথম যুবককে দেখাইয়া) তবে আর ওঁকে গাঁজা খাওয়ার কথা বললে কেন ? গাঁজা তো তোমরা খেয়েছ। বরং উনি তো দেখছি অমৃত পান করেন।

দধীচি : আমি তো বলিনি উনি নিয়মিত গাঁজা খান। অন্ধকারের সুবিধেটা গেঁজেলের কথার মতো মনে হলো, তাই বললাম।

প্রথম যুবক : আমি কিন্তু কথাটা মোটেই গেঁজেলের মতো বলিনি সার। অন্ধকারকে যদি অন্ধকার বলে জানা যায়, তবে আলো আনার পক্ষে তার মতো সুবিধে আর নেই। কার সঙ্গে লড়তে হবে সেটা তো জানা গেল।

চার্বক : কিন্তু লড়াইয়ের তো দরকার নেই। আমার দরকার ঘি খাওয়ার, আমি ধার করে ঘি খাবো। পরে মহাজন ফাঁকি দিলেই চলবে।

প্রথম যুবক : তা হলেই মহাজন আসবে আপনার সঙ্গে লড়াই করতে। আপনার ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ নিয়ে, সে তার অন্যায় লড়ায়ে, আপনার ন্যায্য পাওনাটা শুদ্ধ নিয়ে নেবে।

দধীচি : কিন্তু আমি তো আমার নিজের পাওনাটা চাইনি। মানুষের পাওনাটা ইন্দ্র মিটিয়ে দিলে না কেন?

প্রথম যুবক : কে আপনার ইন্দ্র, আর কে আপনার মানুষ, তা তো আমি জানি না। তবে আপনি বোধহয় লোক চিনতে পারেন নি।

দধীচি : তাই হয়তো হবে। হয়তো সত্যিই লোক চিনতে পারিনি। হয়তো বৃত্রকে দিলেই হতো।

চার্বাক : হয়তো হতো মানে? নিশ্চয় হতো। আমি তো একবার তোমার কানে কানে বলতে গিয়েছিলাম। তা সে ধোঁয়ার ঠেলা কি! কার সাধ্য কাছে এগোয়। বৃত্রকে দেওয়াই তোমার উচিত ছিলো দধীচি। মানুষ না হোক, মানুষের কাছাকাছি তো বটে। ইন্দ্র-টিন্দ্রর মতো ওরকম উঠাইগিরা নয়। আর অতো হাঙ্গামেরও তো কোনো দরকার ছিলো না—সোজা মানুষকে দিলেই তো পারতে?

দধীচি : আরে জানলে তো দিতামই! ঐ তো বললাম তোমায়, বুঝতে পারিনি! তখন একেবারে দলবল নিয়ে ইন্দ্রটা হাতে পায়ে এসে পড়লো। মনে হলো, দিই হাড় ক'খানা, বজ্রটা তৈরি করে বৃত্রটাকে তো মারুক। দেবার আগে বলে দিলাম, দেখো ইন্দ্র—মানুষকে যেন ভুলো না! দিব্যি সুবোধ ছেলের মতো ঘাড় নেড়ে দিলে। কিন্তু কোথায় কি? সেই অজন্মা, অনাবৃষ্টি, আর দুর্ভিক্ষ! সেই মানুষে

মানুষে লড়াই—না ঘরে শান্তি, না বাইরে!

চার্বাক : আর ওপরে তাকিয়ে তোমার ঐ ইন্দ্রকে দেখ। খালি নেশা, আর মেয়েছেলে নিয়ে নাচ গান, খালি হৈ আর হল্লা! খেয়াল-খুশি মতো এক-আধটা পেয়ারের লোকের যদি বা ভালো করে তো হাজারটা লোকের করে মন্দ!

প্রথম যুবক : (দধীচিকে) কি দিয়েছিলেন, কাকে দিয়েছিলেন, তা আমার ঠিক জানা নেই। তবে এভাবে হাজার লোকের জিনিস একজনের হাতে তুলে দিয়ে আপনি খুব অন্যায় করেছেন।

দধীচি : কি করে বুঝবো বলুন? এখনকার মতো তখন কলিযুগ ছিলো না, ছিলো সত্যযুগ। ভাবতাম সবাই বুঝি আমার মতো বোকা-সোকা ভালমানুষ!

প্রথম যুবক : (ঠাট্টার সুরে) ও, তাই বলুন! এরকম ভাব-ভাবনা না হলে আর ওরকম হয়!

দধীচি : (চটিয়া উঠিয়া) তার মানে! ভাবনাটা আমার ভুল নাকি?

প্রথম যুবক : আজ্ঞে হ্যাঁ, পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

চার্বাক : (চটিয়া) আপনি তো আচ্ছা অর্বাচীন মশাই! কাকে কি বলছেন জানেন? চেনেন এঁকে?

দধীচি : থামো চার্বাক। চেনা-চিনির ব্যাপারটা পরে হবে। ওঁর কথার ওপর আমার তর্ক আছে। আগে সেটার নিষ্পত্তি হোক! (প্রথম যুবককে) হ্যাঁ মশাই, আপনি বললেন—পা থেকে মাথা পর্যন্ত। কার পা থেকে মাথা? আমার?

প্রথম যুবক : আজ্ঞে না, আপনার ভাবনার।

দধীচি : আপনার বিচারে ভুল হলো। ভাবনার পাও নেই মাথাও নেই। ভাবনা থেকে ধারণা, ধারণা থেকে পরম সত্য। সত্যই কি জ্যান্ত মানুষ যে, তার ক্ষয় আছে, বৃদ্ধি আছে—পাও আছে, মাথাও আছে? যে সত্য পরম, তা অক্ষয়, নির্বৃদ্ধি (তাড়াতাড়ি বলিতে আরম্ভ করিলেন, যেন মুখস্থ বলিতেছেন) তার পা নেই মানে আদি নেই, মাথা নেই মানে অন্ত নেই, তার দেহ নেই মানে আকার নেই,

তার জন্ম নেই, তার মৃত্যু নেই—অজর, অমর, অবিনশ্বর—জানেন তা ? (আর একজন যুবকের প্রবেশ)।

চতুর্থ যুবক : (প্রবেশ করিতে করিতে দধীচির কথাগুলি শুনিতে পাইয়াছিল। নিকটে আসিয়া প্রথম যুবককে) লোকটা কে রে ফণে ? গুপে গুণ্ডার মতো লড়াচ্ছে ?

ফণি : আর বলিস কেন ? ভদ্রলোক যাচ্ছেন পেছন দিকে, আর বলছেন সামনে আসছি ! তাই—

চতুর্থ যুবক : তাই তুমি বোঝাচ্ছিলে ! তোকে নিয়ে আর পারা গেল না ফণে ! তোর এই বোঝানো অব্যেসটা ছাড়্ তো। আর বাপু লোকে যদি না বোঝে তো তোর কি ? আর আপনাদেরও বলি মশাই, পারেন তো সরে পড়ুন। নইলে ভেতরে যা আছে সব ধোঁয়া করে ছেড়ে দেবে। লোকটা তিন-পুরুষে মাস্টার, ভাতের থালায় অঙ্ক কষে। ন'বছর টিউশানি করছে, আর তিন বছর পরে একটি গাধা হবে—সাংঘাতিক লোক ! পারেন তো এইবেলা মানে মানে কেটে পড়ুন।

দধীচি : কি করে যাই বলুন ? তর্ক আরম্ভ হয়েছে, এখন নিষ্পত্তি না করে যাওয়া যায় না। গুরুর নিষেধ—কি বলো চার্বাক ?

চার্বাক : না ভাই দধী, আমি তা বলি না।

দধীচি : তার মানে ? তুমি নিষ্পত্তি না করেই চলে যেতে বলছো ?

চার্বাক : না, তা বলছি না। তবে গুরু-ফুরু আমার নেই, কাজেই কোনো নিষেধ আমি মানি না।

দধীচি : তুমি অধার্মিক চার্বাক, তুমি নাস্তিক।

চার্বাক : তুমি বোকা দধীচি, তুমি আমাকে বোঝো না। আমার মতো আস্তিক কে আছে বলতে পারো ? (নিজের দেহের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) এটা যে আছে তা মানি—(মাটিতে পা ঠুকিয়া) এটাকেও মানি—(নিজের ডান হাতের আঙুলের ঘ্রাণ লইয়া) আগে ধার করে প্রচুর ঘি খেতাম মানি—এখনও খাবার ইচ্ছেটা আছে সেটাও মানি। এর চেয়ে বড়ো আস্তিক তুমি পাচ্ছ কোথায় ?

দধীচি : কিন্তু পেট আর মাটির ওপরেও তো একটা কিছু আছে চার্বাক। সেটাকে তো তুমি মানো না।

চার্বাক : সেটাকে আমি জানি না দধীচি—তাই মানি না।

দধীচি : তাই যদি পুরোপুরি হবে চার্বাক, তবে আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

চার্বাক : বিশ্বাসে জানি কিছু নেই, দেখছি যদি যুক্তি কিছু পাই।

চতুর্থ যুবক : দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান। আপনারা যে ধোঁয়ার বোমা ছাড়তে আরম্ভ করলেন ! আমি কাজটা সেরে নিযে চলে যাই—তারপর যত ইচ্ছে ধোঁয়া ছাড়ুন, কেউ আপত্তি করবে না—(ফণিকে) হ্যাঁরে ফণে, ওদিকের খবর কি ? মালিক শুনলাম কম্‌প্রোমাইজ করতে চায় ?

ফণি : কিন্তু আমরা তো তা চাই না—কাজেই কম্‌প্রোমাইজ, হবে না, স্ট্রাইক্ চলবে।

চতুর্থ যুবক : সে কি রে ? শুনলাম বারো আনা মেনে নিয়েছে—

ফণি : জানে গলদ যা আছে, তাতে কোর্টে গেলে ষোলো আনা মানতে হবে। তাই দেখছে বারো আনা দিয়ে যদি পার পাওয়া যায়।

চতুর্থ যুবক : ঠিক বলছিস তো ? না শেষ পর্যন্ত সব ফক্কা হয়ে যাবে ?

ফণি : কেন, তোর কি বিশ্বাস হয় না ?

চতুর্থ যুবক : বিশ্বাস হবে না কেন, বিশ্বাস আছে। তবে সেটা তোর কথাতে—নিজের মনের মধ্যে অমি অতদূর খোঁজ করি না—কি রকম যেন ঘুরপাক খেয়ে যায়। যাকগে ওসব কথা—একটা টাকা দে দিকিনি।

ফণি : কেন, আজ বিঁড়ি পাকাতে যাসনি ?

চতুর্থ যুবক : (বেশ জোরের সহিত) হ্যাঁ গিয়েছিলাম—(হঠাৎ মনে পড়িল মিথ্যা বলিতেছে। কণ্ঠস্বর নামিয়া আসিল)। না—মানে আজ আর যাইনি। কি রকম যেন যেতে ইচ্ছে করলো না। দে না একটা টাকা, কাল-পরশু দিয়ে দেবো।

ফণি : তা না হয় দিচ্ছি—কিন্তু দোহাই তোর, মিথ্যে কথা বলিসনি !

তোর তো শোধ দেওয়া অব্যেস নেই।

চতুর্থ যুবক : তুই একেবারে হোপলেস ফণে। তোর কাছেও যদি সত্যি কথা বলতে হয়, তবে মিথ্যে কথাটা বলবো কার কাছে বলতে পারিস? ওটারও তো অব্যেস রাখতে হবে। নে নে, ঝাড় দিকিনি একটা টাকা—(ফণি পকেট হইতে এক টাকার খুচরা গণিয়া দিলে, চলিয়া যাইতে যাইতে) আর শোন্, ভালো চাস তো এসব গুপে গুণ্ডাদের তাড়া—মাথা একেবারে খারাপ করে দেবে—(চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় চার্বাক ডাকিল)

চার্বাক : শুনছেন—ও মশাই—

চতুর্থ যুবক : (ফিরিয়া) পেছু ডাকলেন তো। (মুখ ভ্যাংচাইয়া) যাচ্ছি একটা শুভকাজে—অমনি 'শুনছেন ও মশাই'—আশ্চর্য। বলুন—কি বলছেন?

চার্বাক : আমাকে ওই থেকে কিছু ধার দিন না?

চতুর্থ যুবক : (যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই) ধার দেবো? আপনাকে?

চার্বাক : হ্যাঁ—মানে বেশী নয়—এক ছটাক ঘিয়ের দাম। অনেক দিন খাইনি কিনা।

চতুর্থ যুবক : (বিস্মিত হইয়া) কি খান নি?—ঘি?

চার্বাক : আজ্ঞে হ্যাঁ—বড়ো কষ্ট হচ্ছে। আমার আবার একটু ঘিয়ের নেশা আছে কিনা।

চতুর্থ যুবক : (এতক্ষণ বিস্ময়ের ঘোরটা কাটে নাই। হাসিটা চাপা ছিলো। কিন্তু আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না, হো হো করিয়া হাসিয়া একেবারে যেন ফাটিয়া পড়িল। হাসিতে হাসিতে ফণিকে) ওরে ফণে, এ মাল তুই কোত্থেকে যোগাড় করলি রে? এ একেবারে পগেয়া মাল। বলে—ঘিয়ের নেশা আছে। (চার্বাককে) তা হ্যাঁ বাবা, আর কিছুর নেশা নেই? দুধের? সন্দেশের?

চার্বাক : না না, ও দুধ-ফুধের নেশা নেই—ওসব ছেলেমানুষী ব্যাপার। ঐ ঘিটাই খেয়ে খেয়ে কি রকম নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে।

চতুর্থ যুবক : ও, তাই নাকি ? তা কি ঘি বাবা ?

চার্বাক : কেন, খাঁটি গব্য।

চতুর্থ যুবক : আই অ্যাম সরি মানে দুঃখিত। ওটি আউট অব মার্কেট, মানে বাজারে পাওয়া যায় না।

চার্বাক : গব্য ঘৃত বাজারে পাওয়া যায় না ?

চতুর্থ যুবক : না বাবা মালদাদা—গব্য ঘৃত বাজারে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে খাঁটি উদ্ভিজ্জ ঘৃত—খাঁটির দাম দশ পয়সা ছটাক, ভেজালের দাম আরও বেশী।

দধীচি : সেকি, খাঁটির চেয়ে ভেজালের দাম বেশী ?

চতুর্থ যুবক : দাদা, ভেজালটা গব্য বলে চলে কি না।

চার্বাক : না দাদা—আমার ও ভেজালের দরকার নেই—আপনি ঐ দশটা পয়সাই দিন—

চতুর্থ যুবক : দেবো বাবা, নিশ্চয় দেবো। তোমার এমন খাসা নেশা, পয়সা না দিলে যে পাপ হবে। না দিয়ে কি পারি। (দশটা পয়সা চার্বাকের হাতে দিয়া) তা বাবা, তুমি আমাকে যখ দিলে—তোমার নামটি কি ?

দধীচি : কিন্তু পরম সত্যটা ? সেটা তো আর কখনও মিথ্যে হয়ে যায় না ?

ফণি : পরম সত্য বলে তো কোনদিন কিছু ছিলো না। ওটাকে জানার শেষে বসিয়ে রাখা হতো—না জানার আরম্ভতে। পরে কারবারী লোকেরা ওটাকে আপনাদের মতো বোকা ঘোড়ার চোখে ঠুলি হিসেবে লাগিয়ে রেখেছিলো।

চার্বাক : আচ্ছা দধীচি—এ তর্কে লাভটা কি বলতে পারো ? আমরা সত্যযুগের, আর উনি কলি যুগের—মতে কখনও মিলতে পারে ?

ফণি : আপনার দেখছি, উল্‌টো কথা বলা একটা অব্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

চার্বাক : তার মনে ? আমরা সত্যযুগের নই ?

ফণি : আজ্ঞে না।

চার্বাক : আপনারা কলি যুগের নন ?

ফণি : আজ্ঞে না, ঠিক উল্‌টো।

দধীচি : মানে ?

ফণি : মানে—শুয়ে থাকার নাম কলি যুগ, জাগার নাম দ্বাপর, উঠে দাঁড়ানোর নাম ত্রেতা, আর চলাই হলো সত্যযুগ।

চার্বাক : হ্যাঁ, এ তো ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

ফণি : ঠিক তাই। ঐ হিসেবে ভাবের দিক দিয়ে আপনারা হয় কলি, নয় দ্বাপর, আর না হয় ত্রেতা। আমরাই হলাম সত্য যুগ কারণ আমরাই চলছি।

[এমন সময় সকলেই শুনিতে পায় কে যেন চীৎকার করিতে করিতে এই দিকে আসিতেছে—"চার্বাক আমি পেয়েছি—আমি খুঁজে পেয়েছি যমকে।" পরমুহূর্তেই ঐ কথা বলিতে বলিতে উত্তেজিত এক যুবকের প্রবেশ, সঙ্গে স্থানীয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও কারবারের মালিক ঝুনঝুনদাস)]

পঞ্চম যুবক : আমি পেয়েছি চার্বাক, এই দেখো আমি যমকে খুঁজে পেয়েছি।

চার্বাক : তাই তো হে দধীচি—নাচিকেতা যে সত্যিই যমকে খুঁজে পেয়েছে।

ঝুনঝুনদাস : আরে ছোড়ুন মোশাই—যম-যম-যম ! যম এখানে কে আছে ? হামি ঝুনঝুনদাস আছি। (ফণিকে দেখিয়া) আরে দেখুন তো মোশাই ফণিবাবু। রাস্তা থেকে তাড়া করে লিয়ে আসছে, বলে, যম-যম-যম। আরে বাবা, হামি যম থোড়াই আছি। হামি ঝুনঝুনদাস আছি। হামার কাপড়াকা তুকান আছে, লোহে কা কারবার আছে। হামি বহুত ভারী বিজনেস ম্যাগনেট আছি। পান-সাতশো আদমী হামার কারবারে নোকরি করে। ফণিবাবু ভি করে। আপনি ফণিবাবুকে পুছতে পারেন—উনি বহুত ভারী ইউনিয়ন লীডার আছেন।

নচিকেতা : ওসব বলে আমাকে এড়াতে পারবে না যম। আমি তোমাকে

দেখা মাত্রই চিনেছি। ব্রহ্মজ্ঞান আমার চাই যম।

ঝুনঝুনদাস : কেয়া ?

নচিকেতা : ব্রহ্মজ্ঞান। পরম ব্রহ্মের স্বরূপ।

ঝুনঝুনদাস : পরম ব্রহ্ম! আরে উও তো হ্যায়। বনারসজীমে হামি উহার মন্দর বনায়ে দিয়েছি। সেখানে গুরুজী আছেন—আপনি তাঁহার কাছে চলিয়ে যান—ব্রহ্মকা খবর মিলবে।

নচিকেতা : আমি তোমার কাছ থেকে ব্রহ্মের স্বরূপ জানবো যম। এ আমার প্রতিজ্ঞা।

ঝুনঝুনদাস : তা লিন, জেনে লিন। গুরুজী হামাকে বাৎলিয়ে দিয়েছেন। ব্রহ্ম অসীম আছেন, ব্রহ্ম অনন্ত্ আছেন—

নচিকেতা : ওসব আমি জানি যম—ওতে আমার প্রশ্ন মেটেনি। তোমার কাছে লব্ধ ঐ জ্ঞান আমি মানুষকে দিতে এসেছিলাম। মানুষকে আমি অমৃতের সন্তান বলে সম্বোধন করে তোমার কাছ থেকে পাওয়া ব্রহ্মজ্ঞান তাদের দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের সংশয়ের নিরসন হয়নি।

ঝুনঝুনদাস : আরে, ইয়ে তো বড়া আফৎ। আরে মোশাই ফণিবাবু আপনি বোলেন না—হামি যম নেহি, ঝুনঝুনদাস আছি।

ফণি : কিন্তু আপনি যে সত্যিই যম, ঝুনঝুনদাস। প্রগতির ইতিহাসকে আপনি আপনার খেরো খাতায় বাঁধা রেখেছেন। এদিকে একটা মরে তো আপনার খাতার ইলেক একটা বেড়ে যায়।

চার্বাক : হুঁ হুঁ বাবা ঘুঘু পক্ষী—কেমন জোড়া ফাঁদ? এধারে নচে, ওধারে ফণে।

ঝুনঝুনদাস : (চটিয়া চার্বাককে) এই শালা-বক-ওয়াস মৎ কিয়া করো। (ফণিকে) আরে মোশাই ফণিবাবু—আপনি এসব ঝামেলা ছেড়ে হামার সঙ্গে চলে আস্থন তো। স্ট্রাইকের বেপারে আপনার সঙ্গে দুটো কথা আছে। মানে—যদি হামাতে আপনাতে একটা কম্‌প্রো-মাইজ হয়ে যায়, তো ফির বুঝলেন কিনা—(একটু হাসিবার চেষ্টা করিল।)

নচিকেতা : (সামনে আসিয়া চীৎকার করিয়া) কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান আমার চাই, যম। আমি যুগ যুগ ধরে তোমার পেছনে ঘুরছি। হয় ব্রহ্মজ্ঞান দাও, আর নয় মানুষকে বলে যাও তুমি মিথ্যাবাদী।

দধীচি : (সামনে আসিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে) মানুষকে বলে যাও—তোমরা দেবতার দল ঠকিয়ে তার হাড় ক'খানা নিয়েছিলে—তার বদলে তাকে কিছুই দাও নি।

চার্বাক : (সামনে আসিয়া চীৎকার করিয়া) হে ঘুঘুরাজ—হয় ব্রহ্মজ্ঞান দাও, আর নয়তো কিছু ঋণ দাও—আমি ঘৃত লেহন করি।

ঝুনঝুনদাস : (ক্রুদ্ধ স্বরে) তো ফির ব্রহ্ম লেওগে ? ইয়ে লেও ব্রহ্ম। (পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া ছুঁড়িয়া দিলো।)

ফণি : (মৃদু হাসিয়া) একটু ভুল হয়ে গেল ঝুনঝুনদাস। (মাটির দিকে ইঙ্গিত করিয়া) এই ব্রহ্ম। (পেটের উপর হাত রাখিয়া) এইটি ব্রহ্ম (বুকে হাত রাখিয়া) এইখানে ব্রহ্ম। এদের বাইরে কিছু নেই !

ঝুনঝুনদাস : (ক্রুদ্ধ স্বরে) কভি নেহি ! তামাম ঝুট্। তামাম ঝুট! তুমহারা সাথ কোই কম্‌প্রোমাইজ্ নেহি ! (বলিতে বিলিতে দ্রুত প্রস্থান করে। নচিকেতাও—ব্রহ্মজ্ঞান আমার চাই যম—বলিতে বলিতে যমের পিছন পিছন বাহির হইয়া যায়।)

দধীচি : ও চার্বাক, নচিকেতা যে আবার ছুটলো। চলো যাই।

চার্বাক : না ভাই, আমি ও ছোটাছুটির মধ্যে নেই। আমি যাবো একটু ঘিয়ের যোগাড়ে। আমার কি রকম নেশার টান ধরতে আরম্ভ করেছে।

দধীচি : তাহলে আমিই চলি, চার্বাক। আমার আবার ছেলেটার ওপর কি রকম মায়া পড়ে গেছে। বয়স বেশী নয়, অমৃত অমৃত করে কোথায় কোন্ বেঘোরে পড়ে থাকবে—আচ্ছা, চলি দাদা ফণিবাবু (ফণিকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান।)

চার্বাক : (ফণিকে) আচ্ছা ঘুঘুপ্রবর—আমিও চলি। বেলা-বেলি না পৌঁছুলে, আবার ঘিয়ের দোকান যদি বন্ধ হয়ে যায়।

ফণি : (নমস্কার করিয়া) আসুন মুনিবর। তবে একটা অনুরোধ, ঘি-টা নগদই খাবেন।

চার্বাক : (চলিয়া যাইতে যাইতে) সেটা ভেবে-চিন্তে দেখতে হবে। আপনি বললেন আর নগদ খেলাম, তা তো আর হতে পারে না। (প্রায় বাহির হইয়া গিয়াছিল, এমন সময় পিছন হইতে ঘৃতসেনের প্রবেশ। আকারে, প্রকারে, বয়সে, পোশাক-পরিচ্ছদে, ঘৃতসেন চিরকালের ঘিওয়ালা।)

ঘৃতসেন : (জোড় হস্তে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়া) চলে যাচ্ছেন মুনিবর—কিন্তু আমার পাওনাটা ?

চার্বাক : (ফিরিয়া) কে—ঘৃতসেন ?

ঘৃতসেন : (করজোড়ে) হ্যাঁ মুনিবর।

চার্বাক : কিন্তু আমার কাছে তো তোমার কিছু পাওনা নেই ঘৃতসেন। জানো তো, আমি ঘি খাই ধারে, আর সে ধার আমি শোধ দিই না। আমার শুধুই ঋণং কৃত্বা, আর সুখং জীবেৎ। ঋণ শোধ দিয়ে অসুখকে ডেকে আনতে পারবো না ঘৃতসেন।

ঘৃতসেন : কিন্তু মুনিবর, অধমদাস যে তার পাওনাটা আমার কাছ থেকে বুঝে নিয়েছে। কাজেই আমার পাওনাটা না নিলে কি করে চলে বলুন ?

চার্বাক : (বিস্মিত হইয়া) সেকি ঘৃতসেন, তুমি অধমদাসের সব পাওনা মিটিয়ে দিয়েছ ?

ঘৃতসেন : আংশিক মেটাতে হয়েছে মুনিবর।

চার্বাক : (হঠাৎ উল্লসিত হইয়া) সত্যি ঘৃতসেন, সত্যি ? অধমদাসের পাওনা কিছুটা মিটিয়েছ তুমি ?

ঘৃতসেন : হ্যাঁ মুনিবর। মেটাতে বাধ্য হয়েছি—নইলে অধমদাস কাজ করবে না বলেছিলো।

চার্বাক : (উল্লাসে প্রায় চীৎকার করিয়া) একি বলছো তুমি ঘৃতসেন ? তুমি অধমদাসের পাওনা মেটাতে আরম্ভ করেছ। তোমার কথা শুনে আমার বড্ড নেশা পেয়ে যাচ্ছে ঘৃতসেন। তুমি এক কাজ

করো, এই দশটা পয়সা নিয়ে আমাকে এক ছটাক বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ ঘৃত দেবে চলো।

ঘৃতসেন : (বিস্ময়ে চোখ প্রায় কপালে উঠিবার যোগাড়) একি মুনিবর, আপনি নগদ মূল্য দিচ্ছেন ? (ব্যাকুল স্বরে) না না মুনিবর, তাও কি কখনো হয় ? অধমকে এভাবে পায়ে ঠেলবেন না।

চার্বাক : (বিস্মিত হইয়া) সেকি ঘৃতসেন—এতক্ষণ তুমি তো নিজের পাওনাটাই চাইছিলে ?

ঘৃতসেন : সেটা আগের পাওনা মুনিবর। আমি তো এখনকারটা চাই নি। এটা ধারে খাবেন—বরাবর ধারে খাবেন—ধারে খাবার জন্মগত অধিকার আছে আপনার।

চার্বাক : একি বলছো ঘৃতসেন ?

ঘৃতসেন : আজ্ঞে, বলছি না তো। বলতে কি পারি আপনাকে ? নিবেদন করছি। আর আগেরটা যদি না দিতে পারেন—দেবেন না। সবটাই ধারে রাখবেন। আমি কি সত্যিই চাইছি—না, চাইতে পারি আপনার কাছ থেকে ? আমি তো অব্যেসে তাগাদা করছি। বিরক্ত হলে পায়ে করে একটু বাঁপাশে সরিয়ে দেবেন। এভাবে শ্রীচরণের আশ্রয়টুকু ঘুচিয়ে দেবেন না মুনিবর।

চার্বাক : তা আর হয় না ঘৃতসেন। আমি সব বুঝেছি। যতক্ষণ তোমার ধার মারবো, ততক্ষণে তুমি আমার ন্যায্য পাওনাটা ফাঁকি দিয়ে নেবে। না ঘৃতসেন, ও আমি ঠিক করে ফেলেছি—এতদিন ছিলো ঋণং কৃত্বা—আজ থেকে হবে মূল্যং দত্বা।

ঘৃতসেন : (কাতরস্বরে) মুনিবর।

চার্বাক : (দশটা পয়সা ঘৃতসেনের হাতে দিয়া) ঠিক তাই ঘৃতসেন। (চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া) তবে হ্যাঁ, কলাপাতায় যেন ঘি পাঠিও না, কি রকম কলাপাতা কলাপাতা গন্ধ হয়ে যায়। সোনা, রূপো না পারো, কাঁসার থালায় পাঠিও। আর খুব তাড়াতাড়ি,—আমার বড্ড নেশা লেগে গেছে। আমি ততক্ষণ যজ্ঞের একটু যোগাড় দেখিগে। ওটা না হলে আবার ঠিক মৌতাত

হয় না। (ঘৃতসেন সম্মতি জানাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলে চার্বাকের প্রস্থান)।

ঘৃতসেন : (চার্বাকের গমনপথের দিকে দেখিয়া) হুঁ হুঁ বাবা ঘুঘুপক্ষী। আমার হাত ছাড়া তুমি যাবে কোথায়? ঘিয়ের মূল্য দিলে কি হবে? ঐ থালাটা তো আমি আর ফেরত নিচ্ছি না। ঐটি আমি তোমায় ঋণ দিলাম ঘুঘুশ্রেষ্ঠ—তুমি না চাইলেও ওটি আমি তোমায় ঋণ দিলাম। (উল্লাসে লাফাইতে লাফাইতে ফিরিয়া যাইতেছিল—হঠাৎ আগের সেই কলার খোসাটায় পা পড়িয়া যাইতে দড়াম করিয়া এক আছাড়। সঙ্গে সঙ্গে ফণিভূষণের হো হো করিয়া হাসি)।

ঘৃতসেন : (উঠিয়া, ফণির দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) যত সব অর্বাচীন আধুনিক যুবক। (এই কথা বলিতে বলিতে বাহির হইয়া যায়। ফণি তখনও হাসিতেছে। হাসির বেগ সামলাইতে না পারিয়া, বেঞ্চের উপর প্রায় শুইয়া পড়ে বলিলেই হয়। ঠিক এই সময় মঞ্চের উপর কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্ধকার আসে। আলো যখন জ্বলিয়া উঠে, তখন দেখা যায় পার্কের বেঞ্চের উপর ফণি ঘুমাইতেছিল, এতক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছে। চোখ রগড়াইতেছে, এমন সময় চতুর্থ যুবক অর্থাৎ বৈদ্যনাথের প্রবেশ)।

বৈদ্যনাথ : ফণে, শুনেছিস—ঝুনঝুনদাস আমাদের সমস্ত ডিম্যাণ্ড মেনে নিয়েছে—

ফণি : সত্যি?

বৈদ্যনাথ : হ্যাঁরে, সত্যি। এই তো খবর নিয়ে আসছি।

ফণি : সত্যি বলছিস। চল্, তোকে চা খাইয়ে দিই—(অভ্যাসবশতঃ বুক পকেটে হাত দিতে কি রকম যেন হালকা মনে হইল। পকেট দেখিয়া) যাঃ।

বৈদ্যনাথ : কি হলো রে?

ফণি : পকেটে এক টাকার খুচরো ছিলো, সেটা গেছে।

বৈদ্যনাথ : তুই কি রে ফণি? মাঝে একবার এসে তোর কাছে একটা

টাকা ধার চাইলাম—তুই ঘুমের ঘোরে পকেট থেকে এক টাকার খুচরো বার করে দিলি।

ফণি : দিলাম—না ? তাইত বলি, একেবারে মিথ্যে কি করে হয় ?

বৈদ্যনাথ : মিথ্যে ? কিসের মিথ্যে ?

ফণি : ও কিছু নয়—এমনি—তুই চল্— (দুই বন্ধু পার্ক হইতে বাহিরে যাইবার জন্য অগ্রসর হয়। এই সঙ্গে পর্দাও নামিয়া আসে)।

প্রমত্ত প্রহসন

।। চরিত্রলিপি ।।

হরিপদ লরেল

নটবর হার্ডি

জাহেদা জাবেরী

আচার্য গ্রেগেরিয়াস শ্রীহর্ষ

পন্‌টিয়াস্ অরুণাংশু

অক্‌টেভিয়াস্ নীলাদ্রি

একজন দর্শক

আরেকজন দর্শক

অরফিয়ুস বিশ্বাস

সরস্বতী ওয়াগ্‌নার

[মঞ্চ। যবনিকা নামানো। সামনে কিছুটা জায়গা। সেখানে কয়েকজনকে দেখা যায়। হরিপদ লরেল (পরিচালক—কৌতুক-নাট্য), নটবর হার্ডি (প্রধান অভিনেতা—কৌতুক-নাট্য), জাহেদা জাবেরী (প্রধানা অভিনেত্রী—কৌতুক-নাট্য), আচার্য গ্রেগেরিয়াস শ্রীহর্ষ (পরিচালক—বিয়োগান্ত নাটক), পন্‌টিয়াস্ অরুণাংশু (প্রধান অভিনেতা—বিয়োগান্ত নাটক), অক্‌টেভিয়াস নীলাদ্রী (অন্যমত প্রধান অভিনেতা—বিয়োগান্ত নাটক)। কেউ বসে, কেউ বা দাঁড়িয়ে। কেউ চলাফেরা করছে কেউ বা আড় হয়ে শুয়ে।]

হরিপদ : (পায়চারি করিতে করিতে, খুব নরম স্বরে আরম্ভ করিয়া প্রায় গর্জন করিয়া শেষ করে) আজ আমরা এখানে কেন··· নটবর হার্ডি ?

নটবর : (আড় হইয়া শোওয়া অবস্থায়, গর্জন করিয়া আরম্ভ করিয়া নরম স্বরে শেষ করে) নাটক করার জন্য, হরিপদ লরেল।

জাহেদা : (বসিয়া ছিলো। কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গান গাহিতে গহিতে বাঁদিক দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া নটবর হার্ডিকে) [গান] চাঁদ যদি নীল হয়ে আসে···(হার্ডিকে প্রায় গানের সুরে) কি করে জানলে ? (নটবর হার্ডি কোনো উত্তর না দিয়া তিনটি অক্ষরে একটু হাসে—হা-হা-হা। উত্তর দেন গ্রেগেরিয়াস শ্রীহর্ষ।)

গ্রেগেরিয়াস : (উঠিয়া সামনের দিকে ঝুঁকিয়া, হাত বাড়াইয়া দিয়া) হের বৎস, সম্মুখে তোমার পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ—(ঢেউ খেলাইয়া হাতটাকে হয়তো নামাইয়া লইতেন, আরম্ভও করিয়াছিলেন, কিন্তু পন্‌টিয়াস অরুণাংশু কথা বলিতে আরম্ভ করায়, হাত যেমন ছিলো তেমনই রহিয়া গেল।)

পন্‌টিয়াস : (তন্ময় হইয়া বসিয়াছিল। যেন সুর কাটিয়া গিয়াছে, এমন ভাবে) আঃ—শেষে একটা 'তব' হবে।

অক্‌টেভিয়াস্ : (ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়াছিল। এখন ক্ষুব্ধস্বরে) পন্‌টিয়াস অরুণাংশু—শেষে তুমিও ?

জাহেদা : (কৌতূহলী হইয়া) তুমিও বলে থামলে কেন, অক্‌টেভিয়াস নীলাদ্রী ?—তুমিও কি ?

অক্‌টেভিয়াস্ : (উত্তরটা হয়তো জাহেদা জাবেরীকেই দিতো ; কিন্তু মুখের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ মনে পড়িল জাহেদা একজন কৌতুক-অভিনেত্রী মাত্র। তাচ্ছিল্যভরে মুখ ফিরাইয়া পন্‌টিয়াস অরুণাংশুকে ক্ষুব্ধ স্বরে) আচার্য গ্রেগেরিয়াস শ্রীহর্ষ স্বরের একটা প্রবাহ আরম্ভ করেছিলেন, তুমি তাঁকে বাধা দিলে পন্‌টিয়াস্ অরুণাংশু। কিন্তু এখন উপায় ? হাত যে ওঁর নামছে না পন্‌টিয়াস্ !

নটবর হার্ডি : কেন ? ওঁর হাতে কি অস্থায়ীভাবে বাত হয়েছে ?

অক্‌টেভিয়াস্ : সে তোমরা বুঝবে না, কমেডিয়ান নটবর হার্ডি।

হরিপদ লরেল : বেশ তো ? আপনিই আমাদের বুঝিয়ে দিন—(ব্যঙ্গের সুরে) ট্র্যাজেডিয়ান অক্‌টেভিয়াস্ নীলাদ্রি !

অক্‌টেভিয়াস্ : (ক্ষুব্ধ স্বরে) পনটিয়াস্ অরুণাংশু ওঁর স্বরের প্রবাহে বাধা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেহের ছন্দময় গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। আচার্য গ্রেগেরিয়াস শ্রীহর্ষের হাত যেখানে ছিলো সেখানেই রয়ে গেল।

পন্‌টিয়াস্ : কিন্তু শেষে একটা 'তব' না দিলে যে ছন্দের মিল হয় না অক্‌টেভিয়াস্ নীলাদ্রি !

অক্‌টেভিয়াস্ : কিন্তু আচার্য গ্রেগেরিয়াসের হাত ! তোমার মিল কি সে হাতের চেয়ে বড়ো ? বলতে পারো পন্‌টিয়াস্ অরুণাংশু—ওঁর হাত যদি ঐভাবে আটকেই রইলো, তবে কার কি বা আসে যায় 'তব' যদি নাহি থাকে ইথে ? (মরিচা-ধরা দরজা বন্ধ করিতে বা খুলিতে গেলে যেরূপ 'ক্যাঁচ্' করিয়া শব্দ হয়, ঠিক সেইরূপ ক্যাঁচ্ করিয়া শব্দ হইয়া আচার্যের হাত নামিয়া আসে।)

গ্রেগেরিয়াস্ : তুমি ধন্য অক্‌টেভিয়াস্ নীলাদ্রি ! ভগীরথ গঙ্গা এনে পৃথিবীকে পাপমুক্ত করেছিলেন, তুমি তোমার বক্তব্যকে ছন্দায়িত করে আমাকে জড়তামুক্ত করেছো। আজ থেকে তুমি নট-ভগীরথ, অক্‌টেভিয়াস নীলাদ্রি।

অক্টেভিয়াস্ : আর আপনি আচার্য ?

নটবর হার্ডি ; উনি ? উনি নট-জড়ভরত। হা—হা—হা।

জনৈক দর্শক : (গানের সুরে) আমি ঢের সয়েছি······

জাহেদা : (নাচের ভঙ্গিতে) আর তো স'ব না······

অন্য দর্শক : বদ্-ইয়ার্কি তো অনেকক্ষণ হলো······

নটবর হার্ডি : (যেন নিজেও একজন দর্শক, আগের দর্শকের কথা শেষ করিতেছে মাত্র) এবার নাটক আরম্ভ হোক।

হরিপদ লরেল : কিন্তু প্রস্তাব···

গ্রেগেরিয়াস্ : বলুন।

নটবর : আমরা বিয়োগান্ত নাটকের অংশ-বিশেষ হয়ে থাকতে চাই না।

জাহেদা : আপনার যেহেতু লেজ নেই, লেজুড় হয়ে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

পন্‌টিয়াস : আমি বলি আচার্য, তবে তাই হোক। এঁদের অংশ গ্রহণে আমাদের ভারসাম্য দোতুল্যমান হয় মাত্র।

হরিপদ : তাহলে এখন আপনি আপনার ট্র্যাজেডিয়ানদের নিয়ে প্রস্থান করুন আচার্য, আমরা আমাদের নাটক আরম্ভ করি।

নটবর : সেই ভালো, আচার্য। আপনি আপনার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে প্রস্থিত হোন। নইলে আমাদের ছন্দহীন কৌতুক-অভিনয় যদি আবার আপনাকে বাতস্তব্ধ করে দেয়।

জাহেদা : মানে আপনার হাত যদি আবার আটকে যায়।

অক্টেভিয়াস্ : (ব্যাকুল স্বরে) চলুন আচার্য, আমরা যাই—

গ্রেগেরিয়াস্ : (উদাস কণ্ঠস্বরে) চলো পন্‌টিয়াস্, আমরা যাই—

(ট্র্যাজেডিয়ানদের লইয়া প্রস্থান-পথের দিকে অগ্রসর হন।)

জাহেদা : প্রস্থান দ্রুত হোক আচার্য, নইলে আবার যদি হাত—

পন্‌টিয়াস্ : (সুরে বাধা দিয়া) ব'লো না, ওগো অমন করে তুমি ব'লো না।

(আচার্যসহ ট্র্যাজেডিয়ানদের প্রস্থান।)

হরিপদ লরেল : তাহলে আমরা আরম্ভ করি। (হাত উপরে তুলিয়া

তালি বাজাইয়া) আবহ সঙ্গীত।

[সুরকার অরফিয়ুস্ বিশ্বাসের প্রবেশ]

অরফিয়ুস্ : আজ্ঞে, এসেছি।

হরিপদ : তুমি তো অরফিয়ুস্ বিশ্বাস। সরস্বতী ওয়াগ্‌নারের কি হলো ?

অরফিয়ুস্ : আজ্ঞে, ওঁকে ট্র্যাজেডিয়ানরা নিয়েছেন।

হরিপদ : কেন ?

অরফিয়ুস্ : আজ্ঞে, ওঁদের কিঞ্চিৎ হার্মনির প্রয়োজন, তাই।

নটবর হার্ডি : মানে ?

অরফিয়ুস্ : ওঁরা বললেন সরস্বতী ওয়াগ্‌নার নামটা বেশ হার্মনিয়াস, অরফিয়ুস্ বিশ্বাসটা নাকি তেমন হার্মনিক নয়।

হরিপদ : ঠিক আছে, আমাদের হার্মনির দরকার নেই।

জাহেদা : কিন্তু হার্মনি না হলে যে বেসুরো হবে।

হরিপদ : বেসুরোই তো আমাদের সুর, ডিস্‌কর্ড্‌ই তো আমাদের অ্যাকর্ড।

অরফিয়ুস্ : অ্যাকর্ড্ কাকে বলে ?

নটবর : (গম্ভীরভাবে) একজন লোকের নাম। যার নামে অ্যাকর্ডিয়ান বাজনা হয়েছে। (অরফিয়ুস্‌কে মুখ খুলিতে দেখিয়া) খবরদার, আর কোনো প্রশ্ন নয়—তা হলেই চাকরি যাবে।

অরফিয়ুস্ : আজ্ঞে না, প্রশ্ন নয়। জিজ্ঞেস করছিলাম, কোন্ সুর বাজাবো ?

হরিপদ : 'ঝির ঝির ঝির বরষা'—

জাহেদা : আর গান ?

নটবর : কেন ? (সুরে) 'চাঁদ যদি নীল হয়ে আসে'···

জাহেদা : কিন্তু ঝির ঝির ঝির বরষায় চাঁদ ? চাঁদ পাচ্ছেন কোত্থেকে যে নীল হয়ে আসবে ? কি রকম যেন কনট্রাডিক্‌সন্ হয়ে যাবে না ?

হরিপদ : নিশ্চয় হবে! কন্‌ট্রাডিক্‌সন্‌ই তো আমরা চাই। কমেডি মানেই তো কন্‌ট্রাডিক্‌সন্।

অরফিয়ুস্ : আজ্ঞে, ঠিক বুঝলাম না।

হরিপদ : বোঝার তো দরকার নেই। বাজাতে বলা হচ্ছে, বাজাও গে, যাও।

অরফিয়ুস্ : (গম্ভীর ভাবে) আজ্ঞে, না বুঝে আমি বাজাই না। (পরমুহূর্তেই অত্যন্ত নরম সুরে) কিন্তু ঠিক কথাটাই যে বলতে হবে তার কোনো মানে নেই। আপনি যা হোক একটা কিছু বলে দিন, আমি—হ্যাঁ বুঝেছি—বলে চলে যাচ্ছি।

নটবর : বেশ। বলো তো—কমেডি মানে কি ?

অরফিয়ুস্ : আজ্ঞে, হো হো করে হাসা।

হরিপদ : ঠিক আছে। আমি কলার খোসায় পা দিয়ে পড়লাম, আর তুমি হো হো করে হেসে উঠলে।

অরফিয়ুস্ : আজ্ঞে হ্যাঁ, হো হো করে হেসে উঠলাম।

নটবর : তাহলেই বুঝেছো, কনট্রাডিকসন্ মানেই কমেডি।

অরফিয়ুস্ : (বিগলিত ভাবে) আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝলাম।

হরিপদ : তাহলে এবার যাও বাবা, বাজাও গে যাও।

অরফিয়ুস্ : আজ্ঞে, যাই।

নটবর : এসো (অরফিয়ুস্ বিশ্বাস চলিয়া যায়। অল্পক্ষণ পরেই ভিতর হইতে তাহার কণ্ঠস্বর শোনা যায়—বাজাও—রাগ—ঝির ঝির ঝির বরষা। সঙ্গে সঙ্গে ঝির-ঝির-ঝির বরষা রাগে আবহ সঙ্গীত আরম্ভ হয়। জাহেদা জাবেরী—'চাঁদ যদি নীল হয়ে আসে, আমি তবে নীল হয়ে হাসি—গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করে। পিছন পিছন নটবর হার্ডিও নাচের ভঙ্গিতে চলিয়া যায়। হরিপদ লরেল মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়াইয়া আওয়াজ দেয়—কার্টেন !

[যবনিকা সরিতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে হরিপদ লরেলও প্রস্থান করে। পর্দা সরিয়া যায়। মঞ্চের পিছন দিক অন্ধকার। মঞ্চের সম্মুখভাগে পাদপ্রদীপের সহিত সমান্তরাল অবস্থায় নিচু লম্বা একটি বেঞ্চ। বেঞ্চটি টেবিল-চাপা দিয়া চাপা। এখানে ঐটিই টেবিল। টেবিলের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইখানি চেয়ার। টেবিলের উচ্চতা

হইতে অল্প একটু উঁচু। চেয়ারে বসিয়া নায়করূপে নটবর হাড়ি ও নায়িকারূপে জাহেদা জাবেরী। তাহাদের পোশাকের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। দুই পাশ হইতে দুইটি স্পট্‌লাইটের আলো তাহাদিগকে আলোকিত করিয়াছে। টেবিলের বাম ও দক্ষিণপার্শ্বের সামান্য অংশ ঐ আলোয় আলোকিত, কিন্তু মধ্যস্থলে কোনো আলো আসিয়া পড়ে নাই। জাহেদা জাবেরীর হাতে খুব ছোটো এক কাপ কফি। নটবর হাড়ির কফি টেবিলের উপর নামানো]

জাহেদা : খাওয়ার পর খুব ছোট্ট একটু কফি খেতে আমার কিন্তু প্রচণ্ড ভালো লাগে। নাও, তোমার কফি যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

নটবর : (কফির পেয়ালা তুলিয়া লইয়া) আর কি কি জিনিস তোমার প্রচণ্ড ভালো লাগে, জাহেদা ?

জাহেদা : (আর একটি জিনিসের নাম মনে পড়িয়া যাইতে জিভে শব্দ করিয়া) ওঃ—সে আর একটা জিনিস—বুঝলে কিনা সেটাও আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে !

নটবর : কি বলো তো !

জাহেদা : চুনো মাছের বাসি অম্বল। আহা—হা—সে যে কী প্রচণ্ড ভালো !

নটবর : আশ্চর্য ! কী প্রচণ্ড ভাবেই না তুমি বেঁচে আছো জাহেদা ! আচ্ছা, আজ কি মঙ্গলবার ?

জাহেদা : না। আজ তো বুধবার। কেন বলো তো ?

নটবর : মঙ্গলবার হলে কি প্রচণ্ড ভাবেই না তোমাকে ভালবাসতাম। আচ্ছা কাল ? কাল কি মঙ্গলবার হতে পারে ?

জাহেদা : কাল ? কাল তো——নটবর, ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই হাসি ঠাট্টার নয়।

নটবর : সে কি ! আমি কি বলেছি এটা হাসি ঠাট্টার ব্যাপার। কাল যদি মঙ্গলবার হতো, তাহলে তোমাতে আমাতে কি ভালো বাসাবাসিই না হতো।

জাহেদা : (ব্যাকুল স্বরে) তুমি কি আমাকে আর ভালবাসো না নটবর ?

নটবর : তুমি কি প্রচণ্ড রকম মেয়েছেলে জাহেদা ! নেশা না করলে কি বলা যায়—তোমাকে ভালবাসি কি না বাসি ? দু-এক ঢোঁক পেটে পড়ুক—এক্ষুনি বলে দিচ্ছি—তোমাকে আমি চাঁদের আলোর মতো ভালবাসি। (অন্তরাল হইতে 'ঝির-ঝির-ঝির-বরষা' রাগে বাজনা ও 'চাঁদ যদি নীল হয়ে আসে, আমি তবে নীল হয়ে হাসি' গান শোনা যায়।)

জাহেদা : (মদ্যপানের ইঙ্গিত করিয়া) আমার কিন্তু মনে হয়—আজকাল তুমি বড্ড বেশি খাচ্ছ।

নটবর : খাচ্ছি তো নিশ্চয় ! তবে হ্যাঁ, হয় বড্ড বেশি খাচ্ছি, আর না হয় খুব কম খাচ্ছি। বলা খুব শক্ত, বুঝলে। আমি দেখছি, সব সময়েই এই চাওয়ার ব্যাপারে আমার একটু কম-বেশি হয়ে যায়। হয় যা আছে তার চেয়ে বেশি চাই, আর না হয় একটু কম। কোথায় যেন কি রকম একটু গণ্ডগোল আছে, বুঝলে কি না (হঠাৎ কি যেন মনে পড়িয়া গিয়াছে, এই ভাবে) আচ্ছা, ভালো কথা—তোমার হাতের ক'টা আঙুল বলো তো ?

জাহেদা : বাঃ কি করে বলবো ?

নটবর : কেন ?

জাহেদা : ও আমার কি রকম গণ্ডগোল হয়ে যায়। একটা হাত দিয়ে আর একটা হাতের আঙুল গুনি, সব সময়েই পাঁচটা করে বাদ পড়ে যায়। কিন্তু কেন বলো তো ?

নটবর : বাঃ কেন মানে ? সারা জীবনই তো আমি ছাত্র, আমাকে তো একটা কিছু জানতে হবে। না জেনে তো আমার রেহাই নেই !

জাহেদা : (দুই হাতে দশটি আঙুল বাড়াইয়া দিয়া) বেশ তো, গুনে নাও।

নটবর : না, থাক—কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে—(একটু ভাবিয়া) আমি ছবি আঁকি। মানে, বাজারে আমার খুব নাম। আর তুমি (আবার একটু ভাবিয়া) তুমি আমাকে ভীষণ ইম্প্রেস করেছ। আমি তোমাকে নিয়ে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ আর্ট করছি।

জাহেদা : মানে ?

নটবর : মানে একটা ছবি আঁকছি, যার প্রকার আছে কিন্তু আকার নেই।

জাহেদা : সেকি !

নটবর (উত্তেজিত হইয়া) হ্যাঁ— (আঙুলের ইশারায় বুঝাইবার চেষ্টা করে) এই ধরো ছবিটা। এ পাশে কমলালেবুর কোয়ার মতো ছ'টা চোখ—একটু তলায় এক ফালি টয়লেট পাউডারের রং—এধারে ছুটো আঙুলে ধরা শাড়ীর পাতলা আঁচল—আর তলায় নাম—নারী ও নাইলন্। (হঠাৎ জাহেদাকে কাঁদিয়া ফেলিতে দেখিয়া) কি হলো ?

জাহেদা : (অশ্রুজড়িত ও অভিমান ভরা কণ্ঠস্বরে) ওগো—এতদিন ঘর করার পর আমি তোমার কাছে মোটে এইটুকু ! শুধু ছ'টা চোখ, শুধু একফালি পাউডারের রং। কেবল ছুটো আঙুল, শুধু একফালি নাইলন্ !

নটবর : (ব্যস্ত হইয়া ব্যাকুল স্বরে) আরে না না—কে বললে ? আমি কি ছবি আঁকি ? আমি তো স্বরোদ বাজাই ! আমার নাম নটবর মৃদঙ্গ। (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) আমি বাগেশ্রী আর আভোগী-কানাড়া মিশিয়ে নতুন রাগ সৃষ্টি করেছি—বাগী-আভোগী !

জাহেদা : (চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়াছে। বিস্ময়-মুগ্ধ দৃষ্টিতে নটবরের দিকে তাকাইয়া আছে, যেন বিরাট এক প্রতিভা তাহার সামনে। নটবরের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে আসিতে) শুনছো, তুমি আজকাল বড্ড পরিশ্রম করছ। একটু বিশ্রাম নাও। চলো আমরা বাগানে বেড়িয়ে আসি। সেখানে, শিলাতলে উপবেশন করে তুমি আমাকে একটু বাজনা বাজিয়ে শোনাবে !

নটবর : (জাহেদাকে বাধা দিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়া) না-না—আর কাছে এগিয়ে এসো না ! ভুলে যেও না নারী, আমি

আঁকিয়ে নই, আমি বাজিয়ে নই—(প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে সঙ্গে
• জাহেদা জাবেরিও এক পা এক পা করিয়া পিছাইয়া যাইতেছিল।
শেষে হতভম্ব অবস্থায় ধপ করিয়া নিজের চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া)
তবে তুমি কি ?

নটবর : (উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) আমি একজন মানবতাবাদী সমাজতন্ত্রী। (এক পাশে মুখ ফিরাইয়া) স্বগত— কিন্তু জনতা ? জনতাকে আমি ঘৃণা করি—(বলিয়াই কর্ণার্জুনের হাসি হাসিয়া দেয়)—হা—হা—হা।—(পরমুহূর্তেই বসিয়া পড়িয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে) কিন্তু জাহেদা, গায়ে গরম-জামা পরোনি কেন ? তুমি যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছ ! এখন কি হবে ?

জাহেদা : মোটেই না ! আমি মোটেই ঠাণ্ডা নই ! বিশ্বাস না হয়— গায়ে হাত দিয়ে দেখ !

নটবর : আমি বলছি তুমি ঠাণ্ডা হয়ে গেছ। তুমি এক কাজ করো জাহেদা, লক্ষ্মীটি ! একটা শাল গায়ে দিয়ে গুটি-সুটি বুড়ী হয়ে বসো। কেমন ?

জাহেদা : (ক্রুদ্ধ স্বরে) না, কক্ষনো না ! আমি একটুও ঠাণ্ডা হয়ে যাইনি। উঃ আমি বুড়ী হয়ে বসবো, আর উনি যৌবন নিয়ে ভেসে বেড়াবেন !

নটবর : যৌবন ? কোথায় যৌবন দেখলে জাহেদা ? আমি যে জ্ঞানবৃদ্ধ—আমি যে দার্শনিক ! ওপরে এই শান্ত নির্লিপ্ত ভাব— কিন্তু তোমার কোনো ধারনা নেই জাহেদা, ভেতরটা আমার কত চঞ্চল। সেখানে শুধু কি-কেন-কবে-কোথায়—শুধু জ্ঞান-জিজ্ঞাসা ! ও কি ! তুমি হাঁ হয়ে গেলে জাহেদা ! (জাহেদা সত্যই হাঁ হইয়া নটবরের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলো) দেখো, যেন ভয়ে চেঁচিয়ে উঠো না, আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে যাবে ! কিন্তু···

জাহেদা : আবার কিন্তু কেন ?

নটবর : ভাবছি, তুমি যদি অভিনেত্রী হয়ে যাও জাহেদা···

জাহেদা : সে কি ? আমি অভিনেত্রী হবো কি করে ? আমি তো

অভিনয় করতে জানি না।

নটবর : আরে ছিঃ। অভিনয় করতে জানতে হয় নাকি! তুমি ধরে নাও তুমি অভিনেত্রী।

জাহেদা : বেশ, ধরে নিলাম। কিন্তু বাকিটা ?

নটবর : বাকিটা ? আমি তোমায় শিখিয়ে নেবো। আমি তোমাকে পরিচালনা করবো। আমি তোমাকে হাসতে শেখাবো, মরতে শেখাবো···

জাহেদা : (গালে হাত দিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে নটবরের মুখের দিকে তাকাইয়া) সত্যি! তারপর ?

নটবর : তারপর ? তারপর তুমি তারকা! রোজ সন্ধ্যের সময়—আর সন্ধ্যে কেন—বিকেল পাঁচটার মধ্যেই তুমি তারা হয়ে আকাশে ফুটে উঠবে। তলায় দাঁড়িয়ে লোকে খালি হাততালি দিয়ে যাবে! শুধু তোমার ঘরভাড়াটা আমাকে দিতে দিও।

জাহেদা : (হাসিয়া ফেলিয়া) সত্যি বলছি—টমাটোর চাটনি আর তুমি—এ দুটোই আমি বড্ড ভালবাসি।

নটবর : (বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে জাহেদার মুখের দিকে তাকাইয়া) বাঃ চমৎকার।

জাহেদা : কি হলো ?

নটবর : জাহেদা, আমি পেয়ে গেছি—

জাহেদা : কি পেয়ে গেছ ?

নটবর : এমন একটা কিছু, যা মানবসভ্যতার দু'হাজার বছরেও এতটুকুও বদলায়নি!

জাহেদা : কোথায় পেলে ?

নটবর : তোমার মধ্যে। তোমার সেই আদিম বুনো শুয়োরের মতো খাই-খাই প্রকৃতিটা আজ দু'হাজার বছরে এতটুকুও বদলায়নি, জাহেদা। তাইতো এক্ষুনি আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুরি কাঁটা দিয়ে সসেজ করে তোমায় খেয়ে ফেলি!

জাহেদা : কিন্তু এদিকে আমার যে মুশকিল!

নটবর : কেন, মুশকিল কিসের ?

জাহেদা : আজ ক'দিন ধরেই যে টমাটোর চাটনি আমার ভালো লাগছে না।

নটবর : বেশ তো—চাটনি ভালো না লাগে, তরকারি করে খাও।

জাহেদা : কিন্তু সাধারণ তরকারি তো আমার খেতে ইচ্ছে করছে না, নটবর। যে শাক লোকালয় থেকে দূরে নীরবে নিভৃতে হচ্ছে, আমার যে সেই শাকের তরকারি খেতে ইচ্ছে করছে !

নটবর : তবে ব্যাঙের ছাতার তরকারি খাও জাহেদা।

জাহেদা : ঠিক বলেছ। ব্যাঙের ছাতার তরকারিই খেতে হবে। তুমিও খাবে তো নটবর ?

নটবর : আমি ? আমার আর কিছুতে রুচি নেই জাহেদা। হঠাৎ আমার মনে হচ্ছে—আমি একজন সমালোচক, চোখ দুটো আমার বাঁকা।

জাহেদা : একটা কথা কিন্তু আমার বার বার মনে হয়, নটবর—

নটবর : কি বলো তো ?

জাহেদা : তুমি আমাকে ভালবাসো না—আমাকে নিয়ে খানিকটা মজা করো।

নটবর : আমি কিন্তু চাঁদের আলোর দিব্যি করে বলতে পারি জাহেদা।

জাহেদা : কিন্তু আজ তো চাঁদ নেই নটবর।

নটবর : কোনোকালেই তো ছিলো না জাহেদা। তোমাকে ভালবাসার জন্যে, আর দিব্যি করবার জন্যে ওটা আমদানী করেছি। কিন্তু ভালবাসার কথায় আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল, জাহেদা।

জাহেদা : কি বলো তো ?

নটবর : আমি সত্যি কি ভালবাসি জানো, জাহেদা ?

জাহেদা : কি বলো তো ?

নটবর : খেতে। ভালো ভালো খেতে আমি বড্ড ভালবাসি, জাহেদা।

জাহেদা : (বিরক্ত হইয়া) বেশ, খেতে ভালবাসো তো গোগ্রাসে গেলো গে যাও ! তখন থেকে এতো কথা বলছো যে, ঘড়ির টিক্-টিক্ শব্দটা পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি না ! অথচ সময় যাচ্ছে কি

না-যাচ্ছে, সেটা আমার জানা একান্ত দরকার !

নটবর : সময় ঠিকই চলে যাচ্ছে, জাহেদা—ঘড়ি ঠিকই টিক্-টিক্ করে যাচ্ছে। কিন্তু মজার ব্যাপারটা কি জানো, জাহেদা ?

জাহেদা : (কৌতূহলী হইয়া) কি বলো তো ?

নটবর : (মৃদু হাসিয়া) তুমি যদি মশা হতে জাহেদা তবে কবে মরে ভূত হয়ে যেতে, কিন্তু আমি যদি তোতাপাখী হতাম, তবে হাজার বছর ধরে শুধু কথা কয়ে যেতাম। (আচার্য গ্রেগেরিয়াস শ্রীহর্ষের প্রবেশ) কি আচার্য ! আপনি এ সময়ে এখানে ?

আচার্য : আর অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য আমার নেই।

নটবর : কিন্তু ধৈর্য যে ধারণ করতেই হবে আচার্য, আমাদের অভিনয় যে এখনও শেষ হয়নি।

আচার্য : তোমাদের তরল অভিনয় আমার গুরুভার ধৈর্যকে ধারণ করতে সমর্থ নয়, নটবর হার্ডি।

জাহেদা : কিন্তু আচার্য, আপনার চোখের পাতা তো পড়ছে না। আপনি বোধ হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছেন আচার্য—আপনি ঘুমোতে ঘুমোতে ভুল করে এখানে চলে এসেছেন।

আচার্য : আমি ঘুমোই না, জাহেদা। মহা ট্র্যাজেডির মহানায়ককে আমায় পরিচালনা করতে হয়। তরলমতি বালকের মতো চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে পড়া কি আমার সাজে, নটবর ! আমার চোখে ঘুম কই ? (চোখ বুজিয়া) জাগো মহাকাল—জাগো !

নটবর : (ব্যস্ত হইয়া দর্শকদের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া) চোখ চেয়ে দেখুন আচার্য—আপনার সামনে দর্শকেরা বসে রয়েছেন। আপনি আচার্য হয়ে তাঁদের রসোপলব্ধিতে বাধা দিচ্ছেন। তাঁরা আপনাকে মদিরাচ্ছন্ন মনে করতে পারেন, আচার্য !

আচার্য : (পূর্ববৎ চক্ষু বুজিয়া) জাগো মহাকাল—জাগো।

জাহেদা : দিন দিন আপনি শিশুর মতো আদুরে হয়ে পড়ছেন আচার্য। আপনি একটু অপেক্ষা করুন—আমাদের দৃশ্যটা শেষ হোক।

আচার্য : (চোখ খুলিয়া) বলেছি তো অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য আমার

নেই (চোখ বুজিয়া) মহাকাল—তুমি জাগো !

নটবর : কিন্তু এ দৃশ্য যে আমাদের জন্যে সাজানো।

আচার্য : তাতে কি হয়েছে ! তোমাদের জন্যে সাজানো দৃশ্যে আমরা অভিনয় করে যাবো। কৌতুকের পটভূমিকায় বিষাদের অভিব্যক্তি ! এখানেই তো ট্র্যাজেডির সার্থকতা ! (চোখ বুজিয়া) জাগো মহাকাল, জাগো !

জাহেদা : কিন্তু আচার্য, আপনি মনে করে দেখুন—আমাদের পরে আপনার অভিনয় করার কথা।

আচার্য : (চোখ খুলিয়া) সেই জন্যেই তো এলাম। পরেরটা আগেই করে দিয়ে যাবো। জীবনের মঞ্চে শুধু আসা-যাওয়া নিয়ে কথা। পূর্বাপরের তো কোনো ক্রম নির্ধারিত নেই ! (চোখ বুজিয়া) মহাকাল—তুমি জাগো !

জাহেদা : (চিৎকার করিয়া নিজেদের পরিচালককে ডাকে) পরিচালক হরিপদ লরেল !

আচার্য : (চোখ বুজিয়া) কোনো লাভ নেই। তাঁকে বন্ধনী-বন্ধনে আবদ্ধ করে অন্যত্র প্রেরণ করেছি। জাগো মহাকাল, তুমি জাগো !

নটবর : মহাবিদ্রোহী আমি রণক্লান্ত। তর্ক করে কোনো লাভ নেই জাহেদা, চলো—আমরা যাই।

জাহেদা : সেই ভালো। চলো, আমরা যাই। (জাহেদার প্রস্থান।)

নটবর : (জাহেদার পিছন পিছন নটবরও প্রস্থান করিতেছিল। হঠাৎ কি মনে করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। নিজের মনে) হ্যাঁ, যাবো—নিশ্চয় যাবো ! কিন্তু কোথায় যাবো ? কেন, বাগানে। সেখানে গিয়ে চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙে দেবো। কিন্তু চাঁদও যদি আমাকে ক্লান্ত করে তোলে ? তাহলে জাহেদাকে খুঁজে বার করবো। তাকে আদর করে হেইডি-হাই বলে ডাকবো। কিন্তু···জাহেদা যদি শিলাতলে উপবেশন করে আমাকে বিরক্ত করে তোলে ? তোলে তুলুক। আমি হেইডি-হাই, হেইডি-হাই বলে আনন্দ পাবো···(হেইডি-হাই, হেইডি-হাই বলিতে বলিতে প্রস্থান।)

আচার্য : কোথায় সরস্বতী ওয়াগ্‌নার। এবার আমাদের দৃশ্যকাব্য আরম্ভ হবে, তুমি তোমার সঙ্গীত আরম্ভ করো!

[সরস্বতী ওয়াগ্‌নারের প্রবেশ। হাতে বেহালা]

সরস্বতী : (বেহলায় ছড় টানিয়া সুর তুলিতে তুলিতে) কোন্ সুর বাজাবো আচার্য ?

আচার্য : নাইন্থ্ সিম্ফনি, তিন তাল। (সরস্বতী বাজাইয়া দেখাইলে মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া) রাগ—ভৈরবী-সোনাটা। (সরস্বতী মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া বেহালা বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান করে।)

আচার্য : (তালি বাজাইয়া) পনটিয়াস্ অরুণাংশু, অক্‌টেভিয়াস্ নীলাদ্রি।

[দুই দিক দিয়া দুইজনের একসঙ্গে প্রবেশ]

দুইজন : (একসঙ্গে) আমরা রূপসজ্জায় ব্যস্ত ছিলাম, আচার্য।

আচার্য : এখন নাটক আরম্ভ করো।

অক্‌টেভিয়াস : (বিস্মিত হইয়া) কিন্তু আচার্য, আমাদের দৃশ্যকাব্যের অভিনয় তো এখন নয়, আরও পরে—

পন্‌টিয়াস : আপনি কি আমাদের সঙ্গে পরিহাস করছেন আচার্য ?

আচার্য : মহাকাল আমাদের সঙ্গে পরিহাস করছেন, পন্‌টিয়াস। তাই আমরা পরের অভিনয় আগে করে মহাকালকে পরিহাস-বিজল্পিতম করে দেবো।

অক্‌টেভিয়াস : কিন্তু আচার্য, দৃশ্যপট ?

আচার্য : আমার নাটকে আমিই দৃশ্যপট, অক্‌টেভিয়াস। (পিছন দিকে প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় রাখা একটি উঁচু আসনের উপর আলো আসিয়া পড়িল। আচার্য দৃশ্যপটরূপে আসন গ্রহণ করিলেন।)

পন্‌টিয়াস : আমরা ভেবেছিলাম কৌতুক অভিনয়ের এই এক ঘণ্টা সময় আমরা পাবো।

অক্‌টেভিয়াস : ভেবেছিলাম, এই এক ঘণ্টায় কোনো একটা মহৎ চিন্তায় মনকে আমরা উদ্বুদ্ধ করে তুলবো।

পন্‌টিয়াস : তারপর অভিনয়ের সময় হালকা লারেলাপ্পা রাগে তাকে ম্রিয়মান করে প্রকাশ করবো।

অক্‌টেভিয়াস : আমরা স্থির করেছিলাম আচার্য—এ আমরা করবই। চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন-ক্রন্দন।

পন্‌টিয়াস্ : কিন্তু আরম্ভতেই রূপসজ্জার অবসর শেষ হয়ে গেল। পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠে নাটক আরম্ভ করে দিয়ে গেল আচার্য।

অক্‌টেভিয়াস : কিন্তু এ সময় অভিনয় করবার কল্পনায় আমরা নিজেদের কল্পিত করিনি আচার্য !

পন্‌টিয়াস : মঞ্চে কৌতুক-নাট্যের সামগ্রী রয়েছে, আচার্য।

অক্‌টেভিয়াস : বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্যের জন্য আমাদের একটি প্রাচীরের প্রয়োজন।

পন্‌টিয়াস : অন্ততঃপক্ষে একটি প্রাচীরের প্রয়োজন, আচার্য।

আচার্য : তোমরা দেখছি অভিনয় করতে প্রস্তুত নও। বেশ, তবে প্রস্থান করো। আমি নিজের নাটক নিজেই অভিনয় করবো। তোমাদের কাউকে প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই নাটক, নিজেই নট—নিজেই অভিনয়, নিজেই নটী।

দুইজন : (একসঙ্গে) আমরা প্রস্তুত, আচার্য।

পন্‌টিয়াস : মনে করি আমরা গোয়ালা।

অক্‌টেভিয়াস : গোয়ালভরা আমাদের গরু।

পন্‌টিয়াস : এই আমাদের জমি।

অক্‌টেভিয়াস : এই জমিতে আমাদের গরু বিচরণ করে।

পন্‌টিয়াস : (চিৎকার করিয়া) স্মারক, আমাদের মনে করিয়ে দাও— আমরা ভুলে গেছি।

অক্‌টেভিয়াস : (চিৎকার করিয়া) তারপর স্মারক, তারপর ?

আচার্য : (স্মারকরূপে) আর গিলিতচর্বণ করে ঘাস খায়।

দুইজন : (এক সঙ্গে) আর গিলিতচর্বণ করে ঘাস খায়।

একতান (পনটিয়াসের ও অক্‌টেভিয়াসের)

ধীর স্থির

আমাদের গরু ঘাস খায়।

ধীর স্থির

তারা পুকুরের ধারে এগিয়ে আসে।

ধীর স্থির

তারা বিচরণ করে জলপান করে।

পন্‌টিয়াস : আমার গরুর গাত্রচর্ম কি সুন্দর !

অক্‌টেভিয়াস : আমার গরুর গলদেশের তলদেশ কী মনোরম।

আচার্য : (স্মারক রূপে) বিয়োগান্ত নাটকে বিভাগ আনো পন্‌টিয়াস অরুণাংশু। গভীর বেদনায় নাটককে শোনপাংশু করে তোলো অক্‌টেভিয়াস নীলাদ্রি।

পন্‌টিয়াস্ : আমি আমার জমি ভাগ করে নিতে চাই অক্‌টেভিয়াস্।

অক্‌টেভিয়াস : তাই হোক্ পন্‌টিয়াস্। (টেবিল-চাপাটি লইয়া আসিয়া ভাঁজ করিয়া মাঝখানে বসাইয়া দিলো।) এই প্রাচীর আমাদের সীমানা। (আচার্য উঠিয়া চেয়ার দুইটি একপাশে সরাইয়া রাখিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। পন্‌টিয়াস ও অক্‌টেভিয়াস, দুইজনে ধরাধরি করিয়া টেবিলটি একপাশে সরাইয়া রাখিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল পন্‌টিয়াসের হাতে একটি থলি। থলিতে কয়েকটি রাংতামোড়া গোলক। অক্‌টেভিয়াসের হাতে একটি জলপূর্ণ জলধার।)

পন্‌টিয়াস : (নিজের সীমানার মধ্যে আসিয়া গোলকগুলির দু-একটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া, সেইগুলির দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতে দেখিতে চিৎকার করিয়া) আমার জমিতে হীরের খনি পড়েছে অক্‌টেভিয়াস্ : দেখ, কতো বড়ো বড়ো হীরে। (কয়েকটি গোলক তুলিয়া দেখাইয়া) তুমি আমার জমিতে আর এসো না অক্‌টেভিয়াস্—মনে রেখো তোমার আমার মধ্যে এখন পাঁচিল !

অক্‌টেভিয়াস্ : কিন্তু তোমার জমিতে এক ফোঁটা জল নেই পন্‌টিয়াস্,

সমস্ত জল আমার জমিতে। (জলাধারটি তুলিয়া দেখাইয়া) দেখ, কতো বড়ো জলাশয় আমার জমিতে, আর কী স্ফটিক-স্বচ্ছ তার জল। তুমিও আমার জমিতে আর এসো না পন্‌টিয়াস্—মনে রেখ তোমার আমার মধ্যে এখন পাঁচিল!

দুইজন : (একসঙ্গে) ভাগ্যে পাঁচিল আমরা তুলেছিলাম, আহা, আমাদের পাঁচিলটি কী সুন্দর!

নটবর : (অন্তরাল হইতে) হেইডি-হাই···হেইডি-হাই!

জাহেদা : (অন্তরাল হইতে) আঃ! কেন বিরক্ত করছ। কতবার বলছি, আমার নাম হেইডি-হাই নয়, আমার নাম জাহেদা জাবেরী। তবু পেছন পেছন আসে! বলছি না আমাকে একটু একা থাকতে দাও! লক্ষ্মীটি! (হেইডি-হাই ··হেইডি হাই)। আবার ঐ নামে ডাকে! বলছি না, আমার নাম জাহেদা জাবেরী! (কণ্ঠস্বর মিলাইয়া যায়।)

অক্‌টেভিয়াস্ : আমার কিন্তু এ নাটক ভালো মনে হচ্ছে না পন্‌টিয়াস্। তোমার আমার মধ্যে পাঁচিল, এ আমার কী রকম বিশ্রী লাগছে পন্‌টিয়াস্। এসো আমরা এ নাটক বন্ধ করে দিই!

পন্‌টিয়াস্ : (রাংতা-মোড়া একটি গোলক হাতে তুলিয়া দেখিতে দেখিতে) তবে কি নাটক করবো অক্‌টেভিয়াস্?

অক্‌টেভিয়াস্ : কেন আমাদের সেই গো-নাটক। তোমার আমার গোরু আছে, তারা তোমার ক্ষেত্রে বিচরণ করে······

পন্‌টিয়াস্ : (গোলকের কথা ভুলিয়া গিয়া) তারা বিচরণ করে, আর গিলিত-চর্বণ করে ঘাস খায়!

অক্‌টেভিয়াস্ : (পন্‌টিয়াসের মনে পড়িয়াছে দেখিয়া উল্লসিত কণ্ঠস্বরে) হ্যাঁ ঠিক! তারা গিলিত-চর্বণ করে ঘাস খায়! কিন্তু হঠাৎ একদিন তারা মনে করলো, তারা বোধহয় গোয়ালা······

পন্‌টিয়াস্ : আর···কিন্তু কি বলতে হবে আমার তো মনে পড়ছে না। (চিৎকার করিয়া) আমাকে মনে করিয়ে দাও স্মারক! কি বলতে হবে আমি ভুলে গেছি!

আচার্য : (স্মারক রূপে) আর আমরা বোধহয় গোরু।

পন্‌টিয়াস্ : আর আমরা বোধহয় গোরু (হঠাৎ গোলকের দিকে দৃষ্টি পড়িতে) কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তুমি কৌশল করছো অক্‌টে-ভিয়াস্! (ক্রূর হাসি হাসিয়া) কিন্তু তুমি আমাকে যতটা বোকা ভাবো, ততটা বোকা আমি নই! বুঝেছি আমি অক্‌টেভিয়াস্— তুমি চেষ্টা করছো, কি করে আমার জমিতে আসতে পারো। (মুখের সামনে বুড়ো আঙুল নাড়িয়া) কিন্তু তা হবে না অক্‌টে-ভিয়াস্! এ পাঁচিল তোমাকে আমাকে তফাৎ করে দিয়েছে! এ সমস্ত হীরে এখন আমার!

অক্‌টেভিয়াস্ : (ব্যাকুলস্বরে) তুমি বিশ্বাস করো পন্‌টিয়াস্, এ নাটক খুব খারাপ নাটক। এসো আমরা এর অভিনয় বন্ধ করে দিই!

পন্‌টিয়াস্ : (গোলকের দিকে দেখিতে দেখিতে) আমি তোমার কৌশল বুঝেছি অক্‌টেভিয়াস্। আমার জমি নিয়ে আমি আছি, তোমার জমি নিয়ে তুমি থাকো অক্‌টেভিয়াস্!

অক্‌টেভিয়াস্ : বেশ, তবে তাই হোক।

পন্‌টিয়াস্ : (এক দৃষ্টিতে গোলকের দিকে তাকাইয়াছিল। হঠাৎ দেহের ভিতর কি এক অস্বস্তি হইতে অক্‌টেভিয়াস্‌কে) কিন্তু অক্‌টেভিয়াস্, জল তো সব তোমার দিকে?

অক্‌টেভিয়াস : (যেন কিছুই জানে না এমন ভাবে) হ্যাঁ, কেন?

পন্‌টিয়াস্ : না—মানে জলের কথাটা আমি একেবারেই ভাবিনি।

অক্‌টেভিয়াস্ : ও—ভাবনি বুঝি—

পন্‌টিয়াস্ : মানে? কি বলতে চাও তুমি?

অক্‌টেভিয়াস্ : বলতে আমি কিচ্ছু চাই না পন্‌টিয়াস্। তবে এতক্ষণ হীরে নিয়ে তুমি তোমার খেলা খেললে, এবার জল নিয়ে আমি আমার খেলা খেলবো।

পন্‌টিয়াস্ : তার মানে? আমার জল-তেষ্টা পেয়েছে, তুমি আমাকে জল দেবে না?

অক্‌টেভিয়াস্ : না, জল দেবো কেন? আমি তুমি হলে জল দিতাম।

কিন্তু আমি তো আর তুমি নই। কাজেই তোমার তেষ্টা পেয়েছে, পাক। আমি তোমায় জল দেবো কেন? জল আমার এখানে যথেষ্ট—আমার নিজের তেষ্টা পেলে নিজেকে জল দিতাম।

পন্‌টিয়াস্ : এসব কি বলছো অক্‌টেভিয়াস! তুমি—আমি। দু-দিন আগে পর্যন্ত তো আমরা একই ছিলাম। আজই না হয় আমরা আলাদা হয়েছি—আজই না হয় আমাদের মধ্যে পাঁচিল উঠেছে। দু-দিন আগে তো এ পাঁচিল ছিলো না। এসো আমরা এ পাঁচিল ভেঙে ফেলি।

অক্‌টেভিয়াস্ : তাই একবার ভাঙবার চেষ্টা করে দেখ না।

পন্‌টিয়াস্ : তুমি তো লোক ভালো নয় অক্‌টেভিয়াস। তাইতো বলি—পাঁচিল তোলার জন্যে তোমার এত আগ্রহ কেন?

অক্‌টেভিয়াস : তুমি ভুল করছ পন্‌টিয়াস্। সে বরং তোমার বলতে পারো।

জাহেদা : (অন্তরাল হইতে) দেখেছ নটবর, দিন দিন তুমি কি ভীষণ মোটা আর কি ভীষণ বোকা হয়ে যাচ্ছ? একটা জামা পরেছ— তাতেও বোকা বোকা গন্ধ। জামাটা বদলে ফেল নটবর—(গান গায়) 'চাঁদ যদি নীল হয়ে আসে'—(কণ্ঠস্বর মিলাইয়া যায়।)

পন্‌টিয়াস্ : তার মানে? তুমি বলতে চাও, তোমার কোনো আগ্রহ ছিলো না?

অক্‌টেভিয়াস্ : না

পন্‌টিয়াস : ছিলো না? কিন্তু তাই যদি না থাকবে—(হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া) আশ্চর্য! মজা দেখছ অক্‌টেভিয়াস, আমরা ভুলে গেছি যে আমরা নাটক করছি। নইলে, আমার তেষ্টা পেলে তুমি জল দেবে না—এ হতে পারে কখনও?

অক্‌টেভিয়াস্ : আমি তো গোড়া থেকেই জানতাম। তুমিই এটাকে সত্যি বলে ধরে নিয়েছিলে। (দুইজনে পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসে) কিন্তু—(চিৎকার করিয়া) স্মারক, কি বলতে হবে মনে পড়ছে না—

আচার্য : (স্মারকরূপে) কিন্তু সত্যিই কি তাই পন্‌টিয়াস ?

অক্‌টেভিয়াস্ : (থামিয়া গিয়া সংশয়পূর্ণ কণ্ঠস্বরে) কিন্তু সত্যিই কি তাই পন্‌টিয়াস্ ?

পন্‌টিয়াস : তার মানে ? অক্‌টেভিয়াস্ !

অক্‌টেভিয়াস্ : কি করে জানবো বলো ? হয়তো তুমি কৌশল করছ ! এটা তোমার একটা চালাকি !

পন্‌টিয়াস্ : মুশকিল তো ঐখানেই ! জানার কোনো উপায়ই নেই। কিন্তু অক্‌টেভিয়াস, আমাদের দু'জনের একজনকে তো এগিয়ে যেতেই হবে। নইলে এ নাটকের শেষ তো কোনোদিনই হবে না। তুমি একটু ভাববার চেষ্টা করো অক্‌টেভিয়াস্। একটা ভাঁজ করা কাপড় এনে পাঁচিল করলাম, আর আজ সেটাই আমাদের মধ্যে পাঁচিল হয়ে উঠল ! তোমার আমার এতদিনের জানাশোনা। কিন্তু আজ তুমি আমাকে চেনো না, আমিও তোমাকে চিনি না।

অক্‌টেভিয়াস্ : (ব্যাকুল স্বরে) না না—এ হতে পারে না পন্‌টিয়াস। এসো, আমরা এ কাপড়ের পাঁচিল দূরে সরিয়ে দিই। তুমি আমার এদিকে চলে এসো পন্‌টিয়াস্—আবার আমরা দু'জনে আগের মতো হয়ে যাই।

পন্‌টিয়াস্ : (অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ থামিয়া গিয়া) কিন্তু— এ সবই যদি তোমার অভিনয় হয় অক্‌টেভিয়াস ? তোমার ওখানে গেলে, তুমি যদি আমাকে জলের সঙ্গে বিষ দিয়ে হত্যা করো ?

অক্‌টেভিয়াস্ : এ কি বলছ তুমি পন্‌টিয়াস ?

পন্‌টিয়াস্ : আমি ঠিকই বলছি অক্‌টেভিয়াস্ নীলাদ্রি ! সত্যিই ভয় করছে আমার। তোমার দিকে দেখছি, কিন্তু তোমাকে ঠিক যেন চিনতে পারছি না। তোমার মুখটা পর্যন্ত আমার অচেনা বলে মনে হচ্ছে (মাথা নাড়িয়া) না, না—আমি তো তোমাকে চিনি না। কি যেন বললে তোমার নামটা ?—কি ?—অক্‌টেভিয়াস নীলাদ্রি ? ও নামের কারো সঙ্গে কোনদিন আমার পরিচয় ছিলো না। তুমি মিথ্যে আমাকে তোমার ওখানে যেতে বলছ। আমি

কোনদিন তোমার ওখানে যাবো না। কি নাম বললে—অক্‌টে-
ভিয়াস নীলাদ্রি? না, তোমাকে আমি চিনি না! কোনদিন
চিনতাম না!

অক্‌টেভিয়াস্ : নাঃ—তোমার সঙ্গে কথা বাড়িয়ে আর কোনো লাভ নেই
পন্‌টিয়াস্—তুমি পাগল হয়ে গেছ। আমি শুতে চললাম—তোমার
বুদ্ধি-শুদ্ধি যদি ফেরে তো আমাকে ডেকো। (একটু সরিয়া গিয়া
শুইয়া পড়িল।)

পন্‌টিয়াস্ : (একটু সরিয়া আসিতেই পায়ে কি একটা ঠেকিল। মাটি
হইতে গোলকটি তুলিয়া) হীরে—আবার হীরে। কতো বড়ো
হীরে। চারধারে শুধু হীরে। কিন্তু ওর জমির তলাতেও তো
দু-একটা থাকতে পারে! দেখি—পাঁচিলের ধার বরাবর একটু
খুঁড়েই দেখি। (পাঁচিলের ধার বরাবর খুঁড়িয়া আসিয়া) নাঃ—
এখানে যখন নেই, তখন ও জমিতে নিশ্চয় একটাও নেই। ওঃ!
ভাগ্যে পাঁচিলটা তোলা হয়েছিল!

অক্‌টেভিয়াস্ : (ঘুম ভাঙিয়া যাইতে) কি পন্‌টিয়াস্—মাটি খুঁড়ছ যে?
কি পেলে?

পন্‌টিয়াস্ : হীরে।

অক্‌টেভিয়াস্ : তোমার জমি ভর্তি শুধু হীরে নাকি? ওপর, নিচে,
সব?

পন্‌টিয়াস্ : ওপরে, নিচে, সব।

অক্‌টেভিয়াস্ : তা তুমি কি হীরে পাবার জন্যেই মাটি খুঁড়ছিলে নাকি?

পন্‌টিয়াস : না অক্‌টেভিয়াস্, একটু জল পাওয়া যায় কিনা দেখছিলাম।

অক্‌টেভিয়াস্ : একটু এধারে এগিয়ে এসো না। তোমার সঙ্গে আমার
দু-একটা কথা আছে।

পন্‌টিয়াস : আমার এখন সময় নেই অক্‌টেভিয়াস্ নীলাদ্রি। আমি
একটা মালা তৈরি করছি, মালা! হীরের মালা!

অক্‌টেভিয়াস : আমায় একটা হীরে দাও না। আমি তোমাকে জল
দেবো।

পন্‌টিয়াস্ : জল ? জল নিয়ে কি করবো ? আমার জল কোনো দরকার নেই।

অক্‌টেভিয়াস : এই না বলছিলে তোমার তেষ্টা পেয়েছে ?

পন্‌টিয়াস : তেষ্টা আমার পায় না। দেখছ না—আমি মালা তৈরি করছি—মালা ! হীরের মালা !

অক্‌টেভিয়াস : কিন্তু জল না পেয়ে যদি তোমার মৃত্যু হয় পন্‌টিয়াস, অরুণাংশু—তাহলে ও মালা পরবে কে ?

পন্‌টিয়াস : মৃত্যু ? মৃত্যু নিয়ে আমার এখন মাথা ঘামাবার সময় নেই, অক্‌টেভিয়াস নীলাদ্রি। দেখছ না—আমি মালা গাঁথছি—মালা। হীরের মালা ! দেখছ না—আমি সম্রাট ! দেখছ না, আমি গোটা পৃথিবীটাকে কিনে ফেলতে পারি। জল ? জলের আমার অভাব কি ? আমি আস্ত একটা নগর বসাবো···তার মধ্যে আস্ত একটা পুকুর কেটে দেবো। (হীরা লুফিতে লুফিতে) সে পুকুর পুকুর নয়—তাকে বলে সরোবর ! তার পাড় বাঁধিয়ে দেবো, সুন্দরী মেয়েরা এসে সেখানে জলকেলি করবে। তার ওপরে পুল বানিয়ে দেবো, লোকে বলবে—পন্‌টিয়াসের পুল। (হীরা লুফিতে লুফিতে) আমি থাকবো তবু মেয়েরা বলবে পন্‌টিয়াসের পুল ! আমি মরে যাবো, তবুও মেয়েরা তাই-ই বলবে—! জল ? জলের আমার অভাব কি ?

অক্‌টেভিয়াস : (ব্যাকুলস্বরে) পন্‌টিয়াস, তুমি একটু এদিকে এসো। বলছি না—আমার একটা কথা আছে।

পন্‌টিয়াস : কথা ! তোমার সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই ! তোমার কাছে কথা শুনতে যাই, আর তুমি আমার একটা হীরে নিয়ে নাও। তুমি আমাকে কি ভাবো অক্‌টেভিয়াস। আমি কি একেবারেই গাধা। বুঝি আমি সব ! দেখছ না, আমার কতো হীরে। লাল হীরে নীল হীরে ! (এক-একটি গোলক তুলিয়া দেখে ও ফেলিয়া দেয়।)

অক্‌টেভিয়াস্ : কিন্তু জল না পেলে তুমি যে মরে যাবে পন্‌টিয়াস······

পন্‌টিয়াস্ : (এক-একটি গোলক তুলিয়া দেখে ও ফেলিয়া দেয়) সবুজ হীরে······হলদে হীরে !

অক্‌টেভিয়াস্ : (জলাধার তুলিয়া ধরিয়া) কিন্তু জল, পন্‌টিয়াস !

জাহেদা : (অন্তরাল হইতে) ঐ দেখ নটবর—চাঁদ উঠেছে—চাঁদ নটবর—চাঁদ !

নটবর : ও তোমার চোখের ভুল জাহেদা···চাঁদ নেই···কোনোদিন ছিলো না। যখন দিব্যি গালবার দরকার হয় বা তোমাকে ভালবাসবার দরকার হয়, তখন মাঝে মাঝে ওটাকে আমদানী করি।

জাহেদা : ও কথা বললে আমি শুনবো না নটবর ! তুমি আমার সঙ্গে একটা গান গাও নটবর ! গাও লক্ষ্মীটি ! (সুরে) চাঁদ যদি নীল হয়ে আসে···

নটবর : গান আমার আসছে না জাহেদা। তোমাকে দেখে শুধু মনে হচ্ছে—তুমি যেন এক টুকরো পাকা পোনা মাছ—এক্ষুনি ভেজে খেয়ে ফেলি ! আহা···হেইডি-হাই ···হেইডি-হাই···

জাহেদা : (ধমকের সুরে) আবার নটবর ! (কণ্ঠস্বর মিলাইয়া যায়।)

(এতক্ষণ পন্‌টিয়াস্—হীরে, শুধু হীরে—বলিয়া মাথা নাড়িয়া যাইতেছিল। অক্‌টেভিয়াসও তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কি রকম যেন সম্মোহিতের মতো হইয়া গিয়া, দুই হাতে জলাধারটি উপরে তুলিয়া ধরিয়া পন্‌টিয়াসের তালে তাল দিয়া মাথা নাড়িতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।)

পন্‌টিয়াস্ : হীরে—শুধু হীরে ! এ পাশে হীরে, ও পাশে হীরে ! (তাহার দুই হাতে দু'টি গোলক।)

অক্‌টেভিয়াস্ : (দুই হাতে জলাধারটি ধরিয়া) হীরে—শুধু হীরে ! এপাশে হীরে—ওপাশে হীরে !

পন্‌টিয়াস : লাল হীরে···নীল হীরে !

অক্‌টেভিয়াস : সবুজ হীরে···হলদে হীরে !

পন্‌টিয়াস্ : আমার এ জমিতে শুধু হীরে···হীরে···হীরে···শুধুই হীরে !

অক্‌টেভিয়াস্ : আমার এ জমিতে শুধু (হঠাৎ কি যেন মনে হয়। জলাধারটি নামাইয়া রাখিয়া মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ খুঁড়িবার পর) না, হীরে তো নেই। কিন্তু এটা কি ? (চোখের

সামনে তুলিয়া ধরিয়া) এটা তো দেখছি একটা শেকড়। বুঝেছি···
বিষ শেকড়! ঠিক আছে! এই শেকড় আমি জলে মিশিয়ে, সেই জল ওকে খাওয়াবো! শেকড়টাকে বেটে জলে মেশাবো —যাতে কিছুতেই বুঝতে না পারে! তারপর!···কিন্তু তার আগে নিজে একটু জল খেয়ে নিই। (জলপান করিয়া) আঃ···কী ঠাণ্ডা! (আবার খুঁড়িতে আরম্ভ করিল।)

পন্‌টিয়াস্ : কি অক্‌টেভিয়াস, খুঁড়ছো কেন?

অক্‌টেভিয়াস : দেখছি, হীরে পাওয়া যায় কিনা।

পন্‌টিয়াস্ : আমার সমস্ত হীরে আমি তোমাকে দিয়ে দেবো! তুমি শুধু আমায় একটু জল দাও!

অক্‌টেভিয়াস : জল? না না, জল-টল কিছু হবে না—যাও!

পন্‌টিয়াস : জল, অক্‌টেভিয়াস—একটু জল।

অক্‌টেভিয়াস : কেন বিরক্ত করছ! দেখছ না আমি ব্যস্ত! (পুনরায় জলপান করিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে) ঘণ্টাখানেক পরে এসো, বিবেচনা করে দেখা যাবে।

পন্‌টিয়াস : তুমি যাতে করে আমাকে জল দেবে, আমি সেটা ভর্তি করে তোমাকে হীরে দেবো, অক্‌টেভিয়াস।

অক্‌টেভিয়াস্ : বেশ, তাহলে গোটাকতক বড়ো বড়ো হীরে এক জায়গায় জড়ো করো।

পন্‌টিয়াস্ : জড়ো আমার করাই আছে অক্‌টেভিয়াস। আমি তোমার জন্যে মালা গেঁথে রেখে দিয়েছি। (একটি মালা লইয়া আসিতে যায়।)

অক্‌টেভিয়াস : (ইত্যবসরে জলের সহিত শিকড়চূর্ণ মিশাইয়া দিয়া) কিন্তু জলের যদি স্বাদ বদলে যায়? একটু খেয়ে আর যদি না খায়?

পন্‌টিয়াস : (মালা লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে আসিতে নিজকে) কিন্তু একটু জলের জন্যে এত বড়ো মালা? এতগুলো হীরে? ঠিক আছে। গলায় পরিয়ে দিয়ে হাতে করে ধরে থাকবো। জল খাওয়া হয়ে গেলেই ছিনিয়ে নেবো। কিংবা গলায় পরিয়ে পাক দিয়ে······

অক্‌টেভিয়াস : কই পন্‌টিয়াস, এসো—জল খাও। (পাঁচিলের ধারে অগ্রসর হইয়া আসে।)

পন্‌টিয়াস : (পাঁচিলের ধারে অগ্রসর হইয়া) এসো অক্‌টেভিয়াস, তোমায় মালা পরিয়ে দিই। (মালা পরাইয়া দিয়া ধরিয়া থাকে।) জল খাওয়া হয়ে গেলে তবে ছাড়বো।

অক্‌টেভিয়াস : বেশ তো, আমি জলাধার ধরছি—তুমি জল খাও। (জলাধার পন্‌টিয়াসের মুখে তুলিয়া ধরে।)

পন্‌টিয়াস : দেখো অক্‌টেভিয়াস, একটা ফোঁটাও যেন নষ্ট না হয়। এক এক ফোঁটায় এক-একটা হীরে আমি নিয়ে নেবো কিন্তু। (জল পান করিতে আরম্ভ করে।)

অক্‌টেভিয়াস : মালাটায় পাক দিচ্ছ পন্‌টিয়াস, আমার গলায় লাগছে !

পন্‌টিয়াস : তুমিও ফোঁটা ফোঁটা করে জল নষ্ট করছ অক্‌টেভিয়াস !

অক্‌টেভিয়াস : কিন্তু আমার গলায় লাগছে পন্‌টিয়াস—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। পন্‌টিয়াস···পন্‌টিয়াস···অরুণাংশু।

পন্‌টিয়াস : এখনও কিছুই হয়নি অক্‌টেভিয়াস নীলাদ্রি।

অক্‌টেভিয়াস : (হাত হইতে জলাধার পড়িয়া যায়) কিন্তু তুমি আমায় দম বন্ধ করে খুন করতে চলেছ অরুণাংশু ! ছেড়ে দাও অরুণাংশু—ভুলে যাচ্ছ—এটা নাটক ! এটা সত্যি নয় !

পন্‌টিয়াস : কিন্তু তোমারও তো সে কথা মনে নেই নীলাদ্রি। তুমিও তো আমাকে বিষ দিয়েছ ! (মালায় পাক দিয়া গলা আরও জোরে চাপিয়া ধরে।)

অক্‌টেভিয়াস্ : পন্‌টিয়াস···অরুণাংশু···(মৃত্যু।)

পনটিয়াস্ : ওঃ ! কী সাংঘাতিক বিষ ! আমার চোখের সামনে থেকে সব কিছু মুছে যাচ্ছে ! অক্‌টেভিয়াস্ নীলাদ্রি···কেন, কেন এ নাটক আমরা অভিনয় করতে গেলাম ! তার চেয়ে আমাদের পুরোনো নাটকই তো ভালো ছিলো। (মঞ্চের উপর আলো ক্রমশঃ কমিয়া আসে।) কোথায় তুমি অক্‌টেভিয়াস্ নীলাদ্রি···আমি তোমার কাছাকাছি গিয়ে মরতে চাই (হাতড়াইতে হাতড়াইতে)

কিন্তু সে পাঁচিলটা? সে পাঁচিলটা তো নেই। ছিলো না…সে পাঁচিল তো কোনদিনই ছিলো না। নীলাদ্রি…নীলু…(মৃত্যু। নীলাদ্রির পাশেই অরুণাংশুর মৃতদেহ ঢলিয়া পড়ে। আচার্য নাটকের খাতা সশব্দে বন্ধ করেন। মঞ্চে সমস্ত আলো জ্বলিয়া উঠে। আচার্য আসন হইতে উঠিয়া, পূর্বে যেখানে টেবিল পাতা ছিলো, সেই স্থানে মৃতদেহ দুইটিকে টানিয়া লইয়া যান। টেবিলটি তুলিয়া নিয়া পূর্বস্থানে বসাইয়া দেন। মৃতদেহ দুইটি তলায় পড়িয়া যায়। টেবিল-চাপাটি টেবিলের উপর এমনভাবে পাতিয়া দেন, যাহাতে মৃতদেহটি দর্শকরা দেখিতে পাইলেও মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দেখিতে পাইবে না। এবার চেয়ার দুইটি যথাস্থানে বসাইয়া দিয়া দর্শকদের নমস্কার করিয়া প্রস্থান করেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অপরদিক হইতে নটবর হার্ডি ও জাহেদা জাবেরীর প্রবেশ।)

জাহেদা : (অগ্রসর হইয়া আসিতে আসিতে) কি করে রেখে দিয়ে গেছে দেখেছ! চারধারে জল! এধারে ওধারে কি সব ফেলে ছড়িয়ে রেখে গেছে। উনি আবার আচার্য হয়েছেন! আচ্ছা তুমিই বলো—ওঁর কি উচিত ছিলো না আমাদের কাছ থেকে যেমনটি পেয়েছেন তেমনটি দিয়ে যাওয়া।

নটবর : আমার কিন্তু মন্দ লাগছে না। দৃশ্যপট একটু-আধটু বদলানো ভালো! নইলে শুধু তোমাকে নিয়ে তো আর নাটক এগুবে না।

জাহেদা : (পায়ে মৃতদেহ ঠেকিতে টেবিলের চাপা তুলিয়া ভীতস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল) এ কি! এখানে এ দুটো কি? শুনছো… (আর্তস্বরে) দেখ দেখ, কারা এখানে মরে পড়ে রয়েছে।

নটবর : আগের নাটকের দু'টি চরিত্র। একে অপরকে খুন করেছে।

জাহেদা : (ধীরে স্বরে) কিন্তু দু'জনে কেমন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে দেখ। যেন দু'জনে কতকালের বন্ধু!

নটবর : তা না হয় হলো। কিন্তু তলায় মড়া নিয়ে কি হাসির নাটক হয়! দাঁড়াও—আবার আচার্যকে ডাকি। (চিৎকার করিয়া) আচার্য গ্রেগেরিয়াস শ্রীহর্ষ—একবার এসে মড়া দুটোকে নিয়ে যান।

[আচার্যের প্রবেশ]

আচার্য : কে ডাকলে ?

নটবর : আমি ডেকেছি আচার্য। আপনার দৃশ্যকাব্যের দু'টি সরঞ্জাম—মানে আস্ত দু'টি মৃতদেহ এখানে পড়ে আছে, আচার্য। দয়া করে সে দু'টিকে বহন করে নিয়ে যান।

আচার্য : কোনো প্রয়োজন নেই। আচ্ছাদনীটি সামনের দিকে টেনে দিন। মৃতদেহ দু'টি দর্শক-দৃষ্টির অন্তরালে পড়ে যাবে। তারপর আবোল-তাবোল বকে যান—দর্শকেরা মৃতদেহের কথা বিস্মৃত হয়ে হো হো করে হেসে উঠবে।

নটবর : ঠিক বলেছেন আচার্য। (নমস্কার করিয়া আচার্যের প্রস্থান।) এসো জাহেদা, এটাকে একটু টেনে দিই। (টেবিলের ঢাকনা সামনে টানিয়া দিতেই মৃতদেহ দুইটি দর্শকদের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যায়। জাহেদা মুহূর্তের জন্য অন্তরালে গিয়া দুই কাপ কফি লইয়া আসে। দুইজনে চেয়ারে বসে। জাহেদার কফির কাপ জাহেদার হাতে, নটবরের কাপ তাহার সামনে নামানো।)

জাহেদা : খাওয়ার পর খুব ছোট্ট একটা কাপে ছোট্ট একটু কফি খেতে আমার কিন্তু প্রচণ্ড ভালো লাগে। নাও, তোমার কফি যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

নটবর : (কফির পেয়ালা তুলিয়া লইয়া) আর কি কি জিনিস তোমার প্রচণ্ড ভালো লাগে জাহেদা ?

জাহেদা : (আর একটি জিনিসের নাম মনে পড়িয়া যাইতে জিভে শব্দ করিয়া) ওঃ—সে আর একটা জিনিস—বুঝলে কিনা—সেটাও আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে !

নটবর : কি বলো তো ?

জাহেদা : চুনো মাছের বাসি অম্বল ! আহা-হা—সে যে কী প্রচণ্ড ভালো !

নটবর : আশ্চর্য ! কি প্রচণ্ডভাবেই না তুমি বেঁচে আছো জাহেদা—

॥ যবনিকা ॥

বিষণ্ণ প্রহসন

॥ চরিত্র-লিপি ॥

অনুভা

রবি

শচীন

কেতকী

হরিচরণ

[অরণ্য নয় জনারণ্য। অন্ধকার—সন্ধ্যার, কিন্তু রাত্রির মতো গভীর। সমগ্র অরণ্য নয়, বিচ্ছিন্ন এক অংশ। জোনাকির আলো নয়, দু-একটি জ্বলন্ত সিগারেটের আগা]

অনুভা : অনেকক্ষণ কিন্তু হলো।

রবি : হোক না। ক্ষতি কি ?

শচীন : ক্ষতি ? কিছু না, সামনে থেকে ইঁট ছুঁড়তে পারে—এই যা।

কেতকী : ইঁট ছুড়বে ? কারা ?

শচীন : কেন ? যারা টিকিট কেটেছে—তারা।

অনুভা : টিকিট তাহলে কিছু বিক্রী হয়েছে ?

শচীন : সাড়ে পাঁচটা অবধি তিনখানা।

রবি : ক'টাকার ?

শচীন : দু'খানা এক টাকার, আর একখানা দেড় টাকার।

কেতকী : ও! আমরা তো এখন থিয়েটারে।—তাই না ?

শচীন : কেন ? তুমি কি ভেবেছিলে অন্য কোথাও ?

কেতকী : আমি ? আমি তো কিছু ভাবিনি।

রবি : কেন ? ভাবোনি কেন ? কেউ কি মাথার দিব্যি দিয়েছিলো ?

কেতকী : হ্যাঁ—জয়ন্ত।

অনুভা : জয়ন্ত এসেছিলো বুঝি ?

কেতকী : বাঃ তাহলে বলছি কি। কাল রাত্তির দশটা অবধি বসে বসে গল্প করলাম।

অনুভা : আমার কথা কিছু বললে ?

কেতকী : না। খালি যাবার সময় আমাকে ভাবতে বারণ করে গেল। বললে, ভেবো না—ভাবলে ব্লাডপ্রেসার লো হয়ে যাবে।

শচীন : তাই বুঝি ভাবার পাঠ বন্ধ ?

কেতকী : একেবারে। কাল রাত্তির দশটা থেকে। তাই তো সময় আর এগোয়নি। এখনো যেন জয়ন্তর সামনেই আছি!

হরিচরণ : আচ্ছা···সিঙাড়ার ফুড-ভ্যালু কতো ?

রবি : তুমি কিন্তু তাহলে না এলেই পারতে কেতকী!

কেতকী : বাঃ—আমি না হলে আমার পার্টটা করবে কে ?

রবি : কিন্তু জয়ন্ত সামনে থাকবে না। পারবে তো ?

কেতকী : কেন পারবো না। তোমাকে জয়ন্ত ভেবে নেবো। আমি তো যখন তখন যাকে তাকে জয়ন্ত ভেবে নিতে পারি। সে বুঝি জানো না ? গেল হপ্তায় জয়ন্ত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এল এক কয়লাওয়ালা—

হরিচরণ : আচ্ছা, সিঙাড়ার ফুড-ভ্যালু কতো ?

(একটু যেন আলো এসে পড়ে। সেই আবছা আলোয় সকলকেই ঝাপসাভাবে দেখা যায়।)

কেতকী : কিন্তু আমার কাছে তো আর কয়লাওয়ালা নয়। আমার কাছে সে তখন জয়ন্ত। ঝপ করে কয়লা নামিয়ে যেই না পেছন ফিরেছে, আমিও ফস করে বলে ফেললাম—

হরিচরণ : (হাসি চাপতে না পেরে) কাকে বললে ? কয়লাওয়া-লাকে নাকি ?

কেতকী : হ্যাঁ, বললাম—কয়লাওয়ালা, কেউ তোমায় মনে করিয়ে দেয়নি—তুমি রূপকথার রাজপুত্র ? আরব্য-উপন্যাসের পাতা থেকে তুমি উঠে এসেছ ?

হরিচরণ : (জোরে হেসে উঠে) এই যাঃ। হেসে ফেললাম।

রবি : তাতে হয়েছেটা কি ?

হরিচরণ : বাঃ ডাক্তারের বারণ। ডাক্তার যে সময় বেঁধে দিয়েছেন ! এই সময় থেকে এই সময় অবধি প্রফুল্ল হয়ে থাকতে হবে। তার আগে নয়, পরেও নয়।

অনুভা : কেন ?

হরিচরণ : আমি যে ক্রনিক ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগছি।

শচীন : ডাক্তার আর কিছু বেঁধে দেন নি ?

হরিচরণ : নিশ্চয়। ফুড-ভ্যালু ধরে খেতে বলেছেন। তাই তো জিজ্ঞেস করছিলাম—সিঙাড়ার ফুড-ভ্যালুর কথা।

রবি : কেন ? তুমি কি সিঙাড়া খাচ্ছ নাকি ?

হরিচরণ : হ্যাঁ। দেখছ না—সামনে রয়েছে দুটো সিঙাড়া আর এক কাপ চা।

শচীন : এ সময় কতো ক্যালরি খেতে হবে ?

হরিচরণ : আট।

শচীন : তাহলে খেয়ে ফেল। দুটো সিঙাড়ায় তিন তিন ছয়, আর এক কাপ চায়ে দুই—এই হলো গিয়ে আট।

কেতকী : সবসুদ্ধ কতো ক্যালরি খেতে বলেছে, হরিচরণ ?

হরিচরণ : বলবো না। ট্রেড্-সিক্রেট।

শচীন : বাঁচাটাও তোমার ট্রেড্ নাকি হরিচরণ !

হরিচরণ : নিশ্চয়। একেবারে একচেটে ব্যবসা। মনোপলি।

(আবছা আলো সরে যায়। আবার অন্ধকার, আবার দু-একটি জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন।)

রবি : তুমি কি বলতে চাও হরিচরণ ? আমরা কি কেউ বাঁচছি না ?

হরিচরণ : আমার বাঁচাটা আমিই বাঁচছি—তোমরা নও।

শচীন : কিন্তু এখন তো তোমাকে অন্যের ভূমিকায় বাঁচতে হবে।

হরিচরণ : কে বললে। আমি হরিচরণ। হরিচরণের ভূমিকায় অভিনয় করে যাবো।

অনুভা : কিন্তু নাটকে যদি হরিচরণের ভূমিকা না থাকে ?

হরিচরণ : সে কথা নাটক বুঝবে। (শুধু হরিচরণের ওপর আলো এসে পড়ে।) আমি আজ চল্লিশ বছর ধরে হরিচরণ হবার চেষ্টা করে আসছি!—আজ যখন হতে পেরেছি, তখন আমার পক্ষে অন্য কোনো ভূমিকায় অভিনয় করা সম্ভব নয়।

রবি : কিন্তু তুমি কি সত্যিই হরিচরণ হতে পেরেছ—হরিচরণ ?

হরিচরণ : নিশ্চয়। মা নাম রাখলেন হরিচরণ। দলের অধিকারী ছিলেন বাবা। উনিশ বছর বয়সে প্রথম রোল পেলাম। কেরানীর রোল। সেই থেকে অভিনয় শুরু। ছোটো কেরানী করলাম, মেজো কেরানী করলাম, বড়ো কেরানী করলাম। কিন্তু আদর্শ কোরানী ছিলেন বাবা—তাঁর মতো হতে পারলাম না।

কেতকী : কেন ?

হরিচরণ : চল্লিশের পর তাঁর ঠোঁটটা একটু বেঁকে গিয়েছিল। অসুখ কিনা জিজ্ঞেস করলে বলতেন—ক্রনিক ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। এতদিন চেষ্টা করেও সেই ডিস্‌পেপ্‌সিয়াটা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আজ হয়েছে। আমাকেও আজ ডাক্তার বলেছে—আমার ক্রনিক ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। আজ আমি সত্যিই হরিচরণ। তাই আমার পক্ষে আজ আর অন্য কোনো ভূমিকায় অভিনয় করা সম্ভব নয়।

(হরিচরণের ওপর থেকে আলো সরে যায়। আবার অন্ধকার।)

অনুভা : কিন্তু ব্যাপার যা দেখছি—আমাদের পক্ষেও তো কোনো ভূমিকায় অভিনয় করা সম্ভব নয়।

কেতকী : সত্যি। এখনো পর্যন্ত আলোই ঠিক হলো না!

রবি : সত্যি! অভিনয় আরম্ভই হলো না, খালি মনে হচ্ছে—অভিনয় যেন শেষ হয়ে গেছে।

শচীন : কিছু নয়, কিছু নয়। স্টেজ-ম্যানেজারটা হাঁদা। উল্টোপাল্টা সুইচ জ্বালছে—তাই একবার আলো একবার অন্ধকার।

অনুভা : আমার কিন্তু মনে হয়—আমাদের নির্দেশকের মতলব খারাপ।

কেতকী : কিন্তু সে তো লোক খারাপ নয়। এই সেদিন আমাকে একটা মুক্তোর সেট কিনে দিয়েছে।

শচীন : আমি একবার বাইরে গিয়ে বরং দেখে আসি।

রবি : কিন্তু বাইরে তুমি যাবে কি করে ?

শচীন : কেন ?

অনুভা : নাটক শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্টেজ ছেড়ে যাওয়া বারণ।

শচীন : আরে ও-সব বড়ো বড়ো কথা দু-একটা বলতে হয়। নির্দেশক বলে ব্যাপার!

রবি : ওর ধারণা—ওই যেন সব!

হরিচরণ : সেই জন্যেই তো ওকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার—আমরা না থাকলে ও কিছুই নয়।

অনুভা : হ্যাঁ, তাই একবার বোঝাতে গিয়ে দেখ না—

হরিচরণ : কি রকম ?

অনুভা : সেদিন বলছিল—জানো ? তোমাদের কাউকে আমার দরকার নেই। আমি একটা জলোচ্ছ্বাস, একটা ঘূর্ণি, একটা আগুন দেখিয়ে দর্শকদের মাত করে দিতে পারি।

হরিচরণ : কিন্তু এই অন্ধকারে আমি বসে থাকতে পারছি না। ডাক্তার বলেছে—আলো আর হাওয়া—ছুটোই আমার দরকার।

কেতকী : আমার কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে—

অনুভা : কি বলো তো ?

কেতকী : আমরা আমাদের যতটা দরকারী বলে মনে করছি, ততটা দরকারী আমরা হয়তো নই।

রবি : নই-ই তো। সেদিন বলছিল—আমরা নাকি সব স্ক্রু আর বোল্টু। যখন যেটাকে ইচ্ছে বাদ দিয়ে, যেটা ইচ্ছে বসিয়ে নেবে।

কেতকী : আমার কিন্তু মনে হয়—এই ধরনের কথাবার্তা না বলে চুপচাপ অপেক্ষা করাই ভালো।

হরিচরণ : আচ্ছা, দেখবার লোক হয়েছে তো ?

শচীন : ঐ যে বললাম—সাড়ে পাঁচটা অবধি তিনজন।

হরিচরণ : তারপর আর হয়নি ?

রবি : হয়েছে বলেই তো মনে হচ্ছে।

অনুভা : কি বুঝলে ?

রবি : নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি যে।

কেতকী : আচ্ছা—দর্শকের নিঃশ্বাসের শব্দ কি রকম ?

অনুভা : অনেকটা ঘুমন্ত লোকের নিঃশ্বাসের আওয়াজের মতো।

রবি : আমার নিজেরও কিন্তু কি রকম ঘুম পাচ্ছে।

হরিচরণ : বেশ তো, ঘুমিয়ে পড়ো। ইচ্ছেয় কক্ষনো বাধা দিতে নেই। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ধরতে পারে।

রবি : ঘুম ঘুম চোখে আমার ছোটবেলার কথা মনে আসছে। (রবির ওপর আবছা একটু আলো এসে পড়ে) সেই ছোটবেলায়—আমার নিজের মা যখন বেঁচে ছিলেন—এ-পাড়া ওপাড়া থেকে মেয়েরা

বেড়াতে আসতো···মা বলতেন—খোকন, নাচো তো···আর অমিও এক-পা তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতাম···মা তালি দিতে দিতে ছড়া কাটতেন··· ··

অনুভা : (তালি দিতে দিতে ছড়া কাটে। অনুভার ওপরও একটু যেন আলো এসে পড়ে।) নাচো তো সীতারাম, কাঁকাল বেঁকিয়ে—আলোচাল খেতে দেবো কোঁচড় ভরিয়ে।

রবি : (ঘুম ঘুম স্বরে) হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক এই রকম। নাচো তো সীতারাম (দু'জনের ওপর থেকে আলো সরে যায়।)

হরিচরণ : (ব্যাকুল স্বরে) কিন্তু এ অন্ধকার আমার যে আর সহ্য হচ্ছে না। আমার যে ক্রনিক ডিস্‌পেপ্‌সিয়া······আলো······ অন্ধকারে দেহ আলো······আলো······এতটুকু আলো······(সমস্ত মঞ্চের উপর আলো এসে পড়ে।)

কেতকী : আঃ, এতক্ষণে আলো এলো।

অনুভা : কিন্তু কি রকম কাঁপছে দেখেছ ?

রবি : ঠিক বলেছ। কি রকম ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলাচ্ছে···কি রকম যেন অস্থির !

শচীন : ওটা নির্দেশকের নির্দেশ। আরম্ভ করার আদেশ। আমাদের অস্থির হতে বলছে—শুরু করে দিতে বলছে।

রবি : বেশ তো। তাহলে আমরা আরম্ভ করে দিই। কই, এসো কেতকী—

অনুভা : কিন্তু তার আগে দর্শকদের একটু বলে নিলে হয় না ?

শচীন : ঠিক বলেছ। কিন্তু কে বলবে ?

অনুভা : কেন, আমরা প্রত্যেকেই। তুমি আরম্ভ করো।

কেতকী : আমার কিন্তু মনে হয়—আগে থাকতে কিছু বলটা উচিত হবে না।

রবি : আমার একটা প্রশ্ন ছিলো—

হরিচরণ : জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই, রবি। ওতে দুশ্চিন্তা বাড়বে বই কমবে না।

কেতকী : আর মিছিমিছি প্রশ্ন তুলে দেরি করা কেন। সামনে ওঁরা বসে রয়েছেন।

শচীন : আমার কিন্তু মনে হয়—রবি প্রশ্নটা তুললেই ভালো করতো। হয়তো ওর প্রশ্নের মধ্যে আমরা আরম্ভ করার একটা খেই পেয়ে যেতে পারি। তাহলে রবি······

রবি : না—মানে—ঠিক প্রশ্ন নয়······একটা কথা······

অনুভা : কি কথা শুনি—

রবি : ওঁদের সামনে আমাদের সব খুলে বলাই উচিত।

অনুভা : বেশ তো, বলো—

শচীন : আমি বললে কিন্তু বেশ গুছিয়ে বলতে পারতাম।

অনুভা : সেই জন্যেই তো ওকে বলতে বলছি। কই রবি, ওঠো।

রবি : কে উঠবে—আমি ?

অনুভা : নিশ্চয়।

রবি : আমাকে নিয়ে মজা করছো অনুভা। তুমি জানো—কিছু বলতে গেলে আমার তোৎলামো এসে পড়ে।

অনুভা : একটু সুর করে আরম্ভ করো—তাহলে আর তোৎলামো আসবে না। নাও নাও, ওঠো—দেরি হয়ে যাচ্ছে—

রবি : (উঠে দর্শকদের সামনে আসে) দেখুন···আজ···মানে আজ আমরা এখানে এসেছি···মানে প্রত্যেক অভিনেতার স্বপ্ন থাকে··· মানে আমারও ছিলো······চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট্‌ হবার···তাহলে কিন্তু খুব ভালো হতো···মানে মনের মতো একটি মেয়ে বিয়ে করতে পারতাম······এই ধরুন আমাদের কেতকীর মতো···আর খুব বেশী কিছু নিতাম না······মানে একটা রোলেক্স ঘড়ির খুব শখ ছিলো, যদি সেইটে···কিন্তু এসব কী বলছি···না মানে···আমরা এখানে এসেছি···কিন্তু আমাদের কাউকে কোনো পার্ট এখনো দেওয়া হয়নি···মানে নিজের নিজের পার্ট আমাদের নিজদের তৈরি করে নিতে হবে···মানে আমরা নিজেরাই জানি না—কিসের জন্যে আমরা এখানে এসেছি···কে আমরা···কি আমরা···মানে···আমি

অন্তত জানি না···মানে···হয়তো সত্যিই আমরা এখানে নেই···
হয়তো এসব স্বপ্ন···

অনুভা : ঠিক আছে। তুমি যে কিছু জানো না—তা বোঝা গেল। এখন এদিকে এসো। (রবি ফিরে আসে।) আচ্ছা রবি, শচীনের মতো হতে পারো না? শচীন কেমন সব কিছু জানে।

শচীন : আরে ছেড়ে দাও। সবাই কি সব হয়, না হতে পারে? ঠিক আছে রবি—তুমি বসো, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। (দর্শকদের সামনে এসে) দেখুন, আজ আমরা সোজা স্টেজে চলে এসেছি। আমাদের নাটক কিছু তৈরি করা নেই। নির্দেশকের হুকুম—হাতাহাতি নাটক তৈরি করে আপনাদের দেখাতে হবে। দেখলে রবি—কতো সহজ করে বলা যায়।

রবি : যা হয়ে গেছে—তা তো সহজ করে বলা যাবেই। কিন্তু যা হয়নি? কে আমরা? কি আমরা? কেন আমরা? কই, সে সব তো কিছু বললে না?

কেতকী : আমার কিন্তু মনে হয়, আমাদের নামগুলো বলে দেওয়া উচিত।

শচীন : ঠিক বলেছ। (দর্শকদের দিকে ফিরে) দেখুন, আমাদের কোনো স্মরণিকা—মানে প্রোগ্রাম নেই। তাই আমাদের নামগুলো বলে দিচ্ছি। আমার নাম শচীন। থিয়েটারে খুব নাম হওয়ার পর ফিল্মে চলে গিয়েছিলাম। এখন ফিল্মে খুব নাম হওয়ায় থিয়েটারে চলে এসেছি। আমার মা বাবা দু'জনেই থিয়েটার করতেন। কাজেই বুঝতে পারছেন—মানুষ হয়েছি গ্রীনরুমে গ্রীনরুমে—

অনুভা : এটা বলার মতো বলা হচ্ছে শচীন—?

শচীন : বাঃ—আমি যা তাই তো বলবো।

রবি : কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি বলছো।

অনুভা : সত্যি শচীন—এতো কথা বলার দরকার কি?

শচীন : বাঃ—আমার যে সব কথা এখনো শেষ হয়নি।

অনুভা : তোমার মতো একজন অভিনেতা। লোকে তো তোমায় দু-কথায় বুঝে নেবে। তুমি বসো শচীন।

শচীন : কিন্তু······

অনুভা : কোনো কিন্তু নয়। বসে যাও।

কেতকী : এবার তোমার পালা অনুভা।

অনুভা : বেশ। (দর্শকদের সামনে এসে) আমার নাম অনুভা। আমাকে আপনারা এ-থিয়েটারে ও-থিয়েটারে দেখবেন—বিধবা দিদির পার্টে, বিধবা পিসির পার্টে। কিন্তু মনে রাখতে পারবেন না। থিয়েটার করি, কিন্তু ভালো লাগে না—

রবি : সে কি অনুভা—

অনুভা : (রবির দিকে ফিরে) হ্যাঁ—ঠিক তাই। (ভারাক্রান্ত কণ্ঠস্বরে) কিন্তু কেন জানো ? থিয়েটার থিয়েটারই থেকে যায়, সত্যি হয়ে ওঠে না। (কেতকীকে) নাও কেতকী, এবার তোমার পালা।

কেতকী : (দর্শকদের সামনে এসে) আমার আসল নাম কেতকীবালা। ছোটো করে নিয়ে কেতকী করেছি, তাতে কোনো সুবিধে হয়নি আরও ছোটো করে নিয়ে কেটি করবো ঠিক করেছি—তাতেও বোধহয় কোনো সুবিধে হবে না। সুবিধে বোধহয় কোনদিনই হবে না। ঠিক অভিনেত্রী যাকে বলে, আমি বোধহয় তা নই! আমার আর কিছু বলার নেই।

অনুভা : নাও রবি—ওঠো।

রবি : আমি! না না, আমি নয়—

অনুভা : তাই কি হয়। আমরা সবাই বলছি। তুমিও কিছু বলো।

রবি : বেশ। (দর্শকদের সামনে এসে) কিন্তু···আমি···আমি মানে ···আমার সত্যিই কিছু বলার নেই। ইচ্ছে ছিলো চার্টার্ড অ্যাকউন্ট্যান্ট হবো। কিন্তু ছোটবেলায় মা মারা গেলেন। থার্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাস করার পর লেখাপড়া আর এগুলো না। ইচ্ছে ছিলো কেতকীর মতো একটি মেয়েকে বিয়ে করি। কিন্তু বাবা দু'বারের বার বিয়ে করলেন। আমাকেও থিয়েটারে চলে আসতে

হলো। এখানে আসতে আমি চাইনি! (অল্পক্ষণের নীরবতা।)

অনুভা: এবার তোমার পালা, হরিচরণ—

হরিচরণ: (না উঠেই) আমি তো গোড়াতেই আমার চরিত্রকে এস্ট্যাব্‌লিস করে দিয়েছি। এখন তো আমার মর্নিং-ওয়াকের সময়।

শচীন: কিসের সময়?

হরিচরণ: মর্নিং-ওয়াকের।

কেতকী: কিন্তু এখন তো সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত্তির।

হরিচরণ: তাতে কি হয়েছে। ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপসন—সকাল-সন্ধ্যে দু'বেলাই মর্নিং ওয়াক। আচ্ছা, তোমরা এদিকটায় প্লে করো, আমি ওদিকটা পার্ক করে নিয়ে মর্নিং ওয়াক করছি। (মঞ্চের অপর প্রান্তে গিয়ে মর্নিং ওয়াক শুরু করে। মাঝে মাঝে পার্কের ফুলগাছ কল্পনা করে নিয়ে দাঁড়ায়, ফুলের গন্ধ শোঁকে, আবার মর্নিং ওয়াক শুরু করে। কখনো বা পার্কের রেলিং কল্পনা করে নিয়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়, পার্কের বেঞ্চি কল্পনা করে নিয়ে বসে, আবার মর্নিং ওয়াক শুরু করে। এদিকে যতক্ষণ অভিনয়, ওদিকে ততক্ষণ হরিচরণের মর্নিং ওয়াক।)

অনুভা: শচীন—আমরা তাহলে আরম্ভ করি—

শচীন: আর একটু—(দর্শকদের দিকে ইঙ্গিত করে) আমাদের নির্দেশকের নির্দেশটা এঁদের জানিয়ে দিই।

অনুভা: নির্দেশ না দেয়ালের লিখন?

শচীন: ও দুটোই বলতে পারো।

অনুভা: নির্দেশটা কি শুনি—

শচীন: যতক্ষণ না তাঁর মনের মতো হচ্ছে, ততক্ষণ যবনিকা উঠেই থাকবে, পড়বে না।

অনুভা: (দর্শকদের দেখিয়ে) ওঁদের তো বেশ আনন্দ দিলে দেখছি।

শচীন: কেন বলো তো?

অনুভা: তোমার নির্দেশকের তো হাড়ে টক। আমাদের করা কোনো কিছুই আজ পর্যন্ত তাঁর পছন্দ হয়নি।

কেতকী : দেয়ালেরও কান আছে অনুভা।

অনুভা : থাকলে বয়ে গেল। আমি কি গ্রাহ্য করি নাকি।

কেতকী : আমার কিন্তু ওঁর ওপর খুব বিশ্বাস।

অনুভা : তোমার এখন আরম্ভ করার কথা কেতকী। তুমি আরম্ভ করো।

শচীন : একটু দাঁড়াও—আমি শেষ কথাটা বলে নিই। (দর্শকদের দিকে ফিরে) নির্দেশকের নির্দেশ—আজকের নাটক যেন জীবনের অনুকরণ হয়।

রবি : না না, ও-কথা তিনি বলেন নি।

কেতকী : তুমি ঠিক শুনেছ তো রবি—

রবি : আমি ঠিক শুনেছি। তিনি বললেন—আজকের নাটক যেন জীবনের মতো হয়। বললেন—জীবনটাই নাটক।

শচীন : কি করে হবে? নাটক জীবনের বিরুদ্ধে হয়, জীবনের পক্ষে হয়, জীবনের অনুকরণ হয়, জীবন সম্পর্কে হয়, কিন্তু জীবন কখনো নাটক হয় না।

রবি : তিনি কিন্তু ঐ কথাই বলেছিলেন। আমার পরিষ্কার মনে আছে।

কেতকী : আমার মনে আছে—তিনি বললেন, জীবনটাই নাটক।

অনুভা : তাহলে শচীন—জীবনে একবার অন্তত তোমারও ভুল হলো।

শচীন : ভুল! কে বললে? একটু যাচাই করে দেখছিলাম—তোমাদের মনে আছে কিনা।

অনুভা : মনে আমাদের ঠিকই ছিলো।

শচীন : যাকগে—এবার আমরা আরম্ভ করি।

কেতকী : কি দিয়ে আরম্ভ করবো?

শচীন : কেন? নাটক যা দিয়ে আরম্ভ হয়। পালিস করা ভালো ভালো কথাবার্তা দিয়ে।

রবি : শেষ করবো কোথায়?

শচীন : ক্যাথারসিস্ এলেই শেষ।

অনুভা : বেশ, তাহলে—

শচীন : (একপাক ঘুরে এসে যেন দেখা করতে এসেছে এই ভাবে

অনুরোধ) ভালো আছেন ?

অনুভা : আরে আপনি !

শচীন : এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম একটু খবর নিয়ে যাই।

অনুভা : আপনি রোজই এদিক দিয়ে যান নাকি ?

শচীন : না···মানে···কিন্তু কেন বলুন তো ?

অনুভা : রোজই একবার করে খবর নিয়ে যান কিনা—তাই।

শচীন : না···মানে···রোজ একবার করে খবর না নিলে কি রকম যেন মন কেমন করে।

অনুভা : সত্যি—আপনার মতো লোক হয় না।

শচীন (বিগলিত ভাবে) আপনার মতো মেয়েও কিন্তু হয় না।

অনুভা : য্যাঃ—এটা আপনি বাড়িয়ে বলছেন। (ইতিমধ্যে রবি ও কেতকী একসঙ্গে একপাক ঘুরে এসে দাঁড়ায়। তারাও যেন দেখা করতে এসেছে।)

শচীন : (রবি ও কেতকীকে দেখিয়ে) বিশ্বাস না হয়—এঁদের জিজ্ঞেস করে দেখুন।

রবি ও কেতকী : (একসঙ্গে) কি হয়েছে ···কি হয়েছে ?

শচীন : (অনুভাকে দেখিয়ে) আমি বলেছি—এঁর মতো মেয়ে হয় না।

রবি ও কেতকী : (একসঙ্গে) নিশ্চয়—সে কথা আর বলতে।

অনুভা : (বিগলিত ভাবে) আপনারাও তাই বলছেন।

রবি ও কেতকী : (একসঙ্গে, গম্ভীর ভাবে) নিশ্চয়—এ কথা তো কারো বলার অপেক্ষা রাখে না।

অনুভা : তাহলে ?

শচীন : তাহলে আর কি। সমস্যার সমধান। নাটক শেষ।

অনুভা : মানে ?

শচীন : সমস্যা ছিলো—আপনার মতো মেয়ে হয় কিনা।

কেতকী : প্রমাণ হলো—হয় না।

রবি : কাজেই নাটক শেষ।

অনুভা : কিন্তু কই, আলো তো নিভলো না ? যবনিকা তো নামেনি ?

কেতকী : তাহলে ? মানে……?

অনুভা : মানে আর কি। মানে নাটক শেষ হয়নি।

রবি : ও-রকম যেখান-সেখান থেকে আরম্ভ করলে কি নাটক হয়—না সে নাটকের শেষ থাকে ?

শচীন : সেট্‌টা ভালো করে দেখলে কিন্তু একটা নাটক বেরিয়ে আসতে পারে।

অনুভা : সেট্‌ ? সেট্‌ বলতে তো দেখছি একখানা ঘর।

শচীন : বেশ তো, ঘর যখন—তখন তুমি তার ঘরণী হয়ে যাও।

অনুভা : হতে পারি। কিন্তু আমার বিয়ে হয়নি।—প্রেম করার স্কোপ আছে।

শচীন : নিশ্চয় আছে। তুমি দিদি আর কেতকী তোমার ছোটো বোন। দুজনের কারোরই বিয়ে হয়নি। দুজনেই মিস।

অনুভা : না—আমি টাইপ করবো না। কেতকী দিদি, আর আমি ছোটো বোন।

কেতকী : আমার কিন্তু অনেক দিনের ইচ্ছে—আমি একটা টাইপ করি।

শচীন : তা বললে তো আর হয় না। যাকে যেমন মানায় তাকে তেমন করতে হবে। কেতকী তোমার ছোটো বোন, আর রবি তাকে ভালবাসে। কেতকীও রবিকে ভালবাসে।

কেতকী : কিন্তু আমি তো জয়ন্তকে…(কি যেন ভাবে) ঠিক আছে—আমি জয়ন্তকে—মানে রবিকে ভালবাসি।

অনুভা : আর আমার ভালবাসাটা কার সঙ্গে ?

শচীন : আমার সঙ্গে।

অনুভা : তোমাকে ভালবাসতে আমার ইচ্ছে করে না।

শচীন : অভিনয় করতে করতে অব্যেস হয়ে যাবে।

কেতকী : আমার কিন্তু মনে হচ্ছে—সামনে ওঁরা বোধ হয় অধৈর্য হয়ে পড়েছেন।

শচীন : না না, অধৈর্য হবার কি আছে ? আমরা তো আরম্ভ করে

দিয়েছি। তুমি বাড়ি নেই। রবি এসেছে তোমাদের বাড়িতে। তোমার দিদি তার সঙ্গে কথা কইছেন। সে তোমাকে ভালবাসে, তুমিও তাকে ভালবাসো। তবু সে কেমন যেন বিষণ্ণ।

অনুভা : এর মধ্যে তুমি আসছো কি করে?

শচীন : আমি? আমি তোমাদের পরিবারের একজন বন্ধু। এদের চার-হাত এক করে দিয়ে নিজের দু-হাত তোমার দু-হাতের সঙ্গে মিলিয়ে নেবো।

অনুভা : ও-রকম বেসুরো মিল আমার পছন্দ নয়।

শচীন : আমি কি এতই অসহ্য, অনুভা?

অনুভা : তুমি অসহ্য কিনা ভেবে দেখিনি, কিন্তু তোমার 'আমি' সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

কেতকী : আমরা কিন্তু নাটক থেকে সরে যাচ্ছি। সামনে ওঁরা আবার অধৈর্য হয়ে পড়ছেন।

শচীন : না না, অধৈর্য হবার কি আছে। আমরা তো আরম্ভ করে দিয়েছি। কই, রবি এসো এসো—কেতকীর দিদি একা—তোমার প্রবেশ। (রবি এক পাক ঘুরে অনুভার সামনে আসে।)

অনুভা : এই যে রবি—এসো—

রবি : কেতকী আছে? (কেতকী ও শচীন পিছনে সরে গিয়েছে।)

অনুভা : না—কেতকী তো নেই। কোথায় যেন গেল।

রবি : আচ্ছা—তাহলে আমি এখন আসি।

শচীন : (পিছন থেকে) মাথায় কিচ্ছু নেই—একেবারে গোবর। আরে তুই চলে গেলে নাটকটা এগোবে কি করে? অনুভা—প্লিজ, —তুমি ওই গাধাটাকে হেল্প করো।

অনুভা : এখনি চলে যাবে রবি? একটু বসো।

রবি : না, মানে—কেতকী নেই······

অনুভা : নাই বা থাকলো কেতকী—আমি তো আছি—

রবি : আপনি···মানে তুমি···অনুভা···

অনুভা : হ্যাঁ, আমি রবি···কতদিন ধরে তোমার অপেক্ষায়···

অনুভা : না না, আমি নই—কেতকী।

রবি : কিন্তু কেতকী তো নেই। তাই তো ফিরে যাচ্ছি।

অনুভা : একটু অপেক্ষা করো। ফিরে এলেও আসতে পারে।

রবি : ফিরে সে আসবে না, সে জয়ন্তর কাছে চলে গেছে। জয়ন্তকে সে ভালবাসে।

অনুভা : আয়নার সামনে কি কোনদিন দাঁড়িয়েছ রবি?

রবি : হঠাৎ এ-কথা কেন?

অনুভা : দেখেছ কি—তোমার ও-মুখ সব সময় কেমন যেন বিষণ্ণ।

শচীন : দেখো অনুভা, নাটকের বাইরে যেন চলে যেও না।

অনুভা : (ব্যঙ্গের সুরে শচীনকে) তুমি থাকতে সেটা সম্ভব নয়। (সমস্ত আবেগ নিয়ে রবিকে) তোমার ওই বিষণ্ণতাকে কি কেউ ভালবাসতে পারে?

কেতকী : এ-কথা তো তোমার বলার নয় অনুভা—এ তো আমি বলবো—দ্বিতীয় দৃশ্যে—যখন রবির সঙ্গে দেখা হবে—

অনুভা : (কেতকীকে) আমার ভুল হয়ে গেছে কেতকী—আমি বদলে নিচ্ছি। (রবিকে) কেতকীর কথা ভেবে দেখেছ রবি? তার পক্ষে তোমার ওই বিষণ্ণতাকে ভালবাসা সম্ভব কিনা?

রবি : কিন্তু প্রসন্ন হই কি করে? প্রসন্ন হবার মতো সুখ তো আমি কোনদিন পাইনি!

অনুভা : কোনদিন নয়?

রবি : না, কোনদিনও নয়······হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়েছিলাম······একদিন······ অনেকদিন আগে একদিন···বাবা আর সৎমার সঙ্গে কোথায় যেন গিয়েছিলাম···পথে হারিয়ে গেলাম···ইচ্ছে করে হারিয়ে গেলাম··· বাবা আর সৎমা এগিয়ে গেলেন···ফিরেও দেখলেন না···বড়ো আনন্দ হয়েছিল সেদিন নিজেকে হারিয়ে ফেলে···

শচীন : কি সব আবোল-তাবোল বকছ রবি—

রবি : আবোল-তাবোল কিছু বকিনি। যা ঘটেছিল তাই বলছি।

অনুভা : কিন্তু রবি···তারপর?······অন্য কোনদিন···আজ? একটু

আগের কোনো এক মুহূর্তে···?

রবি : আমি থিয়েটার ছেড়ে চলে যাচ্ছি অনুভা। আসবে তুমি আমার সঙ্গে ?

শচীন : থিয়েটার ছেড়ে চলে যাচ্ছ ? এখন ?

রবি : হ্যাঁ, এই মুহূর্তে।

শচীন : কিন্তু সামনে দর্শকেরা রয়েছেন। ওদের কাছে কি কৈফিয়ত দেবে ?

রবি : ওঁদের কাছে দেবার মতো কোনো কৈফিয়তই আমার নেই। দিতে পারতাম একমাত্র নিজেকে। কিন্তু নিতে ওঁরা রাজি হবেন না। আসবে অনুভা—আমার সঙ্গে ?

অনুভা : কিন্তু আমি তো কেতকি নই, রবি।

রবি : একবার না হয় চেষ্টা করে দেখতাম। তুমি আর আমি আবার নতুন করে আরম্ভ করা যায় কিনা।

কেতকী : কিন্তু তারই বা দরকার কি, রবি ? মাঝে মাঝে আমি না হয় তোমাকে জয়ন্ত বলে ভেবে নিতাম।

রবি : কিন্তু আমার পক্ষে জয়ন্তের ভূমিকায় অভিনয় করা আর সম্ভব নয় কেতকী। আসবে অনুভা আমার সঙ্গে ?

অনুভা : কি করে যাই, রবি। (দর্শকদের দেখিয়ে) তোমার যা দেবার ছিলো তা তুমি ওঁদের দিয়েছ। কিন্তু আমার যা দেবার আছে তার সবটুকু তো আমি এখনো দিতে পারিনি।

রবি : আচ্ছা, তাহলে চলি—(প্রস্থান-পথে অগ্রসর হয়ে যায়।)

অনুভা : (অস্ফুট স্বরে) রবি! (রবি এক মুহূর্ত যেন ইতস্তত করে। তারপর অন্তরালে চলে যায়।)

কেতকী : রবি বোধহয় আর ফিরে আসবে না, শচীন।

শচীন : ফিরে এসে লাভ কি ? অভিনেতা ও কোনদিনই হতে পারতো না।

অনুভা : তুমি বোধহয় হয়েছ—না শচীন ?

শচীন : তার মানে ? তুমি বেশ ভালো করেই জানো অনুভা······

অনুভা : আমার জানার তো দরকার নেই শচীন। তুমি নিজে জানো তো? তা হলেই হবে। গম্ভীরভাবে বলা হলো—অভিনেতা ও কোনদিনই হতে পারতো না! কিন্তু আজকের নাটকের যেটুকু অভিনয়, সেটুকু তো ওই করে গেল।

শচীন : তার মানে? আমার চরিত্র তখনো আসেনি, তাই! দ্বিতীয় দৃশ্য এলে আমি দেখিয়ে দিতাম না!

অনুভা : থাক শচীন।

শচীন : মানে? তুমি কি বলতে চাও কি?

অনুভা : আমি যা বলতে চাই তা সহ্য করতে পারবে শচীন?

শচীন : (অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে) সহ্য করা-করির তো কিছু নেই। নিজের ক্ষমতায় আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। বাইরে আমি তারকা বলে বিখ্যাত। এ-পর্যন্ত রোল যা পেয়েছি সাধ্যমত অভিনয় করেছি। দর্শকেরা আমায় যথেষ্ট তারিফ করেছেন। (কণ্ঠস্বর কেমন যেন ক্ষীণ হয়ে আসে) তোমার মতামতে আমার কি যায় আসে অনুভা—

অনুভা : ঠিক। আমার মতামতে কি-ই বা যায় আসে। ওঁদের তারিফ পেলেই হলো। এই আমাদের নাটক! আমাদের স্বরূপ কেউ যেন জানতে না পারে—আমরা যা নই, তাই সেজে আমরা অভিনয় করবো। যাকগে, এসো কেতকী, নাটকটা শেষ করি।

কেতকী : কিন্তু···

অনুভা : আবার কিন্তু কিসের? কই শচীন—এসো এসো।

শচীন : (তখনও নিজেকে আয়ত্তে আনতে পারেনি) না···মানে···

অনুভা : আবার না-মানে! এসো এসো—আমি তোমায় পার্ট ধরিয়ে দিচ্ছি।

কেতকী : কিন্তু রবি···?

অনুভা : আরে—রবির সম্পর্কে একটা কিছু ভেবে নিলেই হবে।—কি ভাবা যায় বলো তো শচীন?

শচীন : ভাবা যায়···মানে···(আবার আগের মতো হয়ে যায়) দাঁড়াও—

এক মিনিট। মনে পড়েছে। বলে দিলেই হবে, রবি কি একটা কাজে বম্বে চলে গেছে।

কেতকী : ঠিক। রবি কি একটা কাজে বম্বে চলে গেছে। (আলো কমে আসে।)

শচীন : একি! আলো কেন কমে আসছে? (প্রায় অন্ধকার হয়ে আসে।)

কেতকী : একি! এ যে অন্ধকার হয়ে এলো!

অনুভা : নাটক শেষ, শচীন।

শচীন : কিন্তু আমরা যে এখনো আরম্ভই করিনি।

অনুভা : আমাদের যেটুকু করার ছিলো, সেটুকু নিশ্চয়ই করেছি। নইলে নাটক শেষ হতো না শচীন।

শচীন : কিন্তু আমাদের কথা না-হয় বাদই দিলাম। দর্শকেরা রয়েছেন···

অনুভা : এখনি যবনিকা নেমে আসবে। ওঁরা বাড়ি ফিরে গিয়ে নিজেদের নাটক আরম্ভ করবেন। (সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যায়। শুধু একটু ঝাপসা আলো থাকে হচিরণের উপর।)

হরিচরণ : কিন্তু আমার যে সবে মর্নিং ওয়াকের শেষ। ডাক্তারের—খুড়ি—নির্দেশকের নির্দেশ—আমায় যে এখন একটু প্রফুল্ল হতে হবে। কই রে—তোরা কিছু বল্ না।—একি! কেউ নেই নাকি? তাহলে? ও···হয়েছে···হয়েছে···ঐটে মনে করি······তাহলেই প্রফুল্ল হওয়া যাবে···ঐ যে···ঝপ করে কয়লা নামিয়ে যেই না পেছন ফিরেছি, আমিও ফস করে বলে ফেললাম—কয়লাওয়ালা, কেউ তোমায় মনে করিয়ে দেয়নি—তুমি রূপকথার রাজপুত্র?··· ···কয়লাওয়ালা···কেউ কি তোমায় মনে করিয়ে দেয়নি···এ কি! হাসি আসছে না কেন? ···কয়লাওয়ালা···কেউ কি তোমায়···কিন্তু কই? প্রফুল্ল হচ্ছি না তো···কিন্তু···(ব্যাকুল স্বরে) আমায় যে প্রফুল্ল হতেই হবে···ডাক্তারের নির্দেশ···। শোনো···কে কোথায় আছো···দোহাই তোমাদের···আমাকে বাঁচতে হবে···তোমরা আমাকে প্রফুল্ল করে দাও! ···তোমরা আমকে প্রফুল্ল করে দাও!

যবনিকা

একটি যুদ্ধের ইতিহাস

।। চরিত্রলিপি ।।

অনন্ত ॥ অসীম

প্রথম ॥ দ্বিতীয় ॥ তৃতীয় ॥ চতুর্থ

সুলতা ॥ দণ্ডধর ॥ মলিনা

বিচারক ॥ মুনসি

আরও দু-একজন ॥ এবং অসংখ্য লোক

॥ যবনিকা সরে যাবার আগে ॥

কণ্ঠস্বর : সমন্তপঞ্চকে সেই ভীষণ গদাযুদ্ধ সংঘটিত হলো। যুদ্ধে দুই পক্ষ। এক পক্ষ ভীম, অন্য পক্ষ দুর্যোধন। সে যুদ্ধের প্রয়োজন মহাকাব্যের কারণে। তারপর যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। কারণ হয়ে উঠেছে জটিল। যুদ্ধের পদ্ধতি? সে যেন আরও জটিল। নাই বা বললাম সে কারণের ইতিহাস। যুদ্ধের কথাটাই হোক।

[যবনিকা সরে যায় ॥ আর চেয়ার, টেবিল এবং অনন্ত]

অনন্ত : (কাজ করিতে করিতে) কে ওখানে ?

অসীম : (প্রবেশ করিয়া টেবিলের নিকট আসে) আমি। অসীম।

অনন্ত : (কাজ করিতে করিতে) তারপর কি মনে করে ?

অসীম : কথাটা তোমার ঠিক নয়।

অনন্ত : কেন ? (যেমন কাজ করিতেছিল তেমনই করিয়া যায়)

অসীম : কেন আবার কি। ঠিক নয়।

অনন্ত : (কাজ করিতে করিতে) তবে কোন্‌টা ঠিক ?

অসীম : প্রতিবাদে যে কথাটা বলা হলো সেটাই।

অনন্ত : (কাজ করিতে করিতে) আমি তা মানি না।

অসীম : মানি না বললেই চলে কি ? মানতে হয়।

অনন্ত : (মুখ তুলিয়া) মানলাম না। (পুনরায় কাজে মন দেয়।)

অসীম : কেন মানবে না শুনি ?

অনন্ত : (কাজ করিতে করিতে) আমি যে কথাটা বলেছি, সেটা আমার মত বলে।

অসীম : লোকে যে মতটা মানে সেটা বলে না।

অনন্ত : আমি কিন্তু বলি।

অসীম : (দশ টাকার নোট বাহির করিয়া) তাহলে দশটা···

অনন্ত : কেন ?

অসীম : তোমার ঐ মতটার দাম।

অনন্ত : (কাজ করিতে করিতে) ওটা তোমায় এমনি দিলাম। ব্যবহার করতে পারো তুমি।

অসীম : ভেবে দেখো। দামটা কিন্তু আমি বাড়াচ্ছি—কুড়ি···তিরিশ··· পঞ্চাশ···

[এপাশ-ওপাশ হইতে কয়েকজনের প্রবেশ]

প্রথম : নীলাম হচ্ছে নাকি?

অসীম : হ্যাঁ। (অনন্তর কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই। সে কাজ করিয়া চলিয়াছে।)

দ্বিতীয় : কিসের?

অসীম : ওঁর একটা মত আছে, সেইটার!

তৃতীয় : মত? জিনিসটা কি রকম?

অসীম : শুনতেও ভালো—বলতেও ভালো।

চতুর্থ : তাই নাকি! তাহলে একটা দাম দিই?

অসীম : দিতে পারো। (অনন্ত একমনে কাজ করিতেছে।)

তৃতীয় : বিড্ কতো যাচ্ছে?

অসীম : পঞ্চাশ।

দ্বিতীয় : বেশ, আমার একটা রইলো। ষাট।

প্রথম : সত্তর।

চতুর্থ : আশি।

তৃতীয় : নব্বুই।

দ্বিতীয় : একশো।

অসীম : দুশো। (অনন্ত নিজের কাজ করিতেছে।)

প্রথম : তিনশো।

চতুর্থ : পাঁচশো।

তৃতীয় : সাতশো।

দ্বিতীয় : ন'শো।

প্রথম : হাজার।

অসীম : সুলতা বলছিলো তোমার নাকি ওদেশে যাবার খুব ইচ্ছে।

অনন্ত : (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) তুমি সুলতাকে চিনলে কি করে ?

অসীম : সুলতা টিউশানির মাইনে পায়নি, তাই ঘর-ভাড়ার টাকাটা তোমার কাছে চেয়েছি।

অনন্ত : (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) তুমি সুলতাকে চিনলে কি করে ?

অসীম : টাকাটা তুমি যোগাড় করতে পারোনি, তাই আর যাওনি।

অনন্ত : (প্রায় চিৎকার করিয়া) তুমি এতো কথা জানলে কি করে ?

অসীম : ঘর-ভাড়ার টাকাটা মিটিয়ে দিয়েছি কিনা, তাই।

অনন্ত : তাইতেই সে তোমাকে সব বলে দিলে ?

অসীম : এক দিনে তো বলেনি। সাতদিনে বলেছে। আমার যাতায়াত তো রোজ। (অনন্ত বসিয়া আবার কাজ করিতে আরম্ভ করে।)

চতুর্থ : নীলাম কি বন্ধ হয়ে গেল ?

অসীম : না না, কে বললে ? শোনো, তোমার ওদেশে যাওয়ার খরচা আমি দেবো।

তৃতীয় : যাওয়ার খরচা, থাকা-খাওয়া খরচা—দুটোই আমার।

দ্বিতীয় : ওর ওপর ফিরে আসার খরচাও ধরে দেবো।

প্রথম : বোঝার ওপর শাকের আঁটি ! ওটা তো দেবেই—তার ওপর হাত-খরচা।

চতুর্থ : ওসব তো আছেই। তাছাড়া পুরো জেট-প্লেনখানা ছেড়ে রেখে দেবো। যখন খুশি নিয়ে যাবে, যখন খুশি নিয়ে আসবে।

অসীম : ভেবে দেখো—যখন খুশি নিয়ে যাবে, যখন খুশি নিয়ে আসবে।

অনন্ত : (কাজ করিতে করিতে) আমি বেশ্যা নই।—নিজেকে বিক্রি করি না।

অসীম : মলিনা কিন্তু করে।

অনন্ত : (মুখ তুলিয়া) কে করে ?

অসীম : মলিনা।

অনন্ত : (কণ্ঠস্বরে যেন শাণ দেওয়া। উঠিয়া) তুমি গোয়েন্দা—না হিতাকাঙ্ক্ষী ?

অসীম : তোমার পরিবার ? ধ্বংস তার অনিবার্য। আর তুমি ? আজ

বাদে কাল শেষ হয়ে যাবে।

অনন্ত : তুমি যেতে পারো। আমি তোমাকে চিনি না।

অসীম : চেনার কোনো দরকার নেই। আমি খদ্দের।

প্রথম : ঠিক কথা। খদ্দেরকে তো না চিনলেও চলে।

দ্বিতীয় : নিশ্চয়। সব ব্যবসাদার কি সব খদ্দেরকে চেনে?

তৃতীয় : তবু তো বেচাকেনা চলে।

চতুর্থ : তবু তো ব্যবসা এগোয়।

অসীম : তাই তো বলছি—মতামতটা বিক্রি করে দাও, আমরা চলে যাই।

অনন্ত : সুলতা এখন কোথায়?

অসীম : এ'কদিন আমার ফ্ল্যাটে ছিলো। এখন এখানে।

[সুলতার প্রবেশ]

সুলতা : (অসীমকে) বাঃ বেশ লোক যা হোক। এই আসছি বলে ঢুকলে—আর বেরোবার নাম নেই! কেমন আছো অনন্ত?

অনন্ত : তুমি কি এদের সঙ্গে এসেছ।

সুলতা : হ্যাঁ, পরিচিত বন্ধুবান্ধব লোক। বললেন, চলো ঘুরে আসি।

অনন্ত : কতো দিনের পরিচয়?

সুলতা : এই তো—দিন সাতেক!

অনন্ত : আমার চিঠি পেয়েছিলে?

সুলতা : তোমার চিঠি যখন হাতে এলো তখন কোটির এই ফেস-পাউডারটা মুখে লাগিয়ে দেখছি কেমন দেখায়।

অনন্ত : ও, চিঠি পৌঁছবার আগেই তাহলে এদের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?

সুলতা : হ্যাঁ, ততক্ষণে চার মাসের বাড়ি ভাড়া মিটে গেছে। ভালো হোটেল থেকে খেয়ে ফেরার পথে অনেক দিনের পছন্দ করা ক'খানা শাড়ি কিনে এনেছি। নিউ এম্পায়ারে যাবো ছবি দেখতে। তৈরি হচ্ছি, এক হাতে কোটির ফেস পাউডার—এমন সময় আর এক হাতে এলো তোমার চিঠি, আমাদের সেই পুরনো বাড়ি ঘুরে।

অনন্ত : চিঠিটা তুমি পড়োনি, সুলতা ?

সুলতা : পড়েছিলাম অনন্ত।

অনন্ত : তবে ?

সুলতা : শুনলে তুমি দুঃখ পাবে অনন্ত।

অনন্ত : বলো না, শুনি।

সুলতা : পড়েছিলাম, কিন্তু কিছু মনে হয়নি।

অনন্ত : কেমন করে জানলে এ-কথাটা শুনে আমার দুঃখ হবে ?

সুলতা : দুঃখ তোমার হয়নি অনন্ত ?

অনন্ত : হয়েছে, কিন্তু তুমি কি করে জানলে ?

সুলতা : সত্যিই তো, আমি কি করে জানলাম ?

অনন্ত : তুমি আবার আমার চিঠিটা পড়ে দেখো সুলতা।

সুলতা : কিন্তু চিঠিটা তো হারিয়ে গেছে।

অনন্ত : চিঠিটা আমার মুখস্থ আছে—বলবো সুলতা ?

অসীম : বাজে কথায় কাজ কি। মতামতটা বিক্রি করে দাও—আমরা চলে যাই।

অনন্ত : টাকা আমি যোগাড় করেছিলাম, সুলতা। এই দেখো টাকা। কাজটুকু শেষ করেই নিয়ে যেতাম।

সুলতা : জানলে অনন্ত—ছোটবেলায় আমার চীনে-লণ্ঠন কেনার খুব সখ ছিলো।

প্রথম : চীনে-লণ্ঠন ?

সুলত : হ্যাঁ, চীনে-লণ্ঠন। কেমন যেম মনে হতো চীনে-লণ্ঠেনর আলোয় সব বদলে যায়। সব কিছু সুন্দর হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় : সত্যিই হয় নাকি ?

সুলতা : একবার যেন হয়েছিলো। খুব ছোটবেলায়—

তৃতীয় : তাই নাকি ? কি হয়েছিলো ?

সুলতা : নকুড় মিস্ত্রীর ছেলেকে চীনে-লণ্ঠনের আলোয় দেখেছিলাম।

চতুর্থ : কি রকম মনে হলো ?

সুলতা : মনে হলো—কেমন যেন রাজপুত্র···রূপকথার রাজপুত্র।

অসীম : তারপর একদিন সত্যিই চীনে-লণ্ঠন কিনলে, তাই না?

সুলতা : হ্যাঁ, একদিন চীনে-লণ্ঠন কিনে ঘর সাজালাম।

অনন্ত : কিন্তু ছোটবেলার সে আলো আর আসেনি।

সুলতা : না, সত্যিই আসেনি অনন্ত। ভাঙা ঘর কেমন যেন আরও ভাঙা দেখাতে লাগলো, আর বিশ্রী···।

অনন্ত : আমিও তো তাই বলছি সুলতা। ও চীনে-লণ্ঠনের···

অসীম : তোমার ঐ বলার দাম কতো?

প্রথম : একশো?

দ্বিতীয় : দুশো?

তৃতীয় : তিনশো?

চতুর্থ : চারশো?

অনন্ত : বলেছি তো তোমাদের আমি চিনি না।

সুলতা : কিন্তু সত্যি অনন্ত, তোমার ওই বলার আর কোনো দাম নেই।

অনন্ত : কি বলছো, সুলতা! এই তো সেদিন—

সুলতা : সেদিন পর্যন্ত তো দাম ছিলো অনন্ত। কিন্তু তারপর—

অনন্ত : হ্যাঁ—তারপর সুলতা···?

অসীম : তারপর দিন সাতেক আগে হঠাৎ দামটা হারিয়ে গেল।

সুলতা : হ্যাঁ, ঠিক সাতদিন আগে—

অনন্ত : কিন্তু সুলতা, আমি চিঠিতে লিখেছিলাম—

সুলতা : তখনও চিঠির কথা আসেনি অনন্ত—তোমার কথাই আছে। বাড়িওলা সবে তাগাদা দিয়ে গেছে—তোমাকে খবর পাঠিয়েছি—এমন সময়—

অসীম : এমন সময় চীনে-লণ্ঠনের আলোয় সব যেন কেমন বদলে গেল।

প্রথম : একশো চীনে-লণ্ঠনের দাম কতো?

দ্বিতীয় : কতো আর হবে—হাজার···

তৃতীয় : তাহলে আমাদের ব্যবসাটা—

চতুর্থ : ঠিক। ব্যবসাটা আমাদের চীনে-লণ্ঠন দিয়ে সাজিয়ে নিলে

মন্দ হয় না।

অনন্ত : সুলতা…!

সুলতা : সত্যি বলছি অনন্ত—বিশ্বাস করো। ছোটবেলার সেই চীনে-লণ্ঠনের আলাটো হঠাৎ যেন ফিরে এসে সব কিছু পালটে দিয়ে গেল।

অনন্ত : তুমি বাইরে অপেক্ষা করো সুলতা। আমি এদের তাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

সুলতা : কিন্তু তুমি চীনে-লণ্ঠন নিয়ে আসবে না অনন্ত।

অনন্ত : না সুলতা, আমাদের পথ সূর্যের আলোর পথ। সে পথে তো চীনে-লণ্ঠনের দরকার নেই।

সুলতা : কিন্তু অনন্ত, বাড়িওলা ঘর থেকে বার করে দেবার ভয় দেখিয়ে চলে গেল। বললে—জল বন্ধ করে দেবো, আলো বন্ধ করে দেবো। তোমাকে চিঠি লিখে একা ভাবছি। হঠাৎ তোমার ঐ সূর্যের আলোর পথে বাবাকে দেখলাম। মরবার আগে পর্যন্ত পাওনাদারের তাগাদা পেছনে নিয়ে ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে বাবা অফিস করেছেন। মা অভাবের জ্বালায় বিশ্রী মুখ করে বিশ্রী কথাবার্তা বলে গেছেন। আর আমি?—আমি নাকি ফোটা ফুলের মতো জন্মেছিলাম। কিন্তু সেই ফোটা ফুলের চেহারা নিয়ে দিনের পর দিন তোমার ঐ সূর্যের পথে ক্লেদাক্ত ঘর্মাক্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি।

অসীম : তাই চীনে-লণ্ঠনের আলো নিয়ে এলাম।

প্রথম : একশো—

দ্বিতীয় : দুশো—

তৃতীয় : তিনশো—

চতুর্থ : চারশো চীনে-লণ্ঠনের আলো।

সুলতা : আর জানলে অনন্ত?—সে আলোয় নীতি, মত, পথ, আমার ঘাম-ঝরা দিন, কালি-পড়া রাত, আর সেই সঙ্গে তুমি—সব যেন কোথায় মিলিয়ে গেল।

অনন্ত : কিন্তু সুলতা, আমি তো ভাবতেও পারিনি—নকল আলোর

আলোয় এমনি করে তুমি নিঃশেষ হয়ে যাবে!

প্রথম : তবে?—কি তুমি ভেবেছিলে শুনি?

দ্বিতীয় : তুমি কি ভেবেছিলে রাতের পর রাত সুলতা একা কাটিয়ে দেবে?

তৃতীয় : তুমি কি ভেবেছিলে বিছানায় সুলতার পাশে শোবার মতো লোক তুমি ছাড়া আর কেউ নেই?

চতুর্থ : তুমি জানতে না অসীম আছে? জানতে না তুমি—অসীম না থাকলে আমরা আছি?

অসীম : তুমি কি ভেবেছিলে স্বর্গ থেকে নেমে আসা সুলতা এখনও মর্তের মাটিতে পা দেয়নি?

অনন্ত : আমি এটাকে সভ্য শহর জানতাম। কিন্তু এ তো দেখছি জঙ্গল!

প্রথম : গতিক কিন্তু সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।

দ্বিতীয় : হ্যাঁ, আমারও কেমন মনে হচ্ছে—যেন পালাবার মতলব করছে অনন্ত।

তৃতীয় : পালালেই হলো। পালিয়ে একবার দেখুক না।

চতুর্থ : আমি আছি কি করতে? চোট করে দেবো না।

অসীম : কি দরকার চোট করে দেবার? মতামতটা বিক্রি করে দাও—আমরা সবাই চলে যাই।

চারজন : (একসঙ্গে)—কি আছে? বিক্রি করে দাও না? আমরা সবাই চলে যাই।

অনন্ত : আশ্চর্য সুলতা! আমি তো এতদিনও কিছু জানতে পারিনি। এরা তো দেখছি সাতদিনে সব কিছু জেনে ফেলেছে।

সুলতা : জানবে না কেন? অসীমকে যে আমি সব বললাম।

অনন্ত : আমাকে তো কোনদিন কিছু বলোনি অনন্ত—এই সব ভাবনার কথা।

সুলতা : তোমার সঙ্গে আমার শেষ যেদিন দেখা হয়েছে সেদিনও তো বলার মতো অবস্থায় এসে পৌঁছুইনি। বাড়িওলা যখন তাগাদা দিয়ে চলে গেল, ভাবনা আরম্ভ হলো তখন। তারপর এলো অসীম।

মনে হলো—এই হয়তো সুযোগ। ঘাম-ঝরা দিন, আর চোখে-কালি-পড়া রাতের এবার হয়ত শেষ।

অসীম : সুলতা বুদ্ধিমতীর মতো ভেবেছে, অনন্ত। তুমিও বুদ্ধিমানের মতো ভাবতে আরম্ভ করো। আমাদের বুদ্ধি একটা নেবে, অনন্ত?

দ্বিতীয় : আমাদের সঙ্গে একটু বাইরে যাবে?—বারে?

তৃতীয় : ভালো মাল···দু'পেগ টেনে আসবে?

চতুর্থ : মাথা দেখবে একেবারে সাফ হয়ে গেছে। আসবে আমাদের সঙ্গে?

অনন্ত : এরা তো তাড়ালেও যাবে না, সুলতা। চলো—আমরাই যাই।

সুলতা : এই সাতদিন পরেও একথা বলতে পারছো অনন্ত!

অনন্ত : কেন পারবো না। আমি তো ওই সাতদিনের কথাটা বুঝি!

অসীম : বোঝো বলেই তো বলছি—মতামতটা বিক্রি করে দাও।

চারজন : (একসঙ্গে) আমরা তাহলে হিসেবটা মিটিয়ে চলে যাই।

অনন্ত : আজ আটদিনের দিন আমরা নতুন করে দিন আরম্ভ করবো, সুলতা।

সুলতা : চলো অসীম, আমরা এখান থেকে যাই। এ লোকটা মদ না খেয়েও মাতাল!

অনন্ত : কিন্তু তোমার ও-ঘাম-ঝরা দিনের কথা আমি বুঝি, সুলতা। বিশ্বাস করো—তোমার ও-চোখে-কালি-পড়া রাতের অনুভব আমার অন্তরে।

সুলতা : কিন্তু তোমার অনুভবকে আমার তো বইবার ক্ষমতা নেই, অনন্ত। তোমরা আসবে না অসীম?

অসীম : শুনলে তো সুলতার অন্তত অনুভবটাকে বিক্রি করে দাও।

প্রথম ও দ্বিতীয় : (একসঙ্গে) ঠিক কথা। অন্তত অনুভবটাকে বিক্রি করে দাও।

তৃতীয় ও চতুর্থ : (একসঙ্গে) সঙ্গে সঙ্গে মতামতটাও বিক্রি হয়ে যাবে।

[দণ্ডধরের প্রবেশ]

দণ্ডধর : (প্রবেশ করিতে করিতে) কিসের ব্যবসা? কিসের বেচাকেনা?

(প্রবেশ করিয়া অসীমকে দেখিয়া) এ কি, হুজুর ?

অসীম : হ্যাঁ দণ্ডধর, আমি।

দণ্ডধর : গরীবের ব্যবসায় আপনি হুজুর ?

অসীম : হ্যাঁ দণ্ডধর। কিছু কিনতে এলাম।

দণ্ডধর : কি বলছেন হুজুর ! আপনি এলেন কিনতে, আমার ব্যবসায় ? (অনন্তকে দেখাইয়া) বলেছেন এঁকে ?

অসীম : বলেছিলাম। উনি বেচতে রাজি নন।

দণ্ডধর : কি এমন জিনিস অনন্তবাবু যে, হুজুরকেও বেচতে রাজি নন ?

অসীম : ওঁর একটা মত আছে—আমরা সেটা কিনতে চেয়েছি।

দণ্ডধর : কিন্তু অনন্তবাবু—আপনি বোধহয় জানেন না, একটু আগে আমার মতটা আমি ওঁদের বেচে দিয়েছি।

অনন্ত : খেতে আমরা দু'টি প্রাণী, সুলতা। যা হোক করে আমাদের চলে যাবে। মলিনা যদি আমাদের সঙ্গে থাকে তবুও—

সুলতা : ঐ যা হোক করে কথাটাতেই আমার আপত্তি, অনন্ত।

অসীম : একটা কথা তুমি বার বার ভুলে যাচ্ছ, অনন্ত। সাতদিন সাতরাত সুলতা আমার ভাড়া করা ফ্ল্যাটে কাটিয়েছে।

অনন্ত : কিন্তু তার আগের তিন বছর? তখন আমি আর সুলতা ছিলাম, তুমি ছিলে না। তিন বছরের কাছে সাতদিন সাতরাত কতটুকু সময় অসীম ?

অসীম : দামটা অমি ডবল করে দিচ্ছি অনন্ত।

অনন্ত : বলেছি তো। তুমি তোমার লোকজনদের নিয়ে যেতে পারো। আমি তোমাদের চিনি না।

অসীম : বেশ, তাই হোক। তবে বাজারটা একবার যাচাই করে দেখলে পারতে অনন্ত।

দণ্ডধর : আপনি তো আচ্ছা গাধা, অনন্তবাবু !

প্রথম : দেশে তোমার বুড়ো বাপ-মা আছে অনন্ত।

দ্বিতীয় : তোমার বোনের নাম মলিনা।

তৃতীয় : সুলতাকে তুমি ভালোবাসো অনন্ত।

চতুর্থ : ওদের যাবার ইচ্ছে—সেটাও খুব একটা ছোটো কথা নয়।

অনন্ত : না না না, তবুও নয়! কিছুতেই নয়! আমি তোমাদের স্বীকার করি না—আমি তোমাদের চিনি না!

দণ্ডধর : আজ থেকে আপনার চাকরি নেই, অনন্তবাবু।

প্রথম : দেখো অনন্ত—আজ থেকে তুমি বেকার।

দ্বিতীয় : তোমার রুজি-রোজগার চলে গেল, অনন্ত।

তৃতীয় : ভেবে দেখো অনন্ত—তোমার ভিত শুদ্ধু নড়ে গেল।

চতুর্থ : অনন্ত, তুমি বেকার···অনন্ত, তোমার রুজি-রোজগার নেই··· অনন্ত—তোমার ভিত শুদ্ধু নড়ে গেছে।

অসীম : তাই তো বলছি অনন্ত, তোমার মতামতটা বেচে দাও। আমরা চলে যাই—সব যেমন ছিলো তেমন হোক।

অনন্ত : (প্রস্থান পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে) আমি তাহলে যাচ্ছি, সুলতা। তুমি যদি চাও—আমার সঙ্গে আসতে পারো।

সুলতা : কথাটা তো ক'বার বললে অনন্ত।

অনন্ত : বেশ, তবে তাই হোক।

অসীম : অনন্ত—

অনন্ত : বলেছি তো অসীম, তোমার আমার মধ্যে পরিচয় নেই।

অসীম : কেন বলো তো ?

অনন্ত : জঙ্গলের জানোয়ার আর স্বাধীন মানুষ—পরস্পরের মধ্যে কি পরিচয় আছে অসীম ?

অসীম : স্বাধীন মানুষটি কি তুমি নাকি ?

অনন্ত : নিশ্চয়। আমি, আমার আশ-পাশের লোক, আমাদের আদর্শ, সব মিলিয়ে নিশ্চয় আমরা স্বাধীন। (প্রস্থান।)

অসীম : তবু শুনে রাখো অনন্ত। সুলতাকে দরকার হলে আমার ফ্ল্যাটে পাবে। মলিনাকেও দরকার হলে আমার অপিসের খাসকামরায় পাবে। আর আমাকে দরকার হলে—বড়ো রাস্তার ব্যবসায় পাবে। (ততক্ষণে অনন্ত চলিয়া গিয়াছে।)

[অন্ধকার]

কণ্ঠস্বর : সমন্তপঞ্চকের সেই ভীষণ গদাযুদ্ধ। দুই মহাবীর গদা হাতে নিয়ে দু'টি বন্য বৃষের মতো ভীষণ গর্জন করতে করতে আক্রমণ করলেন পরস্পরকে। গদার ঘূর্ণনে অন্তরীক্ষ, ভূগর্ভ, মর্ত্যভূমি ও মহাসলিল প্রকম্পিত হলো। দেব, দৈত্য, দানব, নর রাক্ষস ও নাগ, ত্রিভুবনের যাবতীয় অধিবাসী সমন্তপঞ্চককে নিজদের দর্শকরূপে উপস্থিত করলেন।

[আলো আসার আগেই নানা কণ্ঠের স্বর]

: কি দর যাচ্ছে ?

: কোন্‌টার দর বলবো বলো। এক এক জিনিস এক এক রকম।

: পর পর বলে যাও শুনি।

: বক্তৃতায় পঁচিশ, লিখে পঞ্চাশ, বই করে একশো, আর দল করে বেঁধে ছেঁদে অন্য দেশে পাঠালে হাজার।

: দর কমাও দর কমাও, তোমাদের প্রতিপক্ষরা এমনি দিচ্ছে।

: এমনি দিচ্ছে ? হঠাৎ ?

: হঠাৎ তো নয়। তারা বরাবর এমনিই দিয়ে আসছে।

: কিন্তু কেন ?

: তারা বলে ও-জিনিস বেচবার নয়, দেবার। ওটা নাকি সামগ্রী। তাই তো বলছি—দর কমাও, দর কমাও।

[আলো আসে ॥ বড় রাস্তার ব্যবসা]

অসীম : এক নম্বরে কতো গেছে ?

প্রথম : চারশো পঁচিশ।

অসীম : দু'নম্বরে ?

দ্বিতীয় : চারশো পঞ্চাশ।

অসীম : তিন নম্বরে ?

তৃতীয় : চারশো পঁচাত্তর।

অসীম : চার নম্বরে ?

চতুর্থ : চারশো।

অসীম : কম কেন ?

চতুর্থ : কখনো কম কখনো বেশি। ব্যবসার তো এইটেই নিয়ম।

: অনন্ত দেখা করতে চাইছেন।

অসীম : ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

[মলিনার প্রবেশ]

মলিনা : তুমি কি এখম খাসকামরায় আসবে অসীম ? আমি কি তৈরি হয়ে থাকবো ?

অসীম : একটু বাদে যাবো। অনন্ত এসেছে।

[অনন্তর প্রবেশ]

মলিনা : অনন্ত! (অনন্ত কোনো দিকে না তাকাইয়া সোজা অসীমের কাছে আগাইয়া আসে।)

অসীম : তারপর অনন্ত, কি মনে করে ?

অনন্ত : মলিনাকে নিয়ে যেতে এলাম।

মলিনা : কিন্তু আমি তো যাবো না, অনন্ত। আমি এখানে বেশ আছি।

অনন্ত : মলিনা এখানে কি করে অসীম ?

অসীম : কেন ? আমার খাসকামরার খাস চাকুরে।

অনন্ত : তার মানে—দিনে মলিনা, আর রাতে সুলতা ?

অসীম : তোমার যেমন ইচ্ছে মানে করে নিতে পারো।

অনন্ত : তোমার জামাকাপড় গুছিয়ে নাও, মলিনা।

মলিনা : তোমায় তো বললাম অনন্ত—আমি যাবো না।

অনন্ত : মলিনাকে কি তুমি বিয়ে করবে অসীম ?

অসীম : কিছু তো ঠিক করিনি। ক'দিন যাক। তারপর হয় মলিনা না হয় সুলতা। কিংবা···হয়তো দু'জনের কেউই নয়।

মলিনা : শুনলাম, তোমার নাকি চাকরি গেছে অনন্ত।

অনন্ত : তাতে কি এসে গেল। তোমার চাকরি তো রয়েছে।

মলিনা : সত্যি অনন্ত। অনেকদিন বাদে ভালো কাজ একটা পেয়েছি। খাসকামরার খাসচাকুরে। ভালো খাওয়া, ভালো থাকা···জানলে অনন্ত, দেশে কিছু কিছু করে টাকা পাঠাচ্ছি।

অনন্ত : জানি। তোমার টাকার ওপর অসীমের টাকা। দেশে এখন

বেশ ভালো টাকাই যাচ্ছে।

মলিনা : আমার মুখের দিকে অমন করে তাকিয়ে কি দেখছো অনন্ত।

অনন্ত : জিনিস বিক্রি করলে দালালে কমিশন কাটে। তাই দেখছি—কমিশনের ছাপ মুখের ওপর পড়েছে কিনা।

মলিনা : আমি তো কিছু বিক্রি করিনি অনন্ত। আমি যুবতী। যৌবননের ধর্ম পালন করছি।

অনন্ত : নিজকে তুমি মিথ্যে বোঝাচ্ছ মলিনা। তোমার যৌবন তুমি বিক্রি করছো।

মলিনা : এতদিন তো দুঃখের পেছনে দড়ি দিয়ে এলাম, অনন্ত।—কিছু লাভ হলো কি।

অনন্ত : তাই বলে এই বেচা-কেনার হাটে নামবে ?

মলিনা : সেটাই তো স্বাভাবিক ! বেচা-কেনার কাল। ভালো দাম পাচ্ছি, বেচছি। আমি খুব সুখে আছি অনন্ত ! তুমি যাও।

প্রথম : আমরাও তো সেই কথাই বার বার বলছি।

দ্বিতীয় : বলছি তো—তোমার মতামতটাও তুমি বেচে দাও।

তৃতীয় : বেচে দাও—দেখবে সুখের আর অবধি নেই।

চতুর্থ : বেচে দাও—দেখবে সুলতা, মলিনা—সব তোমার কাছে ফিরে এসেছে।

অনন্ত : দেশে মার সঙ্গে দেখা করেছিলাম আসীম। দেখলাম সেখানেও তোমার ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত।

অসীম : কেন—মা কিছু বললেন ?

অনন্ত : বললেন—অসীম আমার কেউ নয় বটে তবু যেন পেটের ছেলের চেয়েও বেশি।

অসীম : তোমার জামাকাপড়গুলো বদলে ফেল অনন্ত। বিশ্রী ভাবে ছিঁড়ে গেছে। (কলিং বেল টিপিতেই একজন লোক জামাকাপড় লইয়া আসে।)

অনন্ত : (জামাকাপড় লইয়া অন্তরালে চলিয়া যায়। অন্তরাল হইতে) কি ভাবছো, অসীম ?

অসীম : কি বলো তো ?

অনন্ত : জামাকাপড় বদলে আমাকে সমান করে নিলে—তাই না ?

অসীম : যদি বলি, তাই !—খুব ভুল হবে কি ?

অনন্ত : কিন্তু সমান করে নেওয়ার জন্য এতো আগ্রহ কেন ?

অসীম : সমান সমান না হলে লড়ায়ে মজা হয় না।

অনন্ত : (বাহিরে আসিয়া) সত্যিকারের সমান করে নিয়ে লড়াই করতে পারবে অসীম ?

অসীম : হুকুম করেই দেখো।

অনন্ত : তামিলটা কে করছে।

অসীম : কেন, আমি—তোমার বান্দা।

অনন্ত : ঠাট্টা করছো ?

অসীম : হুকুমটা করেই দেখো।

অনন্ত : তাহলে সত্যিকারের সমান হয়ে নিই, তারপর নতুন পর্যায়ে লড়াই শুরু হবে—দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ।

অসীম : যা তোমার অভিরুচি।

অনন্ত : তাহলে হুকুমই একটা করছি—

অসীম : বললাম তো এক্ষুণি তামিল হবে।

অনন্ত : তোমার ব্যবসাটা এখন থেকে আমার।

অসীম : বেশ, তাই হলো।

অনন্ত : (চারজনকে দেখাইয়া) এদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক অসীম ?

অসীম : এদের আলাদা আলাদা ব্যবসা। এদের ব্যবসার সঙ্গে আমার ব্যবসা মিলে এই বড়ো ব্যবসা।

অনন্ত : আজ থেকে এদের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রথম : মনে রেখো আমি কিং অ্যাণ্ড কিং—

দ্বিতীয় : আমি শমুলকা এণ্ড গোমুলকা—

তৃতীয় : আর আমি হরচন্দ্র অ্যাণ্ড সন্স্—

চতুর্থ : আর আমি কে জানো তো ? ব্রাদার্স লিমিটেড।

অসীম : তবু তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

অনন্ত : তোমার ব্যবসায় কর্মচারী কতো, অসীম ?

অসীম : ছ'শো।

অনন্ত : তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ?

অসীম : যা সর্বত্র হয়ে থাকে।—গোলোযোগের।

[অন্তরালে]

কমরেডস—লড়াই আমাদেয় শুরু। আপনারা প্রত্যেকে ভেবে দেখুন কমরেডস—ভালোভাবে বাঁচার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। অথচ মাইনে যা পাই তাতে কোনোমতে বাঁচাও সম্ভব নয়—ভালোভাবে বাঁচা তো দূরের কথা। কমরেডস—আপনারা আপনাদের বাড়ির কথা ভেবে দেখুন—ভেবে দেখুন আপনাদের স্ত্রী-পুত্র পরিবারের কথা। অশিক্ষা-অনাদর-আবর্জনা তাদের জীবনের নিত্য উপকরণ। সভ্যজগতে বাস করেও সভ্যতার শরিক হবার মতো ক্রয় ক্ষমতা তারা অর্জন করতে পারেনি। তাই কমরেডস—আমাদের মজুরি বাড়ানোর দাবি, আমাদের পুজো-বোনাসের দাবি। দাবী আমাদের জয়যুক্ত হবেই—কমরেডস—হার আমরা মানতেই পারি না।···ইন কিলাব জিন্দাবাদ···ইন কিলাব জিন্দাবাদ···আমাদের দাবি মানতে হবে···আমাদের দাবি মানতে হবে···

অনন্ত : তোমার সঙ্গে ওদের আয়ের তফাৎ কত অসীম ?

অসীম : অনেক।

অনন্ত : আজ থেকে তফাৎটা বাদ দিয়ে দাও।

অসীম : তাই দিলাম অনন্ত। (কলিং বেল টিপিলে একজনের প্রবেশ) আজ থেকে এই ব্যবসার সমস্ত আয় সবায়ের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হয়ে যাবে। (লোকটির প্রস্থান।)

[অন্তরালে]

আমরা পেয়েছি কমরেডস। কিন্তু তবু এ পাওয়ায় বিশ্বাস নেই। ধর্মঘটের নোটিশ আমরা তুলে নিচ্ছি—কিন্তু দাবি হিসাবে এই পাওনাকে আদায় করে নেওয়ার কর্তব্য আমাদের রইলো

কমরেডস···ইন কিলাব জিন্দাবাদ···ইন কিলাব···

প্রথম ও দ্বিতীয় : (একসঙ্গে) এ রকম চুক্তি তুমি করতে পারো না, অসীম—

অসীম : আমি তো করিনি—মালিক করেছেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ : তোমার অনেক জোচ্চুরির হিসেব এখন আমাদের হাতে।

চারজন : (একসঙ্গে) আমরা বিশ্বাস-ভঙ্গের মামলা দায়ের করবো।

অসীম : করতে পারো তোমাদের যা ইচ্ছে। মালিকের হুকুম তামিল করা ছাড়া আর আমার কোনো কাজ নেই।

অনন্ত : সুলতাকে ডাকো, অসীম।

অসীম : সুলতা—

সুলতা : ডাকছিলে অসীম ?

অসীম : আমি তো ডাকিনি—মালিক ডেকেছেন।

সুলতা : কে মালিক ?—অনন্ত ?

অসীম : হ্যাঁ, সুলতা।

অনন্ত : এখন আমাকে বিয়ে করবে সুলতা ?

সুলতা : নিশ্চয় করবো। বিয়েতে তো আমার আপত্তি নেই অনন্ত। বর আমার মালিক হলেই হলো।

অনন্ত : এখন আমার সঙ্গে ফিরে যাবে মলিনা ?

মলিনা : না অনন্ত, সেটা আর হয় না। নিজেকে বিক্রি করেছি— কিন্তু কোথায় যেন অসীমকেই ভালোবেসেছি।

অনন্ত : দুটো বিয়ের যোগাড় করো অসীম।

অসীম : কার কার, অনন্ত ?

অনন্ত : একটা তোমার আর মলিনার, আর একটা আমার আর সুলতার।

অসীম : বেশ তো, সামনেই আদালত—চলো, যাওয়া যাক।

[আদালত কক্ষ]

বিচারক : আজ ক'টা মামলা।

মুনসি : তিনটে, হুজুর।

বিচারক : কি কি ?

মুন্‌সি : দুটো বিয়ের, একটা বিশ্বাসভঙ্গের।

বিচারক : বিশ্বাসভঙ্গটাই আগে হোক। শেষে বিয়ে দেওয়া যাবে।

মুন্‌সি : বিশ্বাসভঙ্গের মামলা হাজির ?

চারজন : (একসঙ্গে) হাজির, হুজুর।

বিচারক : কিসের নালিশ তোমাদের ?

চারজন : (একসঙ্গে) বিশ্বাসভঙ্গের হুজুর—

বিচারক : নালিশ কার নামে ?

চারজন : (একসঙ্গে) প্রথমে ভেবেছিলাম অসীমের নামে, কিন্তু এখন দেখছি অনন্তর নামে।

বিচারক : নালিশের আবার আগে-পরে আছে নাকি ?

চারজন : (একসঙ্গে) প্রথমে মালিক ছিলো অসীম—হুজুর, কিন্তু এখন মালিক হচ্ছে অনন্ত।

বিচারক : চুক্তিটা ভেঙেছে কে ?

চারজন : (একসঙ্গে) অনন্ত।

বিচারক : কি করেছ তুমি ?

অনন্ত : তেমন কিছু তো করিনি।

বিচারক : (অসীমকে) তুমি জানো ও কি করেছে ?

অসীম : ব্যবসার সমস্ত আয় সকলের মধ্যে সমান ভাগ করে দিয়েছে।

বিচারক : এতে কোন্ চুক্তিটা ভঙ্গ হচ্ছে ?

চারজন : (একসঙ্গে) আজ্ঞে লোয়ার কস্ট্‌স্, অ্যাণ্ড হায়ার প্রফিটের চুক্তিটা।

বিচারক : সর্বনাশ ! এ চুক্তি তো জাতির মেরুদণ্ড ! আসামী অনন্তরাম —তোমার আজীবন কারাদণ্ড। (কলম ভাঙিয়া বাহির হইয়া গেলেন। মুন্‌সির ইঙ্গিতে দুই প্রান্ত হইতে পুলিস অনন্তকে লইয়া গেল।)

মুন্‌সি : আপনাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে। ইওর অনার ফিরে

এসেই বিয়েটা দিয়ে দেবে।

অসীম : বিয়ে? বিয়ে তো আর হবে না।

মুন্‌সি : বা রে! আমার মিষ্টিটা—

অসীম : এই টাকায় তোমরা কিনে খেয়ো। (চারজনকে) কি রকম হলো?

চারজন : (একসঙ্গে) এমনটা কখনও হয়নি।

অসীম : ব্যবসার কি খবর?

চারজন : (একসঙ্গে) রেল কি চাক্কা নেহি চলে গা—

অসীম : মানে?

চারজন : (একসঙ্গে) মানে আবার কি—ধর্মঘট।

অসীম : চলো তাহলে ফেরা যাক।

চারজন : (একসঙ্গে) চলো—

সুলতা : আমি কি তোমার সঙ্গেই যাবো অসীম?

অসীম : নিশ্চয়!

সুলতা : কিন্তু আমার দিনের আলোর অনন্ত অসীম—

অসীম : তার কথা তো শুনলে সুলতা—

সুলতা : কিন্তু আমার অনন্তব কথা আবার মনে পড়ছে, অসীম। তোমার সঙ্গে যাওয়া তো আমার হলো না। (প্রস্থান।)

অসীম : সুলতা—

মলিনা : আর আমি, অসীম?

অসীম : তোমাকে তো নিতে পারবো না মলিনা।

মলিনা : কেন অসীম?

অসীম : ঐ যে তুমি বললে—বিক্রিও করেছ, ভালোও বেসেছ।

মলিনা : তাহলে আমার দামটা মিটিয়ে দাও অসীম।

অসীম : নিশ্চয়। ক'টা দাম পাওনা আছে তোমার?

মলিনা : খাসচাকুরে থাকাকালীন চারটের।

অসীম : এই নাও।

অসীম : কই, এবার বোতল বার করো।

প্রথম ও দ্বিতীয় : তা না-হয় করছি, কিন্তু ওদিকে—

অসীম : ওদিকে ? ওদিকে আবার কি ?

তৃতীয় ও চতুর্থ : ঐ যে বললাম, রেলকা চাক্কা নেহি চলেগী—

অসীম : মানে ?

চারজন : (একসঙ্গে) মানে, ধর্মঘট—

অসীম : ধর্মঘট ! যত সব ক্লীবের দল ! (টেবিলে আঘাত করিয়া বোতল ভাঙে। পান করিয়া) লড়ায়ে আমার জিত।

[এমন সময় মেঘ গর্জনের ন্যায়]

: ইন কিলাব—

: জিন্দাবাদ—

: অনন্তরামের—

: মুক্তি চাই—

: ইন কিলাব—

: জিন্দাবাদ—

অসীম : কি চাই তোমাদের ?

মলিনা : অনন্তরামের মুক্তি।

অসীম : কিন্তু মলিনা, তুমি ?

মলিনা : শুধু আমি নই অসীম, সুলতাও আছে।

অসীম : সুলতা, তুমি ?

সুলতা : শুধু আমি নই অসীম, আমার সঙ্গে এরাও আছে।

: মলিনা বিক্রি করেও ভালোবাসতে পারে। তাইতো মলিনা আমাদের সঙ্গে। চীনে-লণ্ঠনের আলোয় তোমার শয্যা সুলতার আশ্রয়—তাই সূর্যালোকের পথে সে আমাদের পতাকাবাহী।

অসীম : কিন্তু অনন্তরামের মুক্তি ? সে মুক্তির মালিক তো আমি নই।

: তবু সে মুক্তি তোমাকেই এনে দিতে হবে। ও বিচারক তোমার—ও বিচারকক্ষ তোমার। ও বিচার তোমারই করা—ও রায় দেওয়াও

তোমার। তাই প্রাণ দিয়েও ও মুক্তি তোমাকেই এনে দিতে হবে।

: ইন কিলাব—

: জিন্দাবাদ—

: অনন্তরামের—

: মুক্তি চাই—

: ইন কিলাব—

: জিন্দাবাদ—

(অসংখ্য লোকের মিছিল চারজনের সঙ্গে অসীমকে নিঃশেষে অবলুপ্ত করিয়া দেয়। তারপর ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে মিছিলের প্রস্থান। সঙ্গের চারজনের কোনো চিহ্ন নাই। মঞ্চে অসীম একা। যুদ্ধ-ক্লান্ত পরাভূত অসীম)

[আলো কমিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে]

কণ্ঠস্বর : আর সেই বিশাল প্রান্তরে অষ্টাদশ দিবস ব্যাপী যুদ্ধান্তে ভগ্নোরু হয়ে পড়ে রইলেন দুর্যোধন। কোথায় আজ তাঁর মিত্রগণ? কোথায় আজ তাঁর স্বজনবর্গ? কোথায় তাঁর রাজ্য আর ধনসম্পদ? কঠিন প্রান্তরভূমি আজ তাঁর শয্যা, অনন্ত প্রসারিত অন্ধকার আকাশ আজ তাঁর চন্দ্রাতপ, হিংস্র শ্বাপদের দল তাঁর পরিচারক।

॥ যবনিকা ॥

এই সব স্বগতোক্তি

॥ চরিত্রলিপি ॥

অন্যতমা । প্রথম নায়ক । দ্বিতীয় নায়ক

তৃতীয় নায়ক । চতুর্থ নায়ক

পঞ্চম নায়ক ও সংশপ্তক একতান সমূহ

[আলোকিত শূন্য মঞ্চ। মঞ্চের উপর অর্ধবৃত্তাকারে ঘেরা কয়েকটি উচ্চস্থান। অল্পক্ষণের জন্য সম্পুর্ণরূপে আলোকিত থাকার পর অন্ধকার হইয়া আসে। সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া যাওয়ার পর মুহূর্তেই আলো আসিয়া পড়ে বামদিকের সম্মুখস্থ উচ্চস্থানটির উপর। সেই আলোর উচ্চস্থানের উপর প্রথম নায়ককে দেখা যায়]

প্রথম নায়ক : খোলা রাস্তায় শিকে ঝোলানো খণ্ড খণ্ড মাংস খণ্ড,

চাটের আয়োজনও সম্পূর্ণ।

আমি কিন্তু গন্ধেই মাতাল।

সামনের ঐ পথ ধ'রে আমি এখানে এসে পৌঁছেছি।

এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না,

কিন্তু ঐ ওদিকে মোড় বাঁকলেই দেখা যাবে—

পথের ত্ন'ধারে তোলা উনুনের সার।

আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী

এঁকে বেঁকে পাকিয়ে পাকিয়ে আমারই পিছন পিছন এসেছিলো

নিঃশ্বাস-আটকে-আসা ধোঁয়া।

চোখ জ্বলে যায়,

কালো-অতীত ধ'রে থাকে অন্ধকার ভবিষ্যৎ এক—

তবু কিন্তু জ্বলে,

চোখ কিন্তু কোথায় যেন ওঠে জ্ব'লে জ্ব'লে।

বিস্রস্ত বেশ-বাস, এলোমেলো চুল,

ঠিক যেন······ঠিক যেন······

[অন্ধকার ওকে ঢেকে দেয়। নিচে বিপরীত দিক হইতে অন্যতমাকে আসিতে দেখা যায়। বামপার্শ্বের কাছাকাছি আসিয়া থামিয়া যায়। তারপর—]

অন্যতমা : কাল আমার কাছে খদ্দের এসেছিলো রাতে, অনেক রাতে,

রাত তখন ত্নটো হবে—

না, ঠিক বলতে পারি না,

হয়ত রাত তখন গভীর,
আমার অন্ধকারের মতই গভীর,
গভীর, কিন্তু রঙ তার ঘন-কালো নয়।
কেমন যেন ধোঁয়াটে···
ঐ যে ধোঁয়া, যা এইমাত্র ফেলে এলাম
ঐ তোলা-উনুনের সার—
ধোঁয়ার কুণ্ডলী, আঁকাবাঁকা, পাকানো-পাকানো,
আমারই পিছন পিছন এসে আমাকে কেমন যেন
আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিলো
আহ্—কি নরম তার আলিঙ্গন,
ঘন কুয়াশায় ঢাকা নরম সকাল,
পচা-পুকুরে-পুকুরে ঘাটে-ঘাটে জমা
ঘন-কালো সবুজ শৈবাল—
ঠিক যেন······ঠিক যেন······
[অন্যতমা অন্ধকার হয়ে যায়। প্রথম নায়ক আলোয় আসে]
ঠিক যেন আমার সকাল,
কোনো দূর শৈশবের কোনো এক সুদূর সকাল,
কোনো এক সুদূর দিগন্ত।
অতীতের মৃত জলরাশি
তুলে ধরে সে দিগন্ত সোনা-মোড়া সাম্রাজ্যরেখায়।
সেই-সে সকালের নির্বাসিত আমি,
আমার দামামা,
সহজ আলস্যে উঠেছিলো জেগে অনন্তের সীমান্তরেখায়।
জেগে দেখি—
মৃত জলরাশি ঢেকে ফেলে সোনামোড়া সাম্রাজ্যের ছবি,
জল-ডাঙা এক হ'য়ে যায়।
পচা মাটি,
তীরভূমি ফুলে ফেঁপে ওঠে।

বুড়ো বুড়ো পচা পচা গাছ,
কাঁকড়ার উচ্ছিষ্ট যত,
রস সব নিঃশেষে বিলীন,—
তবু কিন্তু পিঁপড়ের সার ঘোরে চারপাশে।
পাতা নেই, ছোটো গাছ, রুক্ষ ডালপালা,
ছোটো ছোটো পথে যেন ছুটে ছুটে যায়—
পচা-পচা, বুড়ো বুড়ো এলোমেলো,
টাকপড়া রুক্ষ জটাজাল।
বিস্রস্ত কৌপীন, যক্ষারোগী মহাকাল,
খক্-খক্ ক্ষয়রোগ ক্ষয়ে যায় রোগী বিভীষণ।
[প্রথম নায়ক অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। অন্যতমা আলোয় আসে]

অন্যতমা : ঠিক যেন আমার সকাল।
অনেক দিন আগে, সেই সকালে আমার ঘুম ভাঙত।
ধোঁয়া ধোঁয়া ঝাঁক্-ঝাঁক্ কুয়শায় ঘেরা,
ছেঁড়া-ছেঁড়া শাড়ি-ছেঁড়া পাড়,
মা-বাপ, ভাই বোন একসাথে শুয়ে,
বাসা নয় খোঁয়াড় খোঁয়াড়।
পাড়ে-ঝোলা কালকের ব্লাউজ,
হাতার খাঁজেতে চলে পিঁপড়ের সার,
বাৎসল্যের রসে ভেজা যৌন গন্ধে ভরা,
বাসা নয় খোঁয়াড় খোঁয়াড়।
[অন্যতমা সামনের শূন্যতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে কী যেন চিন্তা করে। প্রথম নায়ক আলোয় আসে, ঐ উচ্চস্থানের উপর। এখন আলোর মধ্যে দুইজনেরই উপস্থিতি, কিন্তু দুইজনের মধ্যে কোনো যোগসূত্র নাই]

প্রথম নায়ক : ঠিক যেন কাল রাতের সেই রাস্তা,
বীভৎস ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত একটা সাপ,
এঁকে বেঁকে ম'রে প'ড়ে আছে

দু'ধারাতে আঁস্তাকুড়, আশপাশ ক্ষয়ে ক্ষয়ে আসা
কিন্তু ভাজা-পেঁয়াজের কড়া গন্ধে,
নিবু-নিবু গ্যাসের আলোয়,
ঝোলানো-চীনে-লণ্ঠনে আর রূপোমোড়া খিলিপানে,
তবু কিন্তু কেমন রঙিন।
তেল-তেল ছাপ-ধরা, সিল্কের শাড়ি-পরা মেয়েদের সার,
রঙমাখা খড়ি ঘসা স্থবিরা নগরী
জরাজীর্ণ যৌনতার উচ্ছিষ্ট-পসরা রেখেছে সাজায়ে,
আমি কিন্তু তার মাঝে নিঃসঙ্গ একাকী।
যেমন একাকী ছিলাম দুপুরের শহরের মাঝে
লক্ষ লক্ষ হাত,
জীর্ণ-শীর্ণ—তবু যেন ধারালো ইস্পাত,
শুধু দাবি করে, শুধু চাই চাই রব,
মিছিলে মিছিলে, ক্ষিপ্ত যেন নগর প্রান্তর,
আমি কিন্তু তার মাঝে নিঃসঙ্গ একাকী।
সোনামোড়া সাম্রাজ্যের মমি, অতীতের
নেশা-লাগা মৃত অন্ধকার,
বারে বারে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, সামান্য-ক্ষণের
এই আসা-যাওয়ার কাজ কি উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে! সেই তো সেই ভাগ
ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান, আমিকে হারিয়ে!
তার চেয়ে নিজকে নিরাপদ রেখে
মূল্য দিয়ে কিনে নেবো
নিজস্ব আহ্লাদ। বিবরে আশ্রিত হবো।
আঁকাবাঁকা ঐ রাস্তায়
আঁকাবাঁকা নারীদেহরেখায় খুঁজে নেবো আমার বিবর।
আমার খুঁজে নেওয়া কিন্তু ব্যর্থ হ'য়ে গেছে,
রাতের পর রাত আমার ব্যর্থ হ'য়ে গেছে,
যৌনগন্ধে মাতাল-হওয়া আমার ব্যর্থ হ'য়ে গেছে,

বারে বারে আমি সেই নিঃসঙ্গ-একাকী।
ঠিক যেমন একাকী সেই লোকটা
সারাদিন খেটে-খাওয়া ক্লান্তির পর,
কোনো এক পার্কের বেঞ্চিতে ব'সে,
বাহু দিয়ে বেষ্টন করা ঠ্যাং দুটো উঁচু ক'রে তুলে,
মাথা গুঁজে দিয়ে নিঃশব্দ চিন্তায় মনে আনে
কোনো এক মিছিলের কথা,
কিন্তু খেটে-খাওয়া বাহুমূলের বিবরে
কোনো কালচার নেই, কোনো
যৌন গন্ধ নেই—
সেখানে শুধু অম্লগন্ধ-স্বেদের আঘ্রাণ,
ইন্‌কিলাব-জিন্দাবাদে দিগন্ত মুখর।
আমার ফ্রয়েডীয় বিবরে কিন্তু কালচার আছে
তবু কেন রাতের পর রাত আমি ব্যর্থ হ'য়ে ফিরেছি ?
আমি মুদ্রামূল্য দিয়ে আহ্লাদ কিনতে গিয়েছি,
কেবলি কেন মনে হয়েছে আমি একটা
আহ্লাদ-বিক্রী করা মেয়ে,
সারারাত আহ্লাদ বিক্রী ক'রে ঘাম-গন্ধ-শয্যায় ফিরেছি,
নিজেকে টানতে টানতে

(মুষ্টিবদ্ধ দুইহাত কপালের উপর রাখে।)

অন্যতমা : একদিন ধোঁয়াঘেরা সন্ধ্যায় আমি
আমার খোঁয়াড়ের দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম।
এমন সময় একটা বখা-ছেলে আমায় হাতছানি
দিয়ে ডাকলো।
আমি নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলাম।
ছেলেটি প্যান্টের দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে শিষ দিতে দিতে যাচ্ছে,
আমি তার পিছন পিছন চলেছি।
দু'পাশের বাড়ি-ঘর যেন স'রে স'রে পথ ক'রে দিচ্ছে—

যেন গল্পে শোনা লক্ষীমন্ত সেই মেয়ে সমুদ্রের বুকের
উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে,
দু'পাশের ঢেউয়ের পাহাড় যেন পদ্মের পাপড়ির
মতো হ'য়ে স'রে স'রে যাচ্ছে।
তারপর কোনো একদিন,
সকালের কুয়াশা যখন রক্তমাখা ঘায়ের মতন,
পাশের কোনো এক বাড়ি থেকে একটি মেয়ে
মাতালের মতো টলতে টলতে বেরিয়ে এলো।
সেদিন সে আমাকে ভালবাসার কথা বললে।
বললে—তোমাকে আমি মূল্য ধ'রে দেবো,
তুমি আমাকে আহ্লাদ বিক্রী করবে।
তারপর আমি এক আহ্লাদ-বিক্রী করা মেয়ে!
সারারাত আহ্লাদ বিক্রী করার পর খদ্দের বিদায় ক'রে
ঘাম-গন্ধ শয্যায় ফিরি নিজেকে টানতে টানতে।
(মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত কপালের উপর রাখে। প্রথম নায়ক ও অন্যতমা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়।)
[আলো আসে। পিছনের পটের মধ্যস্থলের সম্মুখবর্তী উচ্চস্থানের উপর দ্বিতীয় নায়ক]

দ্বিতীয় নায়ক : আমার আকাশ কিন্তু হ্রেষায় মুখর।
হয়-বাহিত সৈনিক কিন্তু নয়,
তারা সব রেসের ঘোড়া।
আমি যখন আমার শৈশব থেকে
বড়ো হওয়ার পথে পা দিয়েছি,
তখন থেকেই আমি ওদের ভালবাসতাম—বিশেষ ক'রে
একটিকে—আস্তাবলে রাখা আমাদের রেসের ঘোড়া।
যে তার সাদা-সোনালী কেশরের তলা দিয়ে সোজা
আমার দিকে তাকাতো।
সৌন্দর্যে অপরূপ—

জীবন্ত দু'টি নাসারন্ধ্র, ফুলে-ফুলে-ওঠা জীবন্ত দুই
অক্ষিকোটর।
দৌড়ে আসার পর স্বেদাক্ত-কলেবরে সে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতো,
আমি তখন আমার শৈশবের জানু দিয়ে তার
ঐ থর-থর-কম্পিত দেহের দু'পাশ দু'খানি চন্দ্রমায়
আবৃত ক'রে দিতাম।
কখনো কখনো আপন শক্তির প্রশংসায়—
পেশল গ্রীবা তার নীল-শিরাজাল—
ফেনাভরা মুখ, নাসারন্ধ্রে উষ্ণশ্বাস,
মুখে তার ড্রাগন-আগুন—
সে তার মাথা উঁচু ক'রে তার ধৃষ্টতা ভরা আঁখির দৃষ্টি তার
ঈশ্বরের দিকে নিবদ্ধ করতো।
তাই তো আমার আকাশ হ্রেষায় মুখর,
তাই তো আমার শৈশব থেকে
আমি ওদেরই ভালবাসতাম।
অহংকারের প্রবাহে রক্তিম আমার সেই স্বর্ণশিখর-প্রাঙ্গণ।
দুই মহাদেশ-ধৃত সংকীর্ণ সমুদ্র খণ্ড,
আমার গোপন পাপে সামুদ্রিক কূর্ম যত চলাফেরা করে,
আমার স্বপ্নের পথে রুদ্ধ কণ্ঠস্বর সহস্র শৈশব।
সুদূর শৈশব, আমি আজ বিধাতার মতই প্রবল,
তার মতই বিকারগ্রস্ত, আসক্ত মানুষ এক, নীরব নিস্তব্ধ।
শুধু সুদৃশ্য বঙ্কিম ভ্রূ, বিলাসেতে তার হাসির বিভ্রম,
শান্ত ডানা মেলে দিয়ে আকাশে উড্ডীন,
ক্রটিহীন তার সেই আকাশেতে ফেরা।
অন্তহীন অগ্নিদাহ, জাগ্রত ক্রেটার,
ঈশ্বরের মতই লুব্ধ, জিহোবার মতই প্রতিহিংসাপরায়ণ,
তবু কিন্তু স্তব্ধতার আবরণে ঢাকা, আঁখির পল্লব যেন
নিবাত-নিষ্কম্প,

সেই স্তব্ধতার ধার ঘেঁষে,

সমুদ্রের প্রবঞ্চক পথে,

বারে বারে ফিরে আসা আমার আকাশে,

দৃশ্যমান পৃথিবীর মাঝে।

আমেন, আমেন, হে আমার স্বর্গস্থ পিতা,

তোমার প্রেরিত-পুত্রেরা সব দিয়ে গেছে দ্বীপের আশ্বাস,

আমি ঠিক তাদেরই মতন।

হিংসার ক্লীবত্বে আর ক্রোধের তুষারে,

ঐ সব পরমহংসের দল,

বিভ্রান্তির অলস মায়ায়

তুলে ধরে শ্বেতদ্বীপ, সুমেরুর ঊর্ধ্বে অবস্থান ;

তারপর লাল-ফুল সাদা ক'রে ক'রে

ফিরে যায় তোমারই আশ্রয়ে।

আমেন, আমেন !

হে বিধাতা, হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা,

আমি ঠিক ওদেরই মতন।

[অন্ধকার দ্বিতীয় নায়ককে আবৃত করে। আলো আসে। উচ্চস্থানের পাশে অন্যতমা]

অন্যতমা : সেদিন রাতে খদ্দের এসেছিলো আমার কাছে,

গেরুয়ায় লম্বিত এক খদ্দের,

তার পরিচ্ছদে আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম,

উত্তরে সে বললে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি—

হে ভামিনী—অতি প্রত্যূষে জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে

নববস্ত্র পরিধানে তোমার গৃহ পরিত্যাগ করবো।

মুদ্রামূল্য দিয়ে বিদায় নেবার সময় সে আমাকে বললে—

ঈশ্বরকে অনুসন্ধান ক'রো—

আমি যেমন সেই অনির্বাণ অব্যক্তের সন্ধানে এসে
তোমার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেলাম—
তুমিও তেমনি ঈশ্বর-সন্ধানে ব্যাপৃত থেকে প্রতি
রাত্রে আমার মধ্যে নিজেকেই খুঁজে পাবে।
আমি কিন্তু সেই লম্বিত গেরুয়ার মধ্যে ঈশ্বরকে পাইনি।
তারাভরা ছায়াপথে ঈশ্বর-সন্ধান করতে অন্ধকার
রাতের দিকে এগিয়ে এসেছি।
মাঝে মাঝে সঙ্গী ছিলো দুটো অন্ধ কুকুর,
পথ হারালে তারাই মাঝে মাঝে পথ দেখিয়েছে।
অন্ধকারে এই চলা-ফেরা,
এর মাঝে আমি কিন্তু মাটির কোনো সাদৃশ্য অনুভব করিনি
শুধু এক লবণ-আঘ্রাণ বারে বারে ওষ্ঠাধর
স্পর্শ ক'রে গেছে।
আর কানে আসছে এক কণ্ঠস্বর, বিরাম-বিহীন,
শুনছি, সে আমার মাথার ভিতর চলাফেরা করছে,
ঠিক যেমন মানুষের-মত-কথা বলা এক পাখী
খাঁচার ভিতর চলাফেরা করে।
অতি তুচ্ছ দৈনন্দিন আমার হৃদয়,
উর্বশীর ভালবাসা বিস্মৃত অতীত,
আমার উষার আলো কালো অন্ধকার।
রাতের আকাশের ব্যাপ্তিতে আমি চেয়েছিলাম আমার
বাসনা যেন চরিতার্থ হয়, আমি যেন ফুলের মতো
বিকশিত হ'য়ে উঠি ;
কিন্তু রাত্রির তুষার, আর
শয্যাগত গান্ধর্বী-ভাবনা অম্লগন্ধে ভরা
পঙ্গু ক'রে দিয়ে গেছে সে-ব্যাপ্তি আমার।
তাই তো ঈশ্বর-সন্ধানে পথ চিনে চিনে
এই তারা-ভরা ছায়াপথে এসে থেমেছি ; কিন্তু আজও

পর্যন্ত সীমার মাঝে অসীমের কোনো পদচিহ্ন আমি পাইনি।

[অন্ধকার অন্যতমাকে আবৃত করে। আলো আসে দ্বিতীয় নায়কের উপর]

দ্বিতীয় নায়ক : তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল,
আমার এ পৃথিবীতে শান্ত জলরাশি
সকালের শূন্যতায় প্রশান্ত, স্থির, সাদা যেন দুধের মতন।
ক্রোধান্বিত ঈশ্বরের আদেশে আমি আমার নিজস্ব
অর্ণবপোত নির্মাণ করেছি।
আকাশের উর্বশী-মুহূর্ত তখনো অতিক্রান্ত হয়নি
আমি আমার জলরাশি দিয়ে সমস্ত পাটাতন
পরিচ্ছন্ন করেছি।
আকাশ তার সমস্ত মাধুর্য নিয়ে আমার
ঐ ক্ষুদ্র পরিসর পাটাতনে
এসে আবদ্ধ হয়েছে।
আমার সকাল আর দিনের শৈশব
গত রাত্রির চন্দ্রাতপের মধ্যে
পথ ক'রে নিয়ে নিরাকার-ঈশ্বরের মতই প্রসন্ন
আমার মুক্তচিত্তকে বিধৃত করেছে।
আমি ঈশ্বরের মতই মুক্তচিত্ত, আমার সঙ্গীত ভাবনা
ঈশ্বরের মতই স্বাধীন।
নীচের ঐ মহাজনারণ্য কোলাহলে কলহে মলিন,
আমি কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের মতই অনন্ত নির্জন,
আমেন, আমেন,
ঐ-সব দাবী দাওয়া ঐ-সব অতি ক্ষুদ্র-ভগ্ন-ভাগ,
ঐ-সব মালিন্যের বহু উর্ধ্বে,
আমার নিঃশব্দ সভা ঐশ্বরিক নিস্তব্ধতায় বিরাজ করে,
আমেন, আমেন।
এ আমার নিজস্ব অর্ণবপোত,

নিজস্ব আমার এই সমুদ্রপথ।
ভাসমান বহু দ্রব্যরাজি,
কিছু তুচ্ছ, কিছু মৃত, কিছু বা কৃত্রিম।
মন্থনের হলাহল ঐশ্বরিক উদারতায় আমি দান করেছি,
সুধাভাণ্ড করেছি গ্রহণ—আমেন, আমেন!
সহস্রাক্ষের ঐরাবত, সে আমার সে আমার!
ইন্দ্রাণীর সুবর্ণকিরীটি, সে আমার সে আমার!
তবু কিন্তু মনে হয়—
সুরাপাত্রে রাখা সমুদ্রসুরায় ভাসমান এই অর্ণবপোতকে
মাঝে মাঝে মৃত কাষ্ঠখণ্ড বলেই মনে হয়।
মৃত এক কাষ্ঠখণ্ডমাত্র, আর কিছু নয়। তবুও
আমেন, আমেন।
[দ্বিতীয় নায়ক সামনের শূন্যতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে কি যেন চিন্তা করে। আলোর পরিধি বিস্তৃত হয়। সেই বিস্তৃত পরিধির মধ্যে উচ্চস্থানের সম্মুখে ভূমির উপর অন্যতমাকে দেখা যায়। দুজনের প্রত্যেকেই কিন্তু পৃথক, স্বতন্ত্র]

অন্যতমা : আমি কিন্তু অন্য এক পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে
কোনো একদিনের হারিয়ে যাওয়া
একটি মেয়েকে খুঁজে পেয়েছিলাম।
জলে ভেসে-যাওয়া ভাসমান এক মৃতদেহ—
চারপাশে লোকজন, তাদের চোখে-মুখে বিপন্ন সংশয়—
মেয়েটির মুখে কিন্তু মৃদু-হাসির বিষণ্ন প্রলেপ।
ওরই মধ্যে কে যেন বলে উঠলো—
আরে, ওকে আমি একটু চিনতাম—মাঝে মাঝে
রাত-বিরেতে ওর ঘরে আমি যেতাম—
মন্দ ছিলো না রে মেয়েটা!
চারপাশে অন্য লোকজন—
তাদের চোখে-মুখে কিন্তু বিপন্ন সংশয়—

মাঝখানে, যেন পুতুলের কাচঘরে ঢাকা—
জলে-ভাসা মেয়েটার চেহারায় যেন
মৃদু হাসির বিষণ্ণ প্রলেপ।
আবার আমি যখন ঈশ্বরের পদচিহ্নের সন্ধানে বার
হলাম, কোনো একজনের কথা আবার আমার
কানে এলো—আরে, ওকে আমি একটু একটু চিনতাম
—মাঝে মাঝে রাত-বিরেতে ওর ঘরে আমি যেতাম
—মন্দ ছিলো না রে মেয়েটা!

দ্বিতীয় নায়ক : আমার এ অর্ণবপোত,
অতীতের সমুদ্রসুরায়
মাঝে মাঝে মৃত-কাষ্ঠখণ্ডের মতো প্রতিবিম্বিত হয়।
তখন আমি ঈশ্বরের মতো বিষণ্ণ হ'য়ে উঠি
জলে ভেসে-যাওয়া শবদেহ ঐ মেয়েটাকে মনে পড়ে
ওকে আমি যেন একটু একটু চিনতাম,
মাঝে মাঝে রাত-বিরেতে ওর ঘরে আমি যেতাম,
মন্দ ছিলো না কিন্তু মেয়েটা।
হে আমার স্বর্গস্থ পিতা,
তুমি ওর আত্মাকে স্বর্গস্থ করো
বারবনিতারা ধন্য হোক
কারণ তারা সহস্রের শয্যাসঙ্গিনী হয়—আমেন, আমেন।
[অন্ধকার দ্বিতীয় নায়ক ও অন্যতমাকে আবৃত করে দেয়। আলো আসে। মঞ্চের দক্ষিণ কোণের নিকটবর্তী এক উচ্চস্থানের উপর তৃতীয় নায়ক]

তৃতীয় নায়ক : মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনিতে মধ্যরাত্রি নিনাদিত।
বন্দিনী সীতাকে উদ্ধার ক'রে আমি আমার
আকাশযাত্রা আরম্ভ করেছি।
বেদগান, মন্ত্রোচ্চারণ, যজ্ঞ-আয়োজন,
মন্দিরেতে পূজাপাঠ, মসজিদে নমাজ,

গীর্জার প্রাঙ্গণে,
গীত হলো প্রার্থনা-সঙ্গীত,
কুরুক্ষেত্রে অশ্বত্থামা-হত-ইতি-গজে,
সত্যমেব-জয়তে ঝোলে সিংহের থাবায়।
আমি কিন্তু উর্ধ্বে আছি আকাশযাত্রায়।
সীতাকে পাইনি আমি,
সঙ্গে আছে কৃত্রিম-জানকী,
পশ্চিম সমুদ্র পথে স্বর্ণসীতা নিঃশেষে বিলীন।
আমার উজ্জ্বল নখরে মুক্ত নীলাকাশ
সূর্যশিখা গাঢ় হয় দিনের উত্তাপে।
নীচতে সমুদ্র-নীল,
লোকে বলে, নীল সমুদ্র নাকি লাল হ'য়ে যাবে।
কোর্তার ল্যাপেলে আঁটা আরক্ত গোলাপ—
প্রভাতের শূন্যতায় যাত্রা শুরু ক'রে শেষ করি
গোধূলির আরক্ত রক্তিমে।
কৌরব দর্শক মাত্র,
সভাপর্বে উদভ্রান্ত সব পাণ্ডুর নন্দন,
মাতা গান্ধারীকে ধ'রে বস্ত্রহীনা করে।
কানীন গোত্রজ আমি জারজ সন্তান,
গোলাপের গন্ধ নিয়ে নাকে,
নিঃশব্দে সে বিবস্ত্রা-দৃশ্য উপভোগ করি
সত্যমেব-জয়তে ঝোলে বিশীর্ণ থাবায়—
সেটাকে দোলাতে দোলাতে,
শীর্ণ ঐ সিংহটা কিন্তু দন্তহীন হাসি হেসে যায়।
ক্ষুরধার কঠিন নির্মম আমার আনন্দ
প্রচণ্ড মহিষরূপ ধারণ ক'রে সিংহবাহিনীকে হত্যা করে ;
শীর্ণ ঐ সিংহটা কিন্তু দন্তহীন হাসি হেসে যায়,
'সত্যমেব-জয়তে'টাকে দোলাতে দোলাতে !

পয়োমুখে আমি ভাসমান,
প্রলয়-পয়োধি নীচে।
পচা-কাঠ নোয়াহ্‌র নৌকায় কিছু মানুষ
আর কিছু শান্তির পায়রা।
মাঝে মাঝে দু-একটা পায়রা আমার কাছ বরাবর ঘুরে
চারপাশের অবস্থা জেনে নিয়ে
নৌকায় ফিরে যায়।
নোয়াহ্‌ তখন আমার উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ করে--
হে ভৈরব, করো শান্তি পাঠ।
নিশ্চিন্ত আরামে আমার আকাশ-বিলাস।
কিন্তু আরো কিছু লোক আছে,
অশক্ত দুর্বল কিছু লোক,
মল-মূত্র-দুর্গন্ধে মলিন, ইতর র‍্যাব্‌ল্‌।
দু'হাত উঁচু ক'রে তারা ভয় দেখায়—
একদিন তারা জোর ক'রে ঐ নৌকাটাকে কেড়ে নেবে।
আমি তাই নোয়াহ্‌কে একটু দূরে দূরেই থাকতে বলেছি।
নোয়াহ্‌ তাই একটু দূরে দূরেই থাকেন, আর মাঝে মাঝে
আমার কাছে শান্তির পায়রা পাঠান।
একলব্য-পক্ষপাতে নির্বাসিত দ্রোণগুরু,
ওরা বলে—ওরা নাকি দ্রোণশিষ্য দ্রোণের সন্তান,
সম্পূর্ণ-অঙ্গুষ্ঠ নিয়ে ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করে।
ওদের একজনের সঙ্গে একদিন আমার দেখা হয়েছিল।
হাপরের মতো বুকের পাঁজর, যেন
হা-হা ক'রে শ্বসিছে হুতাশ।
বললাম—বুদ্ধের মতো নির্বিকার হও, খ্রীষ্টের মতো সহিষ্ণু হও,
আমার অশোকের মতো সাম্রাজ্যে তুমি কলিঙ্গের মতো
পরাভূত হও, জেনো—প্রভু তোমার মতই উলঙ্গের
ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন খড়ের শয্যায়।

শোনো—আমি তোমাকে নোয়াহ্‌র নৌকায় আশ্রয় দেবো।
সেখানে নৌকার পাটাতনের ধারে ব'সে মাঝে মাঝে
আমি তোমাকে রূপকথা শোনাবো—
অমৃতময় নির্ঝরিনীর রূপকথা—
পাতালপুরীর ভোগবতী নদীর রূপকথা—
সেই রূপকথার নদীতে যখন নোয়াহ্‌র নৌকা
নীল সবুজ ছায়া ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যাবে।
তখন তার দু'পাশ বেয়ে রূপোলি মাছের সার আমার
রূপকথার গানের দৈর্ঘ্যে লম্বিত হয়ে থাকবে
আর তোমার ভূলোক-দ্যুলোক মধুবাতা ঋতায়তে—
মধুময় হয়ে উঠবে। সব কথা শুনে সে আমার প্রতি তার
ক্রোধান্বিত ধূর্জটি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো।
সে-দৃষ্টি ঘৃণায় কঠিন। আমি কিন্তু বিচলিত হইনি।
বাসনায় বহ্নিমান ধূর্জটির ক্রোধ, আমি কুমারসম্ভবে
আশ্রয় নিলাম—
তপঃপরামর্শবিবৃদ্ধমন্যোর্ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষমুখস্য তস্য।
স্ফুরন্নুদর্চ্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত॥
ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্‌গিরঃ খে মরুতাংচরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥
আমার নিপীড়িত-লোলুপতা ভস্মীভূত মদনরেণুতে
মধুময় হয়ে উঠলো,
নিশ্চিন্ত আরামে আমার আকাশ বিলাস,
চক্রপানি আমার সহায়।
[তৃতীয় নায়ক অন্ধকারে আবৃত হয়। উচ্চস্থানের পাশে আলোর পরিধির মধ্যে অন্যতমা]

অন্যতমা : সমাধিক্ষেত্রে আমি আমার ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছি।
শ্মশানেতে চিতা জ্বলে, সমাধির মাঝে মাঝে আঁকাবাঁকা পথ
বস্ত্রাবৃত শব আর চিতা বহ্নিমান,

আমার প্রশ্নের তারা দিয়েছে উত্তর।
পর পর দুই মহাযুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি এই
সমাধিক্ষেত্র আশ্রয় করেছেন।
স্বেদাক্ত ঘামঝরা খেটে-খাওয়া মানুষের অসঙ্গত দাবীর
উত্তরে তিনি মৌন অবলম্বন ক'রে এই চিতায়
আশ্রিত হয়েছেন।
আমার ঈশ্বর, সে তো মৃতের ঈশ্বর।
কুলবৃদ্ধ নোয়াহ্‌র জাহাজ থেকে নির্বাসিত ঐ
মানুষগুলোর প্রশ্নে উত্যক্ত হ'য়ে তাঁর স্বজন বান্ধবেরা তাঁকেই
শরাঘাত করেছে।
দ্বারকাপতি কৃষ্ণের মতো কুপিত হয়ে তিনি
কিন্তু ঐ নির্বাসিতদেরই
অভিশাপ দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—আমি অব্যক্ত,
কিন্তু তোমরা আমার যন্ত্রণাকে ব্যক্ত করেছ।—আমি
অভিশাপ দিচ্ছি, তোমাদের কোনদিন মৃত্যু হবে না!
অভিশপ্তেরা অশ্লীল হ'য়ে বলেছিলো—
হে বরাহনন্দন, আমরা জানি—আমাদের
কোনদিন মৃত্যু হবে না, তুমি কিন্তু মৃতের ঈশ্বর!
তিনি যখন ক্রস বহন ক'রে নির্বাসিত ঐ নোংরা কালো
আর পীত লোকগুলোর কাছে গিয়েছিলেন, তারা
তখন তাঁকে নোয়াহ্‌র জাহাজে দূর করে দিয়েছিলো।
বলেছিলো—
আমরা জানি—দরিদ্র আমরা আশীর্বাদপূত,
স্বর্গরাজ্য আমাদেরই,
তাই মৃত্যুর পর স্বর্গরাজ্যে আমরা তোমার দেখাশুনা করবো।
তুমি আমাদের মর্তভূমি থেকে কুলবৃদ্ধ ঐ নোয়াহ্‌র জাহাজে
দূর হ'য়ে যাও।
ক্ষুব্ধ সেই সূত্রধারপুত্র স্বর্গস্থ পিতাকে এদের

ক্ষমা করতে বলেছিলেন। বলেছিলেন—

পিতা, তুমি এদের ক্ষমা করো।

—আমি কিন্তু এদের অভিশাপ দিচ্ছি, এদের কোনদিন

মৃত্যু হবে না!

তাই তো সমাধিক্ষেত্রে আমি তাঁর সন্ধান পেয়েছি,

আমার ঈশ্বর আজ মৃতের ঈশ্বর।

[আলোর পরিধি উচ্চস্থানের উপর বিস্তৃত হয়। তৃতীয় নায়ক আলোয় আসে। অন্যতমা উচ্চস্থানের পার্শ্বদেশ আশ্রয় করে ঈশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন। দুইজনেই এখন আলোর পরিধির মধ্যে—কিন্তু পৃথক, স্বতন্ত্র]

তৃতীয় নায়ক : নিশ্চিন্ত আরামে আমার আকাশ-বিলাস,

চক্রপাণি আমার সহায়—

ওরা বলে, ওরা নাকি নারায়ণী সেনা—

শত লক্ষ দুর্যোধন জড়ো হবে সমন্তপঞ্চকে,

মুষ্টিমেয় ভীমসেন সব দ্বৈপায়নে যাবে বিসর্জন।

গদাযুদ্ধে ধরাশায়ী হয়ে।

কিন্তু পণ্যমূল্যে কিনে নেওয়া শকুনির পাশা

আমাকে সংবাদ দেয়,

ওরা সব ঊরুদেশে অশক্ত দুর্বল,

আমি তাই প্রতীক্ষায় আছি, চক্রপাণি আমার সহায়।

আরও সহায় আছে—

ভীষ্ম কৃপ আদি কিছু কিছু কুরুবৃদ্ধ আমার সহায়।

তাঁরা জানেন—মাঝে মাঝে যখন তাঁরা শরশয্যায় শায়িত

থাকেন, তখন পাতাল-ভেদী অমৃত-নির্ঝর তাঁদের

কণ্ঠকে সিক্ত রাখে। দেবতাত্মা হিমালয়ের ঔপনিষদিক

মহিমায় তাঁরা আচ্ছন্ন। তাই সীমাবদ্ধ তাঁদের পারদের

ঊর্ধ্বগতি। তাঁদের সংশয়, নির্বাসিত ঐ সংশপ্তকেরা একদিন

তাঁদেরও প্রাণদণ্ড ঘোষণা করবেন।

আমি যে দেখেছি—ঐসব ধূর্জটিদের তৃতীয়
নেত্রে ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হ'লেই ঐসব কুরুবৃদ্ধের
দল—ক্রোধং প্রভো সংহর সংহর—
বলে চিৎকার করেন।
তাই তো আমার ভরসা,
আর পাশে নিয়ে পঞ্চভর্তা-দ্রৌপদী আর প্রিয় সারমেয় এক,
নিশ্চিন্ত আরামে আমার আকাশ-বিলাস।
আর শেষপর্যন্ত তো ঈশ্বর আছেনই।
'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা',
আমি যেন—'হে ভারত, ভুলিও না' ব'লে আমার
প্রয়োজনমতো তারে বা বেতারে তাঁকে
পুনঃসম্প্রচারিত করতে পারি।

অন্যতমা : আমি আমার ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছি—
এই সব অস্থির চঞ্চল নগরীর সীমা ছাড়িয়ে,
বহু দূরে—
অতীতের পচাকাঠ নোয়াহ্‌র জাহাজে।
কক্ষে কক্ষে মৃত সব মানুষের দল,
পাটাতনে স্থবিরত্ব অহংকার করে,
তার মাঝে পেয়েছি আমি ঈশ্বর-সন্ধান,
সমাধিক্ষেত্রের সেই আঁকাবাঁকা পথে।
আমার একান্ত কামনা,
তিনি যেন পুনঃসম্প্রচারিত হ'ন,
সামান্য তিনি. সামান্যই তাঁর গৌরব,
নাম নেই, প্রায় বদনাম,
বাস্তবের পাড়াতে তাঁর প্রবেশ নিষেধ—
কিন্তু যারা অমরত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত নয়,
যারা দীনভাবে শুধু মৃত্যুরই অপেক্ষা করে,
তাদের মুক্তির তিনি একান্ত আশ্রয়।

[অন্ধকার দুইজনকে আবৃত করে। মঞ্চের বামকোণে উচ্চস্থানের উপর চতুর্থ নায়ককে দেখা যায়]

চতুর্থ নায়ক : কুলপতি থেকে আমি পৃথক হ'য়ে এসেছি।
সংশপ্তকেরা আমায় সম্মান দিয়েছে,
তারা আমাকে ব্যূহপতি ব'লে ঘোষণা করেছে,
বিধানসম্মত আশ্রয় আমার নিশ্চিত।
আমার নিজস্ব আকাশ আজ রৌদ্র উজ্জ্বল।
আমার এ-রৌদ্রে কিন্তু মধ্যাহ্ন নেই,
চিরকাল শুধু এক সুন্দর সকাল।
সকালের এই রোদে দূরের ঐ সংশপ্তকেরা
যেন উজ্জ্বল কৃপাণ,
মধ্যাহ্নের উগ্রতাবিহীন, সমুদ্রের মতই সুন্দর।
ঊর্ধ্বের বিশুদ্ধ আকাশ দ্বারা সীমাবদ্ধ এই পৃথিবীখণ্ড আজ
আমার অশ্বের হ্রেষায় মুখরিত। ভূমিপতির লক্ষণে
আমি লক্ষণান্বিত ; এই উচ্চস্থান আজ আমার
নিজস্ব, পরিপার্শ্বের এই ভূমিখণ্ড আজ আমার
বলীবর্দের কর্ষণাধীন।
দূরে ঐ সংশপ্তকেরা সূর্যের মতো উজ্জ্বল।
ওরা যেন ওদের ঔজ্জ্বল্যে আমাকে আচ্ছন্ন না করে,
আমি শুধু ওদের সূর্যশক্তিকে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব
করতে চাই।
ওদের ঐ সৌরশক্তি আমার রাত্রির অন্ধকারকে গানের
মতো উজ্জ্বল করেছিলো ;
ঊষার সিন্দুর মুহূর্তে আমার মনের শূন্যতায়
সেই গীতান্বিত আলো
যেন স্বপ্নের মতন,
তবু কিন্তু সে-আলোয় আমার জন্মগত অধিকার,
কারণ ওরা আমাকে ওদের ব্যূহপতি ব'লে ঘোষণা করেছে।

আমার আসন আমি নিশ্চিত করেছি,
ভূমিপতি আমি, শস্যের উপর আমার অধিকার জন্মেছে,
লবণ আমার আয়ত্তে,
মিত্র বরুণ আজ আমাকে তাঁদের সমকক্ষ
ব'লেই মনে করেন।
হে সংশপ্তকগণ, তোমরা আমাকে বৃহপতি
ব'লে ঘোষণা করেছ,
আমি এই উচ্চস্থানে অবস্থান ক'রে
তোমাদের মধ্যেই বাস করি।
তোমাদের মধ্যেই আমার শক্তির অনুভব,
তোমাদের শক্তিতেই আমি কূলপতি
নোয়াহ্‌কে পরাস্ত করেছি,
তোমাদের শক্তিতেই আজ আমার চন্দ্রাতপের চূড়া
ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে।
তোমরা আমাকে বৃহপতি ব'লে সম্বোধন করেছ ব'লেই
আজ আমি ভাবশুদ্ধ চিত্তে দিবসাধিপতি সূর্যের
সম্মুখীন হ'য়ে বেলাভূমির লবণখণ্ডের ঔজ্জ্বল্যে
উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছি।
তোমরা যেন এই সকালের মতই উজ্জ্বল থাকো,
মধ্যাহ্নের মতো উগ্র হ'য়ো না,
তোমরা যেন আমাকে বিশ্বাসঘাতক ব'লে
পরিত্যাগ ক'রো না।
হে সংশপ্তকগণ,
দিনের আলো আমাকেও তোমাদের
ভয়ে ভীত ক'রে তোলে।
তাই রাত্রির স্বপ্নের অন্ধকারে, আমি তোমাদের
জমায়েতে উপস্থিত থেকে আমার আত্মার সপক্ষে
কিছু বিশুদ্ধ বাণিজ্য ক'রে এনেছি। সামান্য এই লাভটুকু

তোমরা নিশ্চয় ক্ষমা করবে।
হে সংশপ্তকগণ,
তোমরা আমাকে ব্যূহপতি ব'লে সম্বোধন করেছ,
আমি তোমাদের আদেশ করছি—
তোমাদের নিকট উপস্থিতি যেন আমাকে ভীত না করে,
তোমাদের মধ্যেই আমি আমার শক্তিকে অনুভব করি
কিন্তু অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ত্রিশঙ্কু আমি।
হে সংশপ্তকগণ,
উত্তেজিত ক্রুদ্ধ ভাস্করের নিকট উপস্থিতি আমার
সহ্যসীমাকে অতিক্রম করে।
[অন্ধকারে আবৃত হইয়া যায়। দক্ষিণ দিকের সম্মুখস্থ উচ্চস্থানের
উপর পঞ্চম নায়ক]

পঞ্চম নায়ক : আমি কুলপতি নোয়াহ্।
আমার কিন্তু কোনো স্বগতোক্তি নেই
অধিনায়ক মিত্র বরুণের কাছে আমি
আমার প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।
হে মিত্র,
তোমারই মতো আমার সকাল আর দিনের শৈশব
রাত্রির চন্দ্রাতপের মধ্যে পথ ক'রে নিয়ে
নিরাকার ঈশ্বরের মতই
প্রসন্ন আমার মুক্তচিত্তকে বিধৃত করেছে।
নীচের ঐ মহাজনারণ্যকে আমি তোমাদেরই আদেশে
কলহে মলিন করেছি।
আমিও কিন্তু তোমাদের ঈশ্বরের মতই অনন্ত নির্জন,
আমেন, আমেন।
ঐ সব দাবিদাওয়া, ঐ সব অতি-ক্ষুদ্র-ভগ্ন-অংশ ভাগ
আমারই নির্দেশে।
তবু আমি ঐ সব মালিন্যের বহু উর্ধ্বে অবস্থান ক'রে

তোমারই মতো আমার নিঃশব্দ সভায়
ঐশ্বরিক নিস্তব্ধতায় বিরাজ করেছি,
আমেন, আমেন।
হে মিত্র,
তোমার কাছে আমার প্রার্থনা
তুমি আমাকে পরিত্যাগ ক'রো না।
হে বরুণ,
আমি কুলপতি নোয়াহ্,
আমি তোমার কাছে প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।
তোমার আদেশে আমি সংশপ্তকদের সংশয়ান্বিত
করার চেষ্টা করেছি
তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।
হে বরুণ,
পণ্যমূল্যে আমি তোমায় শকুনির পাশা বিক্রয় করেছি।
তুমি সংবাদ সংগ্রহ করেছ—হয়তো বা সংশপ্তকেরা,
উরুদেশে অশক্ত দুর্বল।
যে বরুণ—আমি জানি,
ভীষ্ম কৃপ আদি কিছু কিছু কুরুবৃদ্ধ যখন শরশয্যায়
শায়িত থাকেন তখন পাতালভেদী অমৃত-নির্ঝর তাঁদের
কণ্ঠকে সিক্ত রাখে।
সেই নির্ঝরের লোভে লুব্ধ ক'রে, হে বরুণ, আমি ঐ সব
কুরুবৃদ্ধকে তোমার সহায় করেছি
তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।
হে বরুণ,
রথস্বামী যেরূপ শ্রান্ত অশ্বকে পরিতৃপ্ত করেন,
আমি সুখের জন্য সেইরূপ স্তুতি দ্বারা তোমার মন
প্রসন্ন করি।
পক্ষিগণ যেরূপ নিবাসস্থানের দিকে ধাবমান হয়,

আমার ক্রোধ-রহিত বিনীত-চিন্তাসমূহ সেইরূপ ধনপ্রাপ্তির
জন্য তোমার দিকে ধাবিত হইতেছে।
হে বরুণ,
তুমি আমাকে কিঞ্চিৎ ধনদান করো।
সংশপ্তকেরা যাহাকে ব্যূহপতি বলিয়া অভিহিত
করে আমি তাহাকে হীন প্রমাণ করিবার জন্য
প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছি,
আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তুমি আমার এই সামান্য
পরিশ্রম গ্রহণ করো।
হে বরুণ,
তুমি সুবর্ণপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আপন
পুষ্ট শরীর আচ্ছাদন করো,
আমার একান্ত প্রচেষ্টায় তোমার হিরণ্যস্পর্শী রশ্মি
চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া কৃষ্ণ ও পীতের মধ্যে
বিভেদ সৃষ্টি করে,
হে বরুণ,
তোমার রক্ষণাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমি তোমায়
আহ্বান করিতেছি,
তুমি আমাকে সুখী করো,
আমার উপরের পাশ মোচন করো।
মধ্যের পাশ মোচন করো,
নীচের পাশ মোচন করো, আমি যেন জীবিত থাকি।
হে বরুণ, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

[মঞ্চ সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। সামান্য ক্ষণের জন্য এই অন্ধকার-বিরতি। তারপর মঞ্চ সম্পূর্ণরূপে আলোকিত হইয়া উঠে। নিজ নিজ উচ্চস্থানের উপর প্রথম হইতে পঞ্চম নায়ক দণ্ডায়মান। মধ্যস্থলে অন্যতমা]

অন্যতমা : সমাধিক্ষেত্রে আমি আমার ঈশ্বরকে প্রোথিত

ক'রে এসেছে, চিতায় তিনি দাহ হয়েছেন।
মৃতের ঈশ্বর তিনি, শবদেহের মতই প্রাণহীন,
ভস্মসাৎ মৃতদেহের মতই বায়ুতে বিলীন,
পাত্রাধার তৈলের মতই অস্তিত্ববিহীন।
যতদিন তিনি সঙ্গে ছিলেন,
ততদিন তিনি আমারই মতো ক্ষুধার্ত ছিলেন।
আমি শীতার্ত হ'লে তিনিও শীতার্ত হ'তেন, আমার
জিঘাংসা তাঁকেও জিঘাংসু ক'রে তুলতো।
আমি পিপাসার্ত হ'লে তাঁরও পিপাসা পেতো,
আর আমি যখন ক্রুদ্ধ হ'তাম, তখন তিনি ভৈরবের মতো
জটাজাল বিস্তৃত ক'রে তৃতীয় নেত্রে
অগ্নি প্রজ্বলিত করতেন।
অতীত স্মরণে এলে আমি তাঁকে আমার দেহ-বিক্রয়ের
কথা বললাম—
শুনলাম—তিনিও নাকি বহুবার, পণ্যমূল্য নিয়ে
বারবনিতার মতো নিজদেহ বিক্রয় করেছেন—
বহুযুগ ধ'রে তিনি বহুজন-ভোগ্যা, বহুজনপদবধূ।
মনে হলো,
আমার ঈশ্বর আমারই মতো ক্লান্ত এক প্রাণী,
মৃত এক স্বর্গরাজ্যের কামনায় আমারই সঙ্গে চলেছে
—আমারই মতো নিজেকে টানতে টানতে!
গর্দভ-ক্লান্ত এক আমিকে বৃথা বহন ক'রে লাভ কি?
তাই সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে প্রোথিত ক'রে এলাম,
চিতায় তাঁকে দাহ ক'রে এলাম,
এক মুঠো ছাই তিনি, বায়ু তাঁকে তুচ্ছ করেছে,
পচা-ঘুণধরা অতীতের মরা কাঠ,
কুলপতি নোয়াহ্‌র জাহাজে তিনি পরিণত হয়েছেন।
তারপর সেই পুরাতন দিন,

সেই জনপদবধূ,
সেই রক্তমাখা খড়িঘসা স্থবিরা নগরী।
কিন্তু ধূলি ধূসরিত আমি,
মৃত এক ঈশ্বরবহনে বিগত-যৌবন,
স্থবিরা নগরী তাই দ্বার বন্ধ করে,
নায়কেরা করে পরিত্যাগ।
তারপর সংশপ্তক আশ্রয়।
বিস্মিত হ'য়ে দেখি তাদের ক্ষুধা আমাকে ক্রোধান্বিত
করে, তাদের পিপাসায় আমি জিঘাংসু হই,
তাদের আবেগ আমার দুই মুষ্টিকে
ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করে।
আমি আমার পণ্যমূল্য ধার্য করেছিলাম,
কিন্তু তাদের খেটে-খাওয়া বাহুমূলের বিবরে
কোনো যৌনগন্ধ নেই,
সেখানে শুধু অম্লগন্ধ স্বেদের আঘ্রান,
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদে দিগন্ত মুখর।
[মঞ্চের দুই দিক দিয়া সংশপ্তকদের প্রবেশ। মঞ্চের পিছন দিকে উচ্চস্থানগুলিকে ঘিরিয়া অর্ধবৃত্তাকার ব্যূহ রচনা করে]

সংশপ্তক একতান : শোনা যায়,
রক্তহীন সংগ্রামের পর,
আমরা ফিরেছি ঘরে।
আমাদের ইতিহাস অন্য কথা বলে
বার বার রক্তক্ষয়, কুরুক্ষেত্র উদ্‌বেল দুর্বার,
অপমানে-লাঞ্ছনায় সংগ্রাম-উত্তর,
ভারতের জম্বুদ্বীপ বিদ্রোহে মুখর।
কিন্তু কুলবৃদ্ধ ভীষ্মদেবগণ,
বারে বারে করেন প্রতিজ্ঞা,
—হীন সূতের নন্দন সব সংশপ্তকগণ

যদি নেয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথ

সেনাপত্য ভার তাঁরা করিবেন ত্যাগ।

তাই অন্ধ-বধির-মুক তিনটি বানর

বলে নাকো মিথ্যা কথা, শোনে নাকো কানে,

দৃষ্টির গোচর নয় মিথ্যা-আচরণ,

অজাদুগ্ধ পান ক'রে

সত্যমেব জয়তে ব'লে ক'য়ে যায় শান্তির প্রসার।

[ক্ষণিকের স্তব্ধতা]

সংশপ্তক একতান : আমরা ঘরেতে ফিরি

রক্তহীন সংগ্রামের পর।

একদিন আমাদের মাথা উঁচু ছিলো,

দৃষ্টিতে ছিলো উদ্ধত অহংকার,

ভারাক্রান্ত হৃদয় আজ আনত লজ্জায়।

আমাদের নিজস্ব অহংকারে একদিন কি

আমরা সংগ্রাম করিনি ?

তার কোন্ মূল্য ধ'রে দিলে—

তোমাদের রক্তহীন সংগ্রামের পর ?

আমরা সূর্যের সৈনিক,

আমরা আমাদের অহংকার নিয়ে অমর ছিলাম,

হে কৌপীনধারী বৃদ্ধ পিতামহ,

ছল ক'রে চেয়ে নিলে বহুমূল্য সে কবচ-কুণ্ডল,

সত্য আর অহিংসার পথে,

বৈদেশিক-ব্যবসার লাভ-ক্ষতি ভগ্ন-অংশ ভাগে,

চক্রান্তের গোপন পথে,

নিঃশব্দে নিহত হলো সেই অহংকার,

তার কোন্ মূল্য ধ'রে দিলে

তোমাদের রক্তহীন সংগ্রামের পর ?

মাঝে মাঝে রাজসূয় যজ্ঞ ক'রে

মূল্য ব'লে ধ'রে নাও শত-লক্ষ প্রাণ,

পুরস্কারে কণ্টকমুকুট,

বেয়নেট-গুলিতে জর্জর,

তারপর নির্বাসন—জান্তব-জীবন।

[ক্ষণিকের স্তব্ধতা]

সংশপ্তক একতান : মধ্যরাত্রির প্রতিজ্ঞায় আশ্বস্ত হ'য়ে

আমরা ফিরেছি ঘরে

রক্তহীম সংগ্রামের পর—

আজ সে শপথ, রামধনু-রঙ হ'য়ে

আকাশেতে আলো দেয় তোমাদের গন্ধর্ব-সভায়—

তারপর অসীমে মিলায়—সেখানে সমাধি তার।

সভা শেষ হ'লে,

ফুল দেবে, মালা দেবে যত সব ব্যর্থ-গতকালে,

অতীতের পাপের পটেতে।

কিন্তু শোনো গন্ধর্বের দল,

এখনো আসেনি সময়,

অতীতের যত পাপ

মালা দিয়ে সাজাবার আসেনি সময়।

এখনো ক্ষয়ে-যাওয়া সময়ের অন্তরালে রাত্রির অন্ধকার

আগামী কালের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়নি—

এখনো গুরু গুরু বিদ্রোহ-বাদ্য বনভূমি কম্পিত করে,

তারায় তারায় প্রতিধ্বনিত হয় নক্ষত্রের ছায়াপথে—

এখনো দীর্ঘ সব বনস্পতির মাথায় মাথায়

ঘোরবর্ণ সূর্যের আবির্ভাব, মেঘরঙে ঢাকা—

সূর্যের সৈনিক আমরা—

সপ্তাশ্ব বাহিত হ'য়ে,

আমরা ফিরেছি ঘরে রক্তহীন সংগ্রামের পর!

[ক্ষণিকের স্তব্ধতা]

সংশপ্তক একতান : উষার বিভ্রান্ত পদক্ষেপে

আমরা ফিরেছি ঘরে রক্তহীন সংগ্রামের পর।

ছুনিয়ার খেটে-খাওয়া মানুষের গান,

গীত হয় আমাদের সুরে,

—অন্য সব দেশে কিন্তু একই আকাশ।

কঠোর কঠিন মৃত্যু-পদক্ষেপে

আমরা ফিরেছি ঘরে রক্তহীন সংগ্রামের পর।

তবু কিন্তু তোমাদের গন্ধর্ব সভা থেকে নিক্ষিপ্ত কাঞ্চনমুদ্রা

আমাদের হাসি-গল্প-গানের কণ্ঠরোধ করে,

রক্তহীন-সংগ্রামের গল্পে-বলা-ঐতিহ্যকে

অস্বীকার ক'রে মৃত্যু তার সবুট-পদক্ষেপে

আমাদের দিকে অগ্রসর হয়।

অথচ রক্তহীন সংগ্রামের পর

আমরা ফিরেছি ঘরে পাহাড়ের সবুজের ধার ঘেঁসে ঘেঁসে,

পিপাসার্ত হ'লে পাখীর উষ্ণ-নরম গান

আকণ্ঠ পান করেছি,

সমুদ্রের তীরে এসে দেখেছি

তরঙ্গে তরঙ্গে ভরা জলের ফসল ;

ঘণ্টাধ্বনি বন্দরের কালশেষ ঘোষণা করে,

প্রেমার্ত সামুদ্রিক পাখীরা চুম্বনে চুম্বনে তরঙ্গশীর্ষ

আকুল করে তোলে।

আমরা ফিরেছি ঘরে,

বৃষ্টিপাত বিরামবিহীন,

বজ্রাহত বিস্রস্ত উষায়

পথে পথে মূঢ় ম্লান মুখ

অর্ধমৃত যন্ত্রণাকাতর—

সম্মানের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে,

আজো তারা আছে,

সেই-সব মূঢ় ম্লান মুখ
মৃত কিংবা যন্ত্রণাকাতর।
সেই আশাহত পথ বেয়ে বেয়ে
আমরা ফিরেছি ঘরে বিস্রস্ত উষায়,
রক্তহীন সংগ্রামের পর।
[মঞ্চের বামপার্শ্ব দিয়া দ্বিতীয় সংশপ্তক দলের প্রবেশ]
সংশপ্তক (দ্বিতীয়) একতান : হে পঞ্চ নায়ক,
বিগত বিশ বৎসর তোমাদের সভ্যতা
দিবারাত্র আমাদের পদাঘাত
ক'রে এসেছে,
তোমাদের পোষা শকুনদের ডানার ছায়ায় পুঞ্জীভূত রক্ত দিয়ে
গড়া স্মৃতিস্তম্ভ সব,
তারা তাদের তীক্ষ্ণ নখরের অগ্রভাগ দিয়ে
বিন্দু বিন্দু রক্ত সঞ্চয় করেছে
ধানক্ষেতে কাজ-করা কৃষকের রক্ত,
কারখানায় খেটে-খাওয়া মজুরের রক্ত,
বন্দুকের গুলী মেরে ভেঙে-দেওয়া-প্রতিজ্ঞার রক্ত
কিন্তু তোমাদের শকুনেরা বোধ হয় জানে না,
তোমরা বোধ হয় জানো না, হে পঞ্চপাণ্ডব
বেদব্যাসের কাল শেষ হয়েছে।
তোমরা বোধ হয় জানো না, হে পঞ্চ নায়ক—
গন্ধর্বসভায় তোমাদের উদ্ধত সংগীতের প্রতিবাদে
আমাদের কর্কশ কণ্ঠের ছিন্নভিন্ন গান,
আমাদের উজ্জ্বল পদক্ষেপ,
সবুজ বসন্ত আনে রক্তের তর্পণে।
[মঞ্চের দক্ষিণ দিক দিয়া তৃতীয় সংশপ্তক দলের প্রবেশ]
সংশপ্তক (তৃতীয়) একতান : শোনো কমরেডরা শোন,
আমরা পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ দিয়ে আসছি

আমরা সংবাদ নিয়ে আসছি—
আমাদের বাহুমূলের বিবরে কোনো সভ্যতা নেই ব'লে
এই সব নায়কের দল
ব্যর্থতার আঁকা-বাঁকা পথে
আমাদের পিতার মতো বৃদ্ধদের হত্যা করেছে,
আমাদের মায়ের মতো মেয়েদের হত্যা করেছে—
কচি কলাপাতার মতো শিশুদের হত্যা করেছে
—তারা বেদনার্ত, কিন্তু বিষণ্ণ ছিলো না,
শেষ মুহূর্তেও চোখ তাদের আশায় রঙিন,
ভালবাসায় উষ্ণ তাদের নিঃশ্বাস।
তাদের মৃত্যুতে দিগ্‌ভ্রষ্ট আমরা,
মনে হয়েছিল, পথভ্রষ্ট আমরা
মাতৃস্তন্য থেকে দূরে সরে আসছি।
কিন্তু না কম্‌রেডস্—
আমাদের সমস্ত দুঃখকে অতিক্রম ক'রে
ঘুমভাঙা বুনো জানোয়ারের বিশুদ্ধ সকালকে
অতিক্রম ক'রে
'একশো লোকের বন্দীশালা ভাঙা'র
প্রচণ্ড চিৎকার আমাদের কানে এলো
অমনি নির্বাসিত আমাদের রক্তের ধারা
কুয়াশা-তাড়িয়ে-দেওয়া
শক্তিকে আবিষ্কার করলো।
—শতাব্দীর ডাক শুনতে পেলাম কম্‌রেডস্
আফ্রিকার নিগ্রোরা আমেরিকার
নিগ্রোদের সঙ্গে মিলে
এশিয়ার নিগ্রোদের ডাকছে
উঠে পড়ো কম্‌রেডস্, অন্ধকার শেষ—
এবার উষার ঘুম ভাঙছে।

[অন্যতমাকে নিয়ে সমস্ত সংশপ্তকেরা এক হ'য়ে যায়। পতাকা-বাহীর হাত থেকে অন্যতমা সংশপ্তকদের পতাকা গ্রহণ করে। সংশপ্তকেরা ব্যূহ রচনা করে উচ্চস্থানগুলির দিকে অগ্রসর হয়। পঞ্চ নায়কেরা ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হন। অর্ধবৃত্তাকার ব্যূহের মধ্যে অসহায় জন্তুর মতো তাঁদের অবস্থা]

সংশপ্তক একতান : দূরে একটা আলো দেখা যায়

ঐ আলো আমাদের পথ দেখাচ্ছে,

অন্ধকার শেষরাতের কালো মুখের আড়ালে

ঊষার সলজ্জ মুখ আমাদের বাসনায় রাঙা হ'য়ে উঠেছে।

ঢেউ-এর পর ঢেউ আমাদের নোঙর-ফেলা জাহাজে

আঘাত করছে,

আজ রাত পর্যন্ত যারা গণিকা ছিলো,

তারাও আজ আনন্দে অধীর হ'য়ে খদ্দের-নয়-এমন

মানুষকেও আলিঙ্গন করছে :

এখনও আছে কিছু হতাশের দল,

সকালের ধোঁয়াটে কুয়াশার জন্য এখনও তারা উন্মুখ

এখনও আছে কিছু উদ্‌ভ্রান্তের দল,

তাদের মেঘাচ্ছন্ন আঁখিতে ইউক্যালিপ্টাসের গন্ধে

ঘেরা এক দ্বীপ,

এখনও তারা জাহাজের জন্য উন্মুখ

এখনও আছে কিছু বৃদ্ধের দল,

ব্যর্থ-বাসনার বিরক্তি নিয়ে ঘোরাফেরা করে—

'কিছু-একটা-হ'তে-পারে—এ আশায় এখনও উন্মুখ।

এখনও আছে,

শকুনির পাশা নিয়ে কিছু কিছু বাজীমাত করা,

কিংবা কোনো প্রাচীন কলহ।

এখনও কিছু পাপ আছে,

আছে কিছু কুয়াশার ঘুম,

কিছু কিছু সমুদ্র কিন্তু এখনও হ'য়ে আছে নীল।

[মশালবাহী শেষ-সংশপ্তকদের প্রবেশ]

সংশপ্তক (শেষ) একতান : আমরা আসার পথে দেখলাম

চাষারা যাচ্ছে তাদের ধানক্ষেতের পথে।

আমাদের ভাঙা ঘরের উঠোনে উঠোনে,

আজ কী অপরিমেয় শক্তির সঞ্চয়,

রাজসূয় যজ্ঞে গুরুভোজনে যে সব রাজারা ক্লান্ত হ'তেন,

তারা আজ আমাদের ছাদের তলায়,

আমাদের দরজার বাহিরে বাহিরে,

রাজা আর রাষ্ট্রদূত—কুরু-কাশী-কোশল-পাঞ্চাল।

আমরা রোজ রাস্তায় দেখতাম

কুলবৃদ্ধ পিতামহেরা নিক্তির ওজন আর বাটখারা নিয়ে

আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন—

আমাদের আহার্য মেপে দেবেন ব'লে অপেক্ষা করছেন—

আমাদের বিচরণক্ষেত্র সীমিত ক'রে দেবেন

ব'লে অপেক্ষা করছেন—

হায়—সেই পিতামহের দল আজ কোথায়?

পথে আসতে আসতে দেখলাম

তাঁরা তাঁদের দাঁড়িপাল্লা আর বাটখারা নিয়ে

খড়কুটো আর কীট-পতঙ্গের সঙ্গে

সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন।

সূর্য—আজ তোমাকে দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি।

সূর্য—আমরা তোমাকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বলেই জানতাম।

সূর্য—তোমার সম্পর্কে অনেক মিথ্যা রটনা আমরা শুনেছি।

সূর্য—পৃথিবীতে আমাদের পরিচয় ছিলো, আমরা সব

হীন সূতের নন্দন।

সূর্য—আমরা কিন্তু জানতাম, আমরা তোমার সন্তান।

সূর্য—শুভ্রবর্ণ তোমার কিরণে আজ

বিপ্লব-সংগীত গীত হয়েছে।

সূর্য—আজ তোমাকে দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি।
আমরা যখন নদীপথ দিয়ে আসছি,
তখন দেখি প্রভাতের প্রবাহিণী প্রসবক্লান্ত
নারীর মতই প্রসন্ন,
আমরা যখন রাস্তা দিয়ে আসছি
তখন দেখি পৃথিবীটা আর রক্তবর্ণ মেষচর্মে আবৃত নয়,
সে তখন অনেক সুন্দর।
আমরা আসার পথে দেখলাম,
অজ্ঞাত সৈনিকের দল,
তাদের পাথরে-গাঁথা কঠিন স্মৃতিস্তম্ভ ত্যাগ ক'রে
সবুজ পোশাক প'রে আমাদেরই পিছন পিছন আসছে,
আমাদেরই পতাকা বহন ক'রে।
[ব্যূহ সংকীর্ণ হয়। অন্যতমা সংশপ্তক-পতাকা উত্তোলন করে। মধ্যে নায়কবৃন্দকে অসহায় জন্তুর মতো দেখায়। পর্দা নেমে আসে]

॥ যবনিকা ॥

সূর্যের মতো সমুদ্র

॥ চরিত্র লিপি ॥

সমুদ্র । মিছিল । শেষাদ্রি

নিয়নের আলোয় আইসক্রীম বার

রেবা । পরেশ । সতীশ

পাঁচ-ছ'বছরের একটি ছেলে

শোভনার মতো মেয়ে । নীলাদ্রি । অনিমেষ

অন্ধকার শেষাদ্রির পাশে ছোটো একটু ড্রইংরুম

শোভনা । মৃণাল । সৌম্যেন্দ্র

প্রতিধ্বনি । শেষাদ্রি

কোনো এক কণ্ঠস্বর

জ্ঞানেশ দত্ত । ড্যাডি । মামি কাকা

প্রতিধ্বনি

প্রথম জন । দ্বিতীয় জন । তৃতীয় জন । চতুর্থ জন । পঞ্চম জন

মায়া । অসীম । লতা

কণ্ঠস্বরে খুকু । কণ্ঠস্বরে পিয়ানো শিক্ষক

শূন্য মঞ্চ। অন্ধকার। এরপর পিছনে আলোর রেখা, সামনে কিন্তু তখনও অন্ধকার। পিছনে কোনো এক দিন। বর্তমানের, আবার মাঝে মাঝে হয়ত বা বর্তমান থেকে একটু স'রে অল্প দূরের কোনো এক ভবিষ্যতের। সামনে অন্ধকার। তারপর ঝাপসা আলোর প্রলেপ। সে আলোর বিষণ্ণ সন্ধ্যা যেন চিরকালের। ঘটনার আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা সমুদ্রের গর্জন। ওঠে, নামে, মাঝে মাঝে নিস্তব্ধ হ'য়ে যায়—সব সময়েই কিন্তু থাকে।

[সমুদ্রের গর্জন]

পিছনে আলোর রেখা। আলোর রেখায় মানুষের মিছিল। সামনে ঝাপসা আলো। একটি টেবিল। একটি চেয়ার। দর্শকদের দিকে মুখ ক'রে ব'সে একটি লোক—নাম শেষাদ্রি। দু'হাতের মধ্যে মুখ রেখে যেন ঘুমোচ্ছে। (সমুদ্রের গর্জন দূরে স'রে যায়।)

মিছিল : খাদ্যের দাবিতে···প্রতীক্ষায়···জীবনের দাবিতে এ মিছিল···

শেষাদ্রি : (আস্তে আস্তে মাথা তোলে। এতক্ষণ যেন স্বপ্ন-দেখা এক জগতে ছিলো। এইমাত্র যেন সেখান থেকে চ'লে এসেছে। কণ্ঠস্বরে দূরের মানুষের আভাস, যেন অনেক দূরের এক মানুষ, আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে আসছে) আশ্চর্য! অদ্ভুত স্বপ্ন! কি রকম যেন বিশ্রী—তবু সুন্দর! আলাদা—তবু কতো ভালো! ঠিক আমার মতো! ঠিক আমার মতো!···মাংসের দোকান ··· লোহার শিকে ঝোলানো খণ্ড খণ্ড মাংস···হাওয়ায় দুলছে, শুকোচ্ছে ···এমন সময় সে আসে···সে তো নয়, ও তো আমি, ঠিক আমার মতো···ফোঁটা ফোঁটা ঘাম···খোঁচা খোঁচা দাড়ি···দু'ধারে তোলা-উনুন···দু'চোখে স্বপ্নের আমেজ···আমার পেছনে, সামনে, তোলা-উনুনের ধোঁয়া···রাস্তার দু'ধারে লোক···সে সব অন্য লোক··· তাদের অন্য কথা···আর মাংসের দোকানে শিকে ঝোলানো খণ্ড খণ্ড মাংস···আমি কিন্তু ঐ রাশি রাশি ধোঁয়াকে সঙ্গে নিয়ে নীচু পথ দিয়ে নেমেই গেলাম···রুক্ষ চুল, পাজামার তলাটা ছেঁড়া—কি

রকম যেন নিজেকে টানতে টানতে···ঠিক যেন সেই মেয়েটা···
সারারাত আহ্লাদ বিক্রীর পর বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে···
অসংবৃত কেশ···বিস্রস্ত বসন···লুটিয়ে পড়া শাড়ীর আঁচলটাকে
কি রকম যেন টানতে টানতে···

[সমুদ্রের গর্জন। ওঠে—আবার দূরে স'রে যায়]

মিছিল : বাঁচার মতো বাঁচতে হবে কম্‌রেড্‌—আজ আমরা একসঙ্গে মিলেছি।

শেষাদ্রি : ওঃ! কি বিশ্রী···কি কর্কশ। এমন সুন্দর স্বপ্নটাকে ভেঙে দিয়ে গেল! কে? কে ওখানে?
কে ওখানে? (জিজ্ঞাসা প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরে ফিরে আসে।)
কে ওখানে? (প্রতিধ্বনিতে পারিপার্শ্বিকের শূন্যতার আভাস।)
কে ওখানে? (সমুদ্রের গর্জন। ওঠে, আবার নেমে যায়।)

মিছিল : (ভরাট কণ্ঠস্বরে) আমি মিছিল।

শেষাদ্রি : (ক্লান্ত ও অবসন্ন কণ্ঠস্বরে) ও, মিছিল! মিছিল!—কে যেন বলেছিলো না—এ নগরী মিছিল নগরী···মৃত-নগরী···ঠিকই তো বলেছিলো·

মিছিল : না, ঠিক বলেনি। ভীষণ জীবন্ত এ নগর—তাই বাঁচার তাগিদে এই একসঙ্গে মেলা। অন্যায়ের প্রতিবাদে মিছিলের পর মিছিল।

শেষাদ্রি : বাঁচা?—বাঁচার তুমি বোঝো কি?

মিছিল : বুঝি নিশ্চয়। নইলে এক হ'য়ে আছি কি ক'রে?

শেষাদ্রি : ওটা তো থাকা নয়। কর্কশ চিৎকার···ঠিক একপাল শুয়োরের মতো। বাঁচতে গেলে আলাদা আলাদা বাঁচতে হয়···ঠিক আমার মতো···আর সকলের থেকে আমি আলাদা···

মিছিল : মিছিল-শেষে আমিও আলাদা আলাদা হ'য়ে বাঁচি—তবে সেটা ঠিক তোমার মতো নয়। বাঁচার জন্যেই আলাদা আলাদা আমি মিছিল হ'য়ে যাই। তুমি কিন্তু পারো না।

শেষাদ্রি : পারি না নয়—হই না। হবার ইচ্ছে আমার নেই। স্বাধীন

মানুষ আমি। শুয়োরের পালের মতো একসঙ্গে এক খোঁয়াড়ে বাঁচা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মিছিল : এগিয়ে চলো কম্‌রেডস্, আমাদের সংগ্রামের আজ শুরু···

শেষাদ্রি : (ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে) না না, আমার কথা না শুনে এগিয়ে যাওয়া চলবে না। শোনো···শুনতে তোমাদের হবেই···বাঁচার মতো বাঁচতে গেলে অনেক কিছু পারতে হয়···সে সব আমি পারি··· শোনো, শুনে যাও···

মিছিল : আমাদের সঙ্গে এসো না? তোমার কথা শুনতে শুনতেই এগিয়ে যাই। (মিছিলটা যেন একটু নড়ে ওঠে। সমুদ্রের শব্দ যেন একটু বেড়ে যায়)।

শেষাদ্রি : কতটুকু বুঝতে পারবে তোমরা আমার কথার। জানো, এইমাত্র আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি—

মিছিল : স্বপ্ন দেখার অবসর যেদিন হবে, সেদিন আমরাও আমাদের স্বপ্ন দেখবো। সেদিন আমরাও আসবো তোমার কাছে—তোমার স্বপ্নের কথা শুনতে।

শেষাদ্রি : আমার স্বপ্নের মানে বুঝতে পারবে না তোমরা। তোমাদের সে রুচি নেই···তোমাদের সে ধার নেই···তোমাদের সে দীপ্তি নেই···

মিছিল : যে স্বপ্নের মানে আমরা বুঝি না—সে স্বপ্নের কথাও আমরা শুনি না। চলো কম্‌রেডস্—(মিছিলটা আর একটু ন'ড়ে ওঠে। সমুদ্রের শব্দ আর একটু বেড়ে ওঠে।)

শেষাদ্রি : কি বোঝো তোমরা? 'প্রতীকধর্মী' কথাটার মানে জানো?
[সমুদ্রের শব্দ বেড়ে ওঠে। সেই বেড়ে ওঠা শব্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে]

মিছিল : জানার যখন প্রয়োজন হবে, তখন নিশ্চয় জানবো। এখন বেঁচে থাকা কথাটার মানে বুঝি—তাই নিয়েই এগোচ্ছি। (মিছিল চলতে সুরু করে।)

মিছিল : ইন কিলাব—
[সমুদ্রের গর্জন]

মিছিল : জিন্দাবাদ—(মিছিল এগিয়ে যায়।)

শেষাদ্রি : শোনো···শুনছো···শুনে যাও—জীবনের তোমরা কিচ্ছু বোঝো না···তোমরা নিছক একপাল শুয়োর, জানো? আমি স্বপ্ন দেখি···সে স্বপ্ন আমারই মতো ক্লান্ত···অবসন্ন···এই সন্ধ্যার মতো বিষণ্ণ···অস্পষ্ট···বিশ্রী···অথচ সুন্দর···জানো? স্বপ্নে নিজকে আমার আহ্লাদ বিক্রী করা মেয়েছেলের মতো মনে হয়। ঠিক যেম তোমার আমার বেঁচে থাকা···জানো সে কথা?···জানো তোমরা? ···জানো না···তোমরা যে নিছক একপাল শুয়োর···চারপাশে তোমাদের মৃত নগরীর পাঁক···

মিছিল : ইন কিলাব জিন্দাবাদ···(সমুদ্রের গর্জন। মিছিল স'রে যায়।)

শেষাদ্রি : শুনছো···শোনো···শোনো তোমার···(ক্লান্ত অবসন্ন শেষাদ্রি। মুখ নামিয়ে নেয়।)

[সমুদ্রের গর্জন।]

শেষাদ্রি : (মুখ তুলে) আচ্ছা···ওদের আমি ডাকছি কেন?···কেন? ···তবে কি?···কিন্তু কি ক'রে হবে? ওদের সঙ্গে তো কোথাও আমার মিল নেই!···আমি যা দেখেছি তা তো ওরা দেখেনি···আমি যা পেয়েছি তা তো ওরা পায়নি! আজ আমার উনচল্লিশ বছর বয়স। সমস্ত পৃথিবীটাকে আজ আমার তেতো, বিস্বাদ ব'লে মনে হচ্ছে! ওরা এই মনে হওয়াটাকে কোনো দিন অনুভব করতে পারবে না। আজ আমার উনচল্লিশ বছর বয়স—আজ আমার জন্মদিন। (দেরাজ থেকে তিনটি বোতল আর একটি ছোটো গ্লাস বার ক'রে টেবিলের ওপর রাখে।) একটা পুরোনো কনিয়্যাক্ আছে —অনেক কষ্টে খানিকটা অ্যাবস্যাঁথ্ আর খানিকটা ভারমুথ যোগাড় করেছি। এটা আমার বাবার কাছ থেকে শেখা। তাঁরা বলতেন—ভারমুথ আর অ্যাব্স্যাঁথ্ না হ'লে নাকি ককটেলে স্বাদ আসে না। যোগাড় করতে কষ্ট একটু হয়েছে। কিন্তু জীবনের স্বাদ পেতে হলে কষ্ট একটু করতে হবে বৈকি! কিন্তু ওই যে শুয়োরের পালের মতো চিৎকার করতে করতে গেল—বোঝে ওরা? উনচল্লিশ

বছর বয়সের কেরাণী হয়েও আমি আমার জন্মদিন পালন করি। বোঝে—অ্যাবস্যাঁথ্‌ আর ভারমুথ না হ'লে ককটেলে আমার স্বাদ আসে না? কিচ্ছু বোঝে না—কিচ্ছু জানে না! শুধু বিশ্রী কর্কশ চিৎকার! মিছিল···মিছিলের পর বাড়ি···আর নয়তো ধোঁয়াটে চায়ের দোকান···বাড়ির সামনের রক···(আস্তে আস্তে মুখ নেমে আসে। সমুদ্রের শব্দ) কিন্তু কোথায় ফেরে ওরা? বাড়ি? ···কিন্তু বাড়ী তো ওদের নেই—সে তো হভেল!···ওদের তো শোবার ঘর নেই—সে তো খোঁয়াড়! (আবার মুখ তোলে। এবার যেন মুখে একটু আহ্লাদের হাসি। গ্লাসে মদ ঢেলে আস্তে আস্তে চুমুক দেয়।) সত্যি, ওদের কিন্তু শোবার ঘর নেই! শোন্‌···শুয়োরের দল, তোদের কিন্তু শোবার ঘর নেই! তোরা যেখানে শুস, সেটা খোঁয়াড়! সেখানে পাশাপাশি বিছানা পড়ে··· গা-জড়াজড়ি ক'রে তোরা শুয়ে থাকিস, আর সন্তানের জন্ম দিস্‌! ···তোরা শুয়োরের পাল···ওটা তোদের খোঁড়ায়···! (সমুদ্রের গর্জন। ওঠে আর নামে)। কিন্তু আমাদের কি আশ্চর্য এক বাড়ি ছিলো। কেমন যেন সাদা···অল্প অল্প নীল···উজ্জ্বল নীল আলোয় কেমন একটু অন্ধকারের ছোঁয়া···বাইরে শুধু—চাই দাও···জোর ক'রে নেওয়ার কর্কশ ইচ্ছা···অনেকগুলো জন্তুর একসঙ্গে জড়ো হওয়ার বিশ্রী শব্দ ··কিন্তু বাড়িতে ঢুকলেই অনেক দূরে চ'লে যেতাম ···তখনকার কুৎসিতের থেকে অনেক—অনেক দূরে···বাইরের টক গন্ধ—হ্যাঁ, ঘামের টক গন্ধ থেকে কি নিশ্চিত সেই মুক্তি···নীলচে সাদা···সাদাটে নীল···ঠিক যেন মরা-ফসিলের ঘর···কিন্তু ফসিল তো মরাই···তবে? ···তা হোক···মরা-ফসিলের ঘর নিশ্চয় দেখতে ভালো···নইলে তুলনাটা আমার মনে আসবে কেন?

[সমুদ্রের গর্জন ওঠে]

মিছিল : (দূর থেকে শোনা যায়) ইন কিলাব—জিন্দাবাদ—

শেষাদ্রি : ওই! শুধু ওই আছে!···শুয়োরের মতো কর্কশ চিৎকার! কিন্তু ওই চিৎকার পর্যন্তই···এ উপমা তোমাদের কোনদিন মনে

আসবে না···মরা-ফসিলের ঘরের সঙ্গে আমাদের আশ্চর্য বাড়ির এই সুন্দর উপমা ! আমার বাবাকে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না, তোমদের সে বুদ্ধির ব্যাপ্তি নেই···আমার কাকাকে তোমাদের পক্ষে ভাবাও সম্ভব নয়। তোমাদের দেশপ্রেমের সে ভাবরূপ নেই··· তখনকার দিনের ইংরেজ সরকার, সেই ইংরেজ সরকারের অ্যাডমিনি-স্ট্রেটিভ অফিসারেরা আমাদের বাড়ি আসতেন···ভাবতে পারো তোমরা ?—এদের মধ্যে আমার কাকা ছিলেন প্যাট্রিয়ট···কনট্রা-ডিক্‌সন্···কিন্তু কি সুন্দর বলো তো ? ভাবতেও ভালো লাগে ! কিন্তু কাকেই বা বলছি···ওরা এসব বুঝবে কেন। (সমুদ্রের গর্জন। ওঠে আবার নেমে যায়।)

মিছিল : (দূর থেকে শোনা যায়) আমাদের দাবি—(সমুদ্রের গর্জন। এবারের সমুদ্র তরঙ্গে উত্তাল।)

মিছিল : (দূর থেকে শোনা যায়) মানতে হবে—

শেষাদ্রি : না না, না···মানতে হবে না···কতকগুলো জন্তুর চিৎকার আমার মরা-ফসিলের ঘরের নৈঃশব্দ বিদীর্ণ করছে ··কতকগুলো নোংরা কুৎসিত জানোয়ার···বেটাছেলে মেয়েছেলে সব সমান··· মায়েরা মেয়েরা বোনেরা সব সমান···কালো কালো গা···খড়ি উঠছে···কোলে কাঁকালে উলঙ্গ ছেলে-পিলে···হাতে পায়ে হাজার ফাটা···মাঝে মাঝে মুখে খড়ি মাখে···এক হাতে আধময়লা ভ্যানিটি···আর অন্য হাতে ছেলেপুলে ধরা···পায়ে ব্যাঁকা ব্যাঁকা চটি···

[শেষাদ্রি অস্পষ্ট হয়ে আসে। মঞ্চের একপাশে একটু আলো পড়ে। নিয়নের আলোয় আইসক্রীম বার। সামনের রাস্তায়, সতীশ, পরেশ ও রেবা। রেবার এক হাতে আধময়লা ভ্যানিটি, আরেক হাতে হাত-ধরা পাঁচ-ছ'বছরের একটি বাচ্চা ছেলে।]

রেবা : তাহলে ঠাকুরপো, সাহেব-পাড়ায় বায়োস্কোপ দেখা হলো না ?

পরেশ : কই আর হলো। দু'টাকা সাত আনার কম টিকিট নেই—

সতীশ : ওসব বরাতে থাকা চাই—

রেবা : কেন—বরাত কিসের ?

সতীশ : দেখলে না—টিকিট নেই।

পরেশ : সাতদিন আগে কেটে রাখলেই থাকতো—

সতীশ : সাতদিন আগে মাসের শেষ। আজ সবে মাইনে পেয়েছি। কিন্তু ওই যে বললাম—বরাতে নেই, তাই টিকিট পেলাম না।

রেবা : কার বরাতে ?

সতীশ : কেন ?—আমাদের।

রেবা : অ্যাঁঃ—তাই নাকি! বলো—সাহেব-পাড়ার বরাতে নেই—তাই আমরা গেলাম না।

পরেশ : ক্লাস্ বৌদি! এটা যা বলেছ না!

রেবা : আমি বে-কেলাস্ বলি না ঠাকুরপো।

[শেষাদ্রি একটু যেন স্পষ্ট হয়]

শেষাদ্রি : সাহেব-পাড়া…বায়েস্কোপ…বেকেলাস্…কি….বিশ্রী….কি কুৎসিত…

[আইস্‌ক্রীম বার থেকে সুন্দর একটি মেয়ে বেরিয়ে আসে। সঙ্গে নীলাদ্রি আর অনিমেষ]

শেষাদ্রি : দেখো, মেয়ে কাকে বলে, ঠিক আমার বোন শোভনার মতো…সঙ্গে যেন মৃণাল আর সৌম্যেন্দ্র…

শোভনার মতো মেয়ে : নীলু—ডার্লিং, এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি—

অনিমেষ : নীলাদ্রিকে তুমি তখন থেকে ডার্লিং ডার্লিং করছো! আমি কিন্তু ভীষণ রেগে যাবো!

নীলাদ্রি : বারে! ও কাল সারাদিন যে তোমাকে ডিয়ার ডিয়ার করেছে! —তার বেলা বুঝি কিছু নয় ?

অনিমেষ : আর পরশু ও যে তোমার টেনিসের পার্টনার ছিলো—সেটা ?

শোভনার মতো মেয়ে : তোমরা তাহলে ঐ করো! আমি কিন্তু যাকে সামনে পাবো, তাকে নিয়ে চ'লে যাবো।

অনিমেষ ও নীলাদ্রি : (একসঙ্গে) না না—সে কি!

অনিমেষ : (নীলাদ্রিকে) শেক্— (হাত বাড়াইয়া দেয়।)

নীলাদ্রি : (অনিমেষকে) শেক্—(করমর্দন করে।)

অনিমেষ ও নীলাদ্রি : (একসঙ্গে) কোথায় যাবে ?

শোভনার মতো মেয়ে ঃ সত্যিকারের বারে—(বাচ্চা ছেলেটির ইজার খুলে যায়। রেবা উবু হয়ে বসে ইজার বাঁধতে সুরু করে। মেয়েটি বাচ্চাটির কাছে এসে মাথা নেড়ে দিয়ে আদরের সুরে বলে) —বা রে ছেলে !

রেবা : দেখতে বেশ, দিদি—কিন্তু ভীষণ বজ্জাত !

শোভনার মতো মেয়ে ঃ হাউ ভাল্‌গার !

অনিমেশ ও নীলাদ্রি : (একসঙ্গে) হাউ ফানি ! (তিনজনের প্রস্থান। অন্তরাল হতে তাদের হাসির শব্দ শোনা যায়।—হাউ ভাল্‌গার —হাউ ফানি—)

শেষাদ্রি : (অবসন্ন ক্লান্ত কণ্ঠস্বর) হাউ ভাল্‌গার—হাউ ফানি— (মদ্যপান করে।)

রেবা : কি ব'লে গেল ঠাকুরপো ?

পরেশ : বলে গেল—কি মজার, কি সাধারণ—কি অশিষ্ট···

সতীশ : (হাসতে হাসতে) যাও, দিদি ব'লে ডাকো—(রেবা কোনো উত্তর না দিয়ে হেসে ওঠে।)

পরেশ : আনন্দ যে ধরে না—

রেবা : ভাবছি—

সতীশ : (হাসতে হাসতে) কি ভাবছো ?—দিদি কেন চলে গেল ? (রেবা উত্তর না দিয়ে হাসতে থাকে।)

পরেশ : বলো না বৌদি ?

রেবা : বলছি—আগে বলো, এটা কিসের দোকান ?

পরেশ : আইস্‌ক্রীমের—

রেবা : মানে বরফের ? (পরেশ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে।)

বাচ্চা : মা, বরফ খাবো—

রেবা : চলো ঠাকুরপো—আজ আমরা বরফ খাই—

পরেশ : আরে, না হয় খাচ্ছি।—কিন্তু তুমি হাসলে কেন?

রেবা : বরফ কতো ক'রে নেবে এখানে?

পরেশ : একটু ভালো ক'রে খেতে গেলে—চারজনের চার টাকা—কিন্তু—

রেবা : তাহলে দরকার নেই—

পরেশ : কেন? ছবি দেখলেও তো পাঁচটাকা খরচা হতো—

রেবা : আরে ছবির জন্যে তবু পাঁচটাকা খরচা করা যায়—তাই ব'লে কি বরফেও—

বাচ্চা : মা, বরফ খাবো—

পরেশ : (আইস্ক্রীম বারের দিকে অগ্রসর হতে হতে) কই বৌদি, এসো—

রেবা : না ঠাকুরপো, থাক। (বাচ্চাকে দেখিয়ে) তুমি তার চেয়ে বরং এর জন্যে একটা কাঠি-দেওয়া নিয়ে এসো—

বাচ্চা : কি মা?—বরফ? (রেবা ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বললে, তালি দিতে দিতে এদের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে) কি মজা—বরফ খাবো—কি মজা—বরফ খাবো—(দোকানের পাশে বোধ হয় ছোটো একটু রেলিং-ঘেরা পার্ক। সেখানে গোল হয়ে একটু সবুজ আলো এসে পড়ে। রেবা আর সতীশ সেই আলোর মধ্যে বসে পড়ে। বাচ্চাটি তালি দিতে দিতে ঘুরতে থাকে) কি মজা—বরফ খাবো···কি মজা—বরফ খাবো···

পরেশ : কিন্তু বৌদি, হাসির ব্যাপারটা তো বললে না—

রেবা : ও হ্যাঁ—মেয়েটা তখন কি যেন বলে গেল?

সতীশ : ভালগার—ফানি—

বাচ্চা : কি মজা—বরফ খাবো—

রেবা : হ্যাঁ—কিন্তু কি মুখ্যু দেখো! ভাবলো না—আমরাও ঠিক ওর মতো হতে পারতাম—

সতীশ : পারতে বুঝি!

বাচ্চা : কি মজা—বরফ খাবো!

রেবা : হ্যাঁ, আর ও আমাদের মতো—

পরেশ : কি করে ?

বাচ্চা : কি মজা, বরফ খাবো···কি মজা বরফ খাবো—

রেবা : (বাচ্চাকে কোলের মধ্যে নিয়ে) পাল্লাটা আজ ওর দিকে বেঁকে আছে, তাই। আমাদের দিকে বেঁকে থাকলেই দেখতে—ঠিক ঐ রকম হতাম। বিশ্রী—কুৎসিত—অশ্লীল—

বাচ্চা : (মায়ের কোলের মধ্যে) কি মজা—বরফ খাবো—

সতীশ : আশ্চর্য কিন্তু! দেখেছো, পাল্লা যাদের দিকে বাঁকা তারাও ভালো হয় না—

রেবা : হবার তো উপায় নেই! খোল-নলচে না বদলালে কি করে হয় বলো—

বাচ্চা : (মায়ের কোল হতে উঠবার চেষ্টা করে) কি মজা, বরফ খাবো —(রেবা বাচ্ছাকে আরও জোরে কোলের মধ্যে চেপে ধরে।)

পরেশ ঃ যা বলেছো বৌদি! ও খোল-নলচে বদলে ফেলাই দরকার! আচ্ছা, তোমরা বসো—আমি আইস্‌ক্রীমটা নিয়ে আসি···(উঠে আইস্‌ক্রীম বারের ভিতর চলে যায়।)

বাচ্চা : (মায়ের কোলের মধ্যে, একগাল হেসে) কি মজা, আমি বরফ খাবো—

সতীশ : তাহলে ? খোল-নলচে বদলে দিচ্ছ ?

রেবা : নিশ্চয় !

সতীশ : একটু আগে-ভাগে খবর দিও। তৈরি হয়ে থাকবো—

রেবা : তাহলে তৈরি হও—

সতীশ : তার মানে ?

রেবা : কাল থেকেই আরম্ভ করছি কিনা—

সতীশ : কি রকম ?

রেবা : ঠাকুরপোরা যে মিছিল বার করছে···বাড়ির গিন্নীদের মিছিল···

সতীশ : দাবি ?

রেবা : খেয়ে পরে বাঁচতে চাই—খাইয়ে পরিয়ে বাঁচাতে চাই—

সতীশ : আর কিছু চাও না ?
রেবা : চাই, তোমাকে—
সতীশ : সেটাও কি ওখানে পেশ করবে নাকি ?
রেবা : ঠেকাচ্ছে কে ?
সতীশ : সত্যি ?
রেবা : সত্যি—
সতীশ : ইন্‌কিলাব—জিন্দাবাদ—

[সমুদ্রের শব্দ বেড়ে ওঠে]

দূরের মিছিল : ইন্‌কিলাব—জিন্দাবাদ—

[পরেশ আইস্‌ক্রীম নিয়ে বাইরে আসে। বাচ্চার হাতে আইস্‌ক্রীম দেয়]

বাচ্চা : কি মজা, বরফ খাবো—

[সমুদ্রের গর্জন, আর দূরের মিছিল যেন বাচ্চার কথাটাকে ধরে]

সমুদ্র আর দূরের মিছিল : কি···মজা···ব···র···ফ···খাবো···(সতীশ আর রেবা ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।)

পরেশ : চলো বৌদি—যাওয়া যাক—(প্রস্থান পথের দিকে যাইতে যাইতে) মনে আছে তো—কাল মিছিল—? (রেবা ঘাড় নাড়িয়া 'হ্যাঁ' বলে। রেবা, সতীশ, পরেশ ও বাচ্চার প্রস্থান। সমুদ্রের গর্জন। সঙ্গে সঙ্গে দূরের মিছিলের—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ)

শেষাদ্রি : মিছিল···মিছিল···আবার মিছিল···কে যেন বলেছিল না ? ···মৃত নগরী···মিছিল নগরী···এরা যেন ছোটো ছোটো কাদার দলা···যখন ইচ্ছে একসঙ্গে মিশে যাচ্ছে···আশ্চর্য এরা···কি অদ্ভুত ধরনের বোকা···দিনের আলোর প্রতি মুহূর্তে রাতের অন্ধকার নামিয়ে আনা যায়···চব্বিশ ঘণ্টার প্রতি মুহূর্তে নিজের চারদিকে বিষণ্ণ সন্ধ্যার অস্পষ্ট আভাস এনে নিজেকে আলাদা করে নেওয়া যায়···যা আমি প্রতি দিন, নিয়ত করে থাকি··· দশটা পাঁচটার বাধ্য হয়ে যাওয়া অফিসে যখন চারপাশে আমার ভেড়ার পাল···চারপাশে আমার মৃত নগরীর মিছিল, তখন

বার বার, অতীতের অ্যাবসাঁথ্ মেশানো ককটেলের স্মৃতি আমাকে, আমার নিজেকে কেমন সুন্দর করে আলাদা ক'রে দেয়।···তখন আমিও দুঃখ অনুভব করি···কিন্তু সেটা এদের মতো কুৎসিত চিৎকার নয়···সে এক আধুনিক শোক···লারবোর কবিতার মতো সুন্দর···শীতের কুয়াশার মতো যেন অকারণ স্বর্গ থেকে নেমে এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে···আমাকে আলাদা করে নিয়েছে। শোভনার জন্যে একদিন আমি ঐ দুঃখ অনুভব করেছিলাম—কিন্তু সেটা ওদের মতো অশালীন চিৎকার নয়···

[সমুদ্রের গর্জন। ঢেউ যেন তীরে এসে আছড়ে পড়ছে]

দূরের মিছিল : ইন্‌কিলাব—জিন্দাবাদ—

শেষাদ্রি : কি যেন ভাবছিলাম?···(দূর থেকে—ইন্‌কিলাব, জিন্দাবাদ) আঃ···আবার সেই অসভ্যের মতো···কিন্তু কি যেন বলছিলাম?··· কার কথা?···(মদ্যপান) মনে পড়েছে··· শোভনার কথা··· শুনছো ··· শুনছো তোমরা···

মিছিল : (বিভিন্ন দিক থেকে উত্তর আসে) শুনছি···বলো···

শেষাদ্রি : কে?···কে তোমরা?

মিছিল : আমরা ভাঙা মিছিল···এবার মিছিল ভেঙে নিজেরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি।

শেষাদ্রি : কক্ষণো না···আলাদা তোমরা হ'তে পারো না···দূরের মিছিল। (চারপাশ থেকে, দূর থেকে ছোটো ছোটো হাসি, ছোটো ছোটো কথাবার্তা ভেসে আসে—হাসি—কি রে কোন্ দিকে যাবি?···বাড়ির দিকে···কি রকম বললে মাইরি···হাসি···)

শেষাদ্রি : না না, কক্ষণো না···নিজেকে তোমরা কক্ষণো আলাদা ক'রে ভাবতে পারো না···(চারপাশ থেকে···দূর থেকে—হাসি···কি রে, বোস না···ওরে, আমাদেরও বাড়িতে ইয়ে আছে···হাসি···) তোমাদের বাড়িতে কিছু নেই···তোমরা নেই···তোমাদের বাড়িও নেই···তোমরা কাদার তাল···ওগুলো বাড়ি নয়—খোঁয়াড়··· তোমাদের দুঃখ কোনদিন ওপর থেকে শীতের কুয়াশার মতো

নেমে এসে তোমাদের আচ্ছন্ন করে না···তাই তোমরা আলাদা নও ···তাই তোমরা কাদার তাল···তাই তোমরা কিছু নও···আমাকে কিন্তু করে···বিশ্বাস করো তোমরা, শোভনার বেলা করেছিল···ঠিক ওপর থেকে নেমে আসা শীতের কুয়াশার মতো···আর ওদের মধ্যে এইটে···যেটা নিজেকে মেয়ে ব'লে মনে করে···শোভনার মতো মেয়েটিকে দেখে যেটা বলে—আমরাও ঠিক ওর মতো হ'তে পারতাম ···ঐ যে ঐটে···যেটা একটু আগে ব'লে গেল কাল মিছিলে যাবে ···শুনছো···শোনো তোমরা—ওটা বলে···ওটা নাকি শোভনার মতো হতে পারতো···কি মজার কথা···শুনেছো তোমরা—ওটা নাকি শোভনার মতো হতে পারতো—হা-হা-হা—শোভনার মতো হতে পারতো শোভনা···শোভনা···শোভনা···(শেষাদ্রির উপর আলো আস্তে আস্তে কমিয়া আসে। শেষাদ্রি ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসে। অন্ধকারে শেষাদ্রি মাথা নামাইয়া নেয়। অন্ধকারেই শেষাদ্রি ডাকে—শোভনা—শোভনা—শোভনা···মঞ্চের চারপাশ থেকে যেন প্রতিধ্বনি আসে—শোভনা—শোভনা। সমুদ্রের গর্জন। আর গর্জনের শেষে যেন—শোভনা—শোভনা। অন্ধকার শেষাদ্রির বাঁ দিকে, মঞ্চের ধার ঘেঁসে, পাদপ্রদীপের দিকে একটু যেন এগিয়ে, কালো অন্ধকারের একটা পর্দা যেন সরে যায়। শেষাদ্রি তখন অন্ধকার, কিন্তু তার পাশে তখন আলো। আর সেই আলোয় ছোটো টেবিল, ছোটো সোফা, ছোটো-খাটো ড্রয়িংরুম। সে ড্রইংরুমের সমতল যেন শেষাদ্রির টেবিলের সমতলের একটু নীচে। সমুদ্রের গর্জন। গর্জনের শেষে—শোভনা —শোভনা—। তারপর সমস্ত শোভনা-ডাক যেন ড্রয়িংরুমের উপর এসে মিলিয়ে যায়।) অন্ধকার শেষাদ্রির পাশে একটু আলোয় ছোটো একটু ড্রয়িংরুম। শেষাদ্রির কাছের সোফায় শোভনা। শোভনার হাতে পানপাত্র—পানীয়ের রং সোনালী। মদিরা উন্মত্ত শোভনার বাঁ-পাশে তুইজন—মৃণাল, আর সৌম্যেন্দ্র।)

শোভনা : (হাতে পানপাত্র। ঠোঁটে বিষণ্ণ হাসি।) মৃণাল—সৌম্যেন্দ্র, হঠাৎ যেন কি রকম মনে হচ্ছে—

মৃণাল ও সৌম্যেন্দ্র : (একসঙ্গে, হাতে পানপাত্র) কি মনে হচ্ছে শোভনা ?

শোভনা : (পানপাত্রে চুমুক দিয়া) কি রকম যেন এক জায়গায় এসে থেমে গেছি···আর এগোবার পথ নেই···

অস্পষ্ট শেষাদ্রি : কি সুন্দর কথা বলতো শোভনা···বুঝতে পারবে সেই মেয়েটা—এসব কথার মানে··· ?

মৃণাল ও সৌম্যেন্দ্র : (একসঙ্গে) তোমার এই ভাবে কথা বলাটা কিন্তু আমাদের ভারী ভালো লাগে শোভনা···

শোভনা : (পানপাত্রে চুমুক দিয়া) আমার এটাতে একটু ঢেলে দেবে ? (পানপাত্র এগিয়ে দেয়।)

মৃণাল ও সৌম্যেন্দ্র : (একসঙ্গে) নিশ্চয়—(শোভনার পাত্রে মদ ঢেলে দেয়।)

শোভনা : (পানপাত্রে চুমুক দিয়া) কি রকম যেন নেশা কেটে যাচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছে—

মৃণাল ও সৌম্যেন্দ্র : (একসঙ্গে) একটু স্ট্রং ক'রে দেবো ?

শোভনা : (একটু হেসে) না না, ও নয়—ও নয়, ওতে আর আমার নেশা হয় না···

মৃণাল ও সৌম্যেন্দ্র : (একসঙ্গে) তবে ? কিসের নেশা কেটে যাচ্ছে শোভনা ?

শোভনা : (আবার একটু হেসে) জীবনের—

অস্পষ্ট শেষাদ্রি : কি সুন্দর ছোটো ছোটো কথা ! যেন বরফির মতো ছোটো ছোটো ক'রে কাটা !

মৃণাল ও সৌম্যেন্দ্র : (একসঙ্গে) আজ তোমার সত্যি নেশা হয়েছে শোভনা···

শোভনা : (পানপাত্রে চুমুক দিয়া) নেশা ? (মিষ্টি হাসির শব্দ তুলিয়া) তা হয়ত হবে !

অস্পষ্ট শেষাদ্রি : কি সুন্দর···হাসি তো নয়···যেন ভাঙা ভাঙা—টুকরো টুকরো জীবন···

শোভনা : খুব মিষ্টি একটা গোলাপের গন্ধ পাচ্ছ না তোমরা ?

মৃণাল ও সৌম্যেন্দ্র : (একসঙ্গে) কই, না তো ?

শোভনা : আমি কিন্তু পাচ্ছি—

মৃণাল ও সৌম্যেন্দ্র : (একসঙ্গে) সত্যি তোমার নেশা হয়েছে শোভনা—

শোভনা : (ঠোঁটে বিষণ্ণ হাসির রেখা। পানপাত্রে চুমুক দিয়া) জানো সৌম্যেন্দ্র, জানলে মৃণাল···যখনই এই গন্ধটা আমি পাই, তখনই নিজেকে আমার খুব আলাদা ব'লে মনে হয়! গোলাপের গন্ধটা আসে আর আমিও এই টলটল করা কক্‌টেলের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকি। চেয়ে থাকি, আর মনে হয়—নেমে যাচ্ছি···কোথায় যেন নেমে যাচ্ছি···এমন এক জায়গায়—যেখানে কক্‌টেল আর মরণ···তুই বোধ হয় সমান···তুই বোধ হয় সমান···তুই বোধ হয় সমান···(বলে, আর আপন মনে হাসে।)

মৃণাল ও সৌম্যেন্দ্র : (একসঙ্গে) আমাদের একটা কথা রাখবে শোভনা ?

শোভনা : কি বলো তো ?

মৃণাল ও সৌম্যেন্দ্র : (একসঙ্গে) আর খেও না—আজ তোমার সত্যিই নেশা হয়েছে—

শোভনা : (মুখে সেই বিষণ্ণ হাসি) বোধ হয় আজ আমার সত্যিই নেশা হয়েছে! আচ্ছা, আজ তা হলে তোমরা এসো,—এসো সৌম্যেন্দ্র—এসো মৃণাল···

মৃণাল : কিন্তু শোভনা—আজ তুমি আমাকে কথা দেবে বলেছিলে—

সৌম্যেন্দ্র : আমাকেও তুমি বলেছিলে শোভনা—আজ তুমি তোমার শেষ জবাব জানিয়ে দেবে—

শোভনা : (একটু যেন হেসে) বলেছিলাম—না ? এই হয়! তোমাদের তুজনের একজনকে কথা দেবো বলেছিলাম, কিন্তু কথা আমি কাউকেই দিতে পারছি না—

মৃণাল ও সৌম্যেন্দ্র : (একসঙ্গে) আমরা কি কাল আসবো শোভনা ?

শোভনা : কথা আমি তোমাদের দিতে পারছি না মৃণাল···না, তোমাকেও না সৌম্যেন্দ্র---

মৃণাল : কিন্তু শোভনা—

সৌম্যেন্দ্র : আশা করি কারণটা নিশ্চয় জানতে পারবো—

শোভনা : (পানপাত্রে চুমুক দিয়া) ঐ যে বললাম—গোলাপের সেই গন্ধটা আসছে···টলটল করা কক্‌টেলের দিকে চেয়ে আছি···চেয়ে আছি আর মনে হচ্ছে—নেমে যাচ্ছি···কোথায় যেন নেমে যাচ্ছি ! যেখানে মরণ আর কক্‌টেল তুই বোধ হয় সমান—

সৌম্যেন্দ্র : কারণটা একটু অ্যাবস্‌ট্র্যাক্‌ট্‌ হয়ে যাচ্ছে না ?

শোভনা : ইট-কাঠের কারণটা সহ্য করা একটু শক্ত হবে সৌম্যেন্দ্র—

মৃণাল : আমার বেলাও তাই শোভনা ?

শোভনা : তোমার বেলাও তাই মৃণাল । ঐ একই গোলাপের গন্ধ···ঐ একই কক্‌টেল—

সৌম্যেন্দ্র : তবু শুনিই না ?

শোভনা : শুনবে ? (মিষ্টি হাসির ঝঙ্কার তুলিয়া) সত্যি শুনবে ? (তুইজনেই ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানায় । সমুদ্রের গর্জন । গর্জনের শেষে—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ । আওয়াজ মিলাইতে না মিলাইতেই) তোমরা তুজন আর আমি—আমাদের মধ্যে আজ দেওয়াল উঠেছে—

মৃণাল ও সৌম্যেন্দ্র : (একসঙ্গে) দেওয়াল ? কিসের দেওয়াল শোভনা ?

শোভনা : ঐ যে বললাম—গোলাপের মিষ্টি গন্ধ আর কক্‌টেলের পথ —পথ বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছি ··

মৃণাল : ওটা তো আগেই বলেছো শোভনা—

শোভনা : বলেছি বুঝি···

সৌম্যেন্দ্র : হ্যাঁ, ঐ যে আমি তোমায় বললাম—কারণটা একটু অ্যাবস্‌-ট্র্যাক্‌ট্‌ হয়ে যাচ্ছে—

শোভনা : (খিলখিল করিয়া হাসিতে হাসিতে) কিন্তু এ কথাটা তো বলিনি ?—সেই নেমে যাওয়া পথের সামনে শিগগির আর একজন

আসছে ?—বলেছি কি ?

মৃণাল ও সৌম্যেন্দ্র : (একসঙ্গে) শোভনা !

শোভনা : আমি তো বলেছিলাম, ইঁট-কাঠের কারণটাকে তোমরা সহ্য করতে পারবে না ! কি মৃণাল—মাথা নীচু করলে কেন ?

মৃণাল : আমার বোধ হয় তাতেও আপত্তি নেই। অবশ্য যদি আমি—

শোভনা : আর যদি তুমি না হও ? (মৃণাল কিছু না বলিয়া মুখ নামায়।) তুমি কি ভাবছো সৌম্যেন্দ্র ?

সৌম্যেন্দ্র : ভাবছি—না হয় অ্যাবস্ট্র্যাক্টেই রয়ে যেতে—

শোভনা : তা তো আর থাকা গেল না, তাই এখন···

সৌম্যেন্দ্র : একটু ভেবে দেখতে হবে শোভনা ! অবশ্য যদি আমি—

শোভনা : কিন্তু তুমি তো নও, (সৌম্যেন্দ্র মুখ নামায়।) আচ্ছা—তোমরা তাহলে এখন এসো, এসো সৌম্যেন্দ্র—এসো মৃণাল···

মৃণাল ও সৌম্যেন্দ্র : (একসঙ্গে) না—মানে শোভনা···

শোভনা : বুঝেছি। তোমরা এখন এসো—দুজনেই। (দুইজনেই মুখ নীচু করিয়া দাঁড়ায়।) চলো, তোমাদের এগিয়ে দিয়ে আসি। (দুইজনের পিঠে হাত রাখিয়া, তাহাদের লইয়া বাম পার্শ্বের অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর আবার শোভনাকে দেখা যায় ছোটো টেবিলের কাছে-এসে-পড়া ছোটো একটু আলোর বৃত্তের মধ্যে। হাতে পানপাত্র।)

শেষাদ্রি : (অস্পষ্ট আলো শেষাদ্রির দুই হাতের তালুর মধ্যে নীচু করা মুখের উপর) শোভনা·· শোভনা···(এই শোভনা-ডাক মঞ্চের চারিদিক থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে···শোভনা···শোভনা শোভনা···)

শোভনা : (ততক্ষণে বসেছে। হাতে-ধরা পানপাত্রে-রাখা পানীয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ।) কে ?—দাদা ?

প্রতিধ্বনি শেষাদ্রি : হ্যাঁ রে শোভনা—আমি। তোর কি খুব খারাপ লাগছে ?

শোভনা : খারাপ ? কই, না তো ! উল্টে বেশ ভালই লাগছে রে !

প্রতিধ্বনি : সত্যি ?

শোভনা : হ্যাঁ রে ! এই ককটেলটুকুর দিকে তাকিয়ে কেমন নিজেকে দেখতে পাচ্ছি···

প্রতিধ্বনি : সত্যি ?

শোভনা : হ্যাঁ রে ! এই মদটুকুর ভেতর দিয়ে নেমে গিয়ে গ্লাসটার কোথায় কোন্ তলায় প'ড়ে আছি···যেন অনেকদিন আগে ডুবে যাওয়া একটা নৌকো···আজ আর সেটা যেন নৌকো নেই··· সেটা যেন একটা মরা কাঠ···কতদিন ধ'রে প'ড়ে আছে···সূর্যের স্বপ্ন দেখা তার বারণ···নিজের চারপাশে দূষিত গন্ধ নিয়ে সে যেন স্বপ্ন দেখে সৌর-কলঙ্কের···সে যেন স্বপ্ন দেখে মৃত্যুর !

প্রতিধ্বনি : কিন্তু ওদের তুজনের মধ্যে একজনকে···

শোভনা : সে হয় না দাদা···

প্রতিধ্বনি : তার মানে ? সত্যি ওরা কেউ নয় ?

শোভনা : না।

প্রতিধ্বনি : তবে ? তবে এ নৌকাডুবি করালে কে ?

শোভনা : জ্ঞানেশ দত্ত···

প্রতিধ্বনি : মানে ? আমাদের মিস্টার দত্ত ?

শোভনা : হ্যাঁ, আমাদের মিস্টর দত্ত, ড্যাডির বন্ধু—

প্রতিধ্বনি : তাহলে তো ওই ড্যাডিকে একবার···মানে মিস্টার দত্তকে একবার—

শোভনা : ড্যাডি তো জানে, আর তাছাড়া মিসেস দত্ত আছেন না ! তার ওপর মামি···

প্রতিধ্বনি : ও, তাও তো বটে ! তবে—তবে শোভনা, তবে ?

শোভনা : ড্যাডি সুনীলকে ডেকে পাঠিয়েছিলো।

প্রতিধ্বনি : সুনীল, মানে ?

শোভনা : সেই যে—আমাকে যে পড়াতো, একবার ড্যাডির কাছে তো কথাও পেড়েছিলো···

প্রতিধ্বনি : মনে পড়েছে (হাসিতে হাসিতে), ড্যাডি তাকে তোর

মাসিক টয়লেট খরচার হিসেবটা শুনিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সে নিশ্চয় আসেনি? সে তো এখন শুনেছি মিছিল করার নতুন হুজুগ নিয়ে খুব ব্যস্ত…

শোভনা: তবু কিন্তু এসেছিল, ড্যাডির প্রস্তাবে এক কথায় রাজীও হয়েছিল, কোনো কৈফিয়ৎ চায়নি, কোনো মূল্য ধ'রে দিতে বলেনি।

প্রতিধ্বনি: তবে শোভনা—তবে?

শোভনা: কি জানি দাদা, সমুদ্রে মেলার সুযোগ একটা পেলাম কিন্তু নিতে পারলাম না।

প্রতিধ্বনি: কেন শোভনা, কেন?

শোভনা: কি জানি দাদা! ওরা বলে ওদের মিছিল নাকি রৌদ্রের মতো উজ্জ্বল (পানপাত্রে চুমুক দিয়া, অবশিষ্ট পানীয়টুকুর দিকে দেখিতে দেখিতে) আমি কিন্তু আমার নীল আলোয় ওদের দিকে তাকিয়ে দেখেছি, আমার কিন্তু ওদের রৌদ্রের মতো উজ্জ্বল ব'লে মনে হয়নি। পরস্পরের মধ্যে কোনো সীমারেখা নেই, পাশাপাশি চললে সবাই যেন এক, কিন্তু আমি তো এক নই—আমি তো আলাদা, অনেকটা যেন ড্যাডির মতো; অনেকটা বোধহয় মামির মতো আর কিছুটা বোধহয় তোর মতো আলাদা…

প্রতিধ্বনি: ঠিক বলেছিল, অনেকটা ড্যাডির মতো—অনেকটা মামির মতো—খানিকটা আমার মতো। আর কিছুটা বোধ হয় (শোভনা ধীরপদে একটু যেন আচ্ছন্ন অবস্থায় প্রস্থানপথের অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইয়া পড়ে—)

শোভনা ও শেষাদ্রি: (প্রস্থানপথের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া ও শেষাদ্রি দৃষ্টি দ্বারা অতীত-স্মরণ করিতে করিতে নিচু করা মুখ উপর দিকে তুলিয়া। দুইজনে একই সঙ্গে)—আর কিছুটা বোধহয় জ্ঞানেশ দত্তর মতো আলাদা…(শোভনা অন্ধকারে মিলাইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের গর্জন—অস্পষ্ট আভাস থেকে ক্রমশ যেন স্পষ্ট—আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।)

শেষাদ্রি: হ্যাঁ, ড্যাডির মতো—মামির মতো আলাদা…আমার মতো,

জ্ঞানেশ দত্তর মতই আলাদা। হ্যাঁ, জ্ঞানেশ দত্তর মতো,—তবু কিন্তু আলাদা (সমুদ্রের গর্জন আরও প্রচণ্ড হয়) না—না—না, তোমরা রৌদ্রের মতো উজ্জ্বল নও, তোমরা একসঙ্গে জড়ো করা একটা পদার্থ। তোমরা কোনদিন নিজের মধ্যে ফিরে আসতে পারবে না, খুব যদি কাছাকাছি আসো, তো পাশের লোকটি পর্যন্ত এসে হারিয়ে যাবে। আমি কিন্তু আমার নীল ছায়াঘেরা পথ দিয়ে বার বার নিজের মধ্যে ফিরে আসি, আমার কিন্তু কোনো কম্পাসের কাঁটা নেই,—কোনো মিছিল কিন্তু আমাকে পথ দেখায় না। (সমুদ্রের গর্জন। গর্জনের শেষে কণ্ঠস্বর—)

কণ্ঠস্বর : দেখায় না বলেই তুমি নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। দেখায় না বলেই শোভনা ঐভাবে হারিয়ে গেল !

শেষাদ্রি : কখনো না।—কে তুমি ?

কণ্ঠস্বর : ধরো না, ভাঙা-মিছিলের একজন।

শেষাদ্রি : কিন্তু অনেকটা যেন···

কণ্ঠস্বর : কি অনেকটা যেন ?

শেষাদ্রি : অনেকটা যেন আমার মতো—

কণ্ঠস্বর : ধরো না—আমি তুমি।

শেষাদ্রি : কখনো না, আমি তুমি নই।—আমাদের সঙ্গে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই !

কণ্ঠস্বর : তোমার সঙ্গে হয়ত এখনো নেই, শোভনার দুঃখের সঙ্গে কিন্তু আছে।

শেষাদ্রি : না, কখনো না—শোভনার দুঃখ বিষণ্ণ সন্ধ্যার মতই সুন্দর।

কণ্ঠস্বর : (একটু একটু করিয়া দূরে সরিয়া যাইতে থাকে) তবু কিন্তু সেটা দুঃখ—

শেষাদ্রি : না, তোমরা বোঝো না শোভনার আনন্দের চারপাশে নীল, শোভনার চারপাশেও নীল···

কণ্ঠস্বর : (মিলাইয়া যাইতে যাইতে, দূর থেকে) তবু কিন্তু সেটা দুঃখ।

শেষাদ্রি : হোক দুঃখ কিন্তু সেটা শোভনার আনন্দর মতই বিষণ্ন। শুনছো, শুনে যাও—শোভনার দুঃখ শোভনার আনন্দের মতই বিষণ্ন···তোমাদের কুৎসিত রৌদ্রের মতো উজ্জ্বল নয়—শুনছো, শুনে যাও, শুনে যাও···একপাল শুয়োরের মতো কুৎসিত···একতাল কাদার মতো জড়ো করা···ঐ তো দেখলাম, ওদের বাবা···মা··· কাকা···একটা বাচ্চা ছেলে—কেউ কারো থেকে আলাদা নয়, সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে—কি মজা, বরফ খাবো! (সমুদ্রের গর্জন। গর্জনের শেষে—কি মজা, বরফ খাবো।) শুনছো—শোনো, শোভনার দুঃখ তোমরা বোঝো না ··সে দুঃখ তোমাদের হলে তোমরা কুৎসিত চিৎকার করে উঠতে···হয়ত বা তোমাদের ঐ কুৎসিত রৌদ্রের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে···কিন্তু শোভনার মতো নিজেকে সুন্দরভাবে সরিয়ে নিতে পারতে না, জানো তোমরা? শোভনার দুঃখের কথা আমার ড্যাডি জেনেছিলেন, আমার মামি জেনেছিলেন, জ্ঞানেশ দত্ত জেনেছিলেন। অথচ তাঁদের ককটেল পার্টির কথাবার্তা এতটুকু কুৎসিত হয়ে ওঠেনি। এমন কি, শোভনা যখন তার নিজের মধ্যে ফিরে এসে নিজস্ব নীল অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল তখনও তাঁদের মুখে ছোটো ছোটো হাসি, মাপা মাপা কথাবার্তা—জানো তোমরা? বোঝো তোমরা? মামি আর শোভনার মধ্যে এক আশ্চর্য অসমতল উপবৃত্তের মতো সুন্দর এক পরিবার, অথচ কতো অদ্ভুত···এক দিকে ড্যাডি, আর এক দিকে জ্ঞানেশ দত্ত—এক দিকে মামি, আর একদিকে শোভনা, মাঝে মাঝে কাকা—আর একটু দূরে, কোনো এক কোণে বোধহয় আমি—নিজের পরিবারের জ্যামিতিক রূপ কল্পনা করতে পারো তোমরা? পারো না? আমি কিন্তু পারি, শোভনা পারতো, আমাদের পরিবারের সকলেই পারতেন, এমন কি জ্ঞানেশ দত্ত পর্যন্ত। তাই আমাদের নীল অন্ধকার অতো অস্পষ্ট—তাই আমদের স্বপ্ন দেখা অতো সুন্দর—সেদিনের শোভনার সেই গোপন দুঃখ···ড্যাডি, মামি, জ্ঞানেশ দত্ত—সেদিন বোধ হয় কাকাও এসেছিলেন—আর দূরে অন্ধকারের

মধ্যে বোধহয় আমি—(শেষের কথার কিছু কিছু অংশ চারপাশের অন্ধকার ধ'রে নেয়—চারিদিকে বার বার প্রতিধ্বনিত হয়—ড্যাডি—মামি—জ্ঞানেশ দত্ত—কাকা অন্ধকারের মধ্যে বোধহয় আমি— ।)

শেষাদ্রি আবার অন্ধকার হয়ে যায়—তবে এবারের অন্ধকার আবছায়া। শেষাদ্রির পাশের অন্ধকারের পর্দা আবার সরে যায়। ছোটো ড্রয়িংরুমে আলো পড়ে—সে আলোয় নীলের আভাস। ড্যাডি, মামি, কাকা, জ্ঞানেশ দত্ত—চারজনেই ব'সে। টেবিলের উপর ডিক্যাণ্টার। হাতে-ধরা পানপাত্র—পারিবারিক কক্‌টেল]

জ্ঞানেশ : কি রকম বুঝছো জগদীশ ?

ড্যাডি : এসব ব্যাপার খুব একটা বুঝি বলে মনে হয় না জ্ঞানেশ—

জ্ঞানেশ : আর শোভনার অবস্থা ?

মামি : অনেকটা আমার মতো, কক্‌টেলে বেশী করে অ্যাবসাঁথ্‌ মিশিয়ে নিচ্ছে—

জ্ঞানেশ : তাহলে তো খুব একটা কিছু হয়নি ! ছোকরাটিকে ডেকে পাঠিয়েছিলে ?

ড্যাডি : সেদিন এখানে এসেছিলো।

জ্ঞানেশ : কি বললে ?

ড্যাডি : বিয়ে করতে এখনি রাজী—কিন্তু আমাদের সমতলে নামবার মতো সময় নেই।

জ্ঞানেশ : নামবার মতো ?

ড্যাডি : তাই তো বললে।

জ্ঞানেশ : এতো ব্যস্ত কিসের ?

ড্যাডি : ঐ যে—মিছিল করার নতুন একটা হুজুগ উঠেছে—

জ্ঞানেশ : হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোটো-খাটো এক-আধটা মিছিল যাচ্ছে বটে ! এরা কারা ?

কাকা : পিগমিজ্‌ ! অনেকেই আমাদের মধ্যে ছিলো ! এঁরা নাকি সাম্যবাদ করবেন ! কিন্তু দাদা, তুমি কমোডিটি হিসেবে কিনে নিলে না কেন ?

ড্যাডি : বলেছিলাম। বললে—টাকা গোণার সময় নেই!

জ্ঞানেশ : মিছিল শুদ্ধ কিনে নিলেই পারতে। কতো বড়ই বা মিছিল! কত-ই বা পড়তো।

ড্যাডি : তাও বলেছিলাম।

জ্ঞানেশ : কি বললে?

ড্যাডি : এখনকার ছোটো মিছিল বিশ বছর পরে নাকি অনেক বড়ো। তাই তাকে নাকি টাকা দিয়ে কেনা যায় না।

কাকা : নন্‌সেন্স! বেশি বাড়াবাড়ি করলে ঠাণ্ডা করে দেওয়া হবে।

মামি : (খিল খিল করিয়া হাসিয়া) ঠাকুরপো, শেষে তুমিও। একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে—

কাকা : মানে?

জ্ঞানেশ : মানে—রাজনীতি তো তুমিও করো।

কাকা : হ্যাঁ, করি! কারণ আমাদের ওটা করার ট্র্যাডিশন আছে! আভিজাত্যে সরকারের সঙ্গে আমাদের সমান ফুটিং।

জ্ঞানেশ : আমি তো দেখি সব সমান।

কাকা : তুমি বললেই হবে! দলের ওপরের দিকে দেখো—সব কেম্‌ব্রিজ, অক্সফোর্ড। সম্পর্কের দিক থেকে দেখো—হয় বড়ো ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, আর না-হয় নীল রক্ত। এই দেখো না, তুমি আর দাদা—একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, আর একজন নীল রক্ত। আর আমাকে দেখো—খাস কেম্‌ব্রিজ।

জ্ঞানেশ : মানে বুর্জোয়া।

কাকা : না। মানে কালচার্ড! যাদেরই কালচার আছে তাদেরই ওরা বুর্জোয়া বলে! কিন্তু বলায় তো কিছু এসে যাচ্ছে না! আমাদের কালচার আছে—স্বাধীনতা যদি কেউ আনতে পারে তো আমরাই আনবো!

মামি : হ্যাঁ, স্বাধীনতা আর সংস্কৃতি—কথা দুটো একসঙ্গে শুনে থাকি বটে—

কাকা : তোমার কক্‌টেলে আব্‌স্যাঁথ্‌ বোধহয় কম হয়ে গেছে বৌদি,

—ঠিক বোধহয় নেশা হচ্ছে না।

মামি : না না, ওসব ঠিক আছে।—ঐ সুনীল বলছিলো না যে, জনসাধারণ—

কাকা : জনসাধারণ কি করবে শুনি? স্বাধীনতা আনবে? আর ধরো যদি আনেই—এনে চালাতে পারবে? সে অক্ষর-পরিচয় আছে ওদের? ব্যাবসা-বাণিজ্য করতে পারবে?

মামি : না, ব্যাবসাটা বোধহয় করতে পারবে না। আর তাছাড়া ওদের গায়ে কি রকম গন্ধ! আর, আর চারপাশের—মানে···(কথা খুঁজিতে লাগিলেন।)

জ্ঞানেশ : আর তাছাড়া চারপাশের এই নীল আলোটাও নেই।

মামি : ঠিক বলেছো।—চারপাশের এই নীল আলোটাও নেই—কিন্তু শোভনা···

জ্ঞানেশ : ওটা একটা নার্সিং হোমে ব্যবস্থা করতে হবে—

কাকা : একটু দূরের হলেই ভালো হয়!

জ্ঞানেশ : সে তো নিশ্চয়!

ড্যাডি : কিন্তু একটা কথা জ্ঞানেশ।—তুমি আমার বন্ধু। এমনি মণিকার সঙ্গে তোমার—মানে তার ওপর আবার শোভনা—

জ্ঞানেশ : বলতে ভুলে গেছি, রবি—তোমার টাকাটার যোগাড় হয়েছে—(হাত বাড়াইলেন। হাতে একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফট।)

ড্যাডি : (উঠিয়া ড্রাফটি লইয়া) কতো?

জ্ঞানেশ : পুরো এক লাখ তেরো হাজার।

ড্যাডি : আচ্ছা, আমি এখন উঠি—

জ্ঞানেশ : এতো তাড়াতাড়ি?

ড্যাডি : হ্যারিসনের ওখানে একটা পার্টি আছে—

জ্ঞানেশ : পার্টির কথাটা একবার ব'লো—

ড্যাডি : বলবো। (প্রস্থান পথের অন্ধকারের দিকে কিছুটা অগ্রসর হইয়া) হ্যাঁ রে যোগীন—তুই জেলে যাচ্ছিস কবে?

কাকা : কাল বেলা দশটায়।

মামি : কিন্তু কাল যে তোমার জন্মদিন, ঠাকুরপো···

জ্ঞানেশ : ওটা ওখানেই হবে। ব্যবস্থা হয়ে গেছে—

ড্যাডি : কিন্তু জেলে জন্মদিন···

জ্ঞানেশ : কাগজের হেডিংটার কথাও ভাবতে হবে—

ড্যাডি : ও—আচ্ছা। হ্যাঁ রে, হ্যারিসনকে একটু বলে দেবো ?

কাকা : আমি ফোনে একবার বলেছি—তা হোক—তুমিও একবার বলে রেখো।

ড্যাডি : আচ্ছা—(অন্ধকারের পথে প্রস্থান।)

কাকা : আমিও কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না জ্ঞানেশদা—

জ্ঞানেশ : কি বলো তো ?

কাকা : মানে—এমনি বৌদির সঙ্গে তোমার, তার ওপর শোভনা···

জ্ঞানেশ : সব কথা নাই বা বুঝলে যোগীন।

কাকা : বলছো ?

জ্ঞানেশ : হ্যাঁ বলছি। তার চেয়ে রাজনীতি যখন করছো—ভালো করে করো। আখেরে হয়ত কাজ দেবে—তোমারও—আমাদেরও।

কাকা : (উঠিয়া) কিন্তু তাতেও তো—।

জ্ঞানেশ : আরে তার জন্যে তো আমরা আছিই।

কাকা : কিন্তু শোভনার ব্যবস্থাটা ?

জ্ঞানেশ : সেটা আমি করব'খন।

কাকা : ও—তাহলে তো কথাই নেই। আচ্ছা—আমি তাহলে একটু উঠছি বৌদি—(মণিকা মৃদু হাসিয়া সম্মতি দিলে গ্লাসের মদটুকু শেষ করিয়া যোগীনের প্রস্থান।)

মণিকা : আমারও কিন্তু খটকা আছে—

জ্ঞানেশ : কোথায় বলো তো ?

মণিকা : আমি জানতাম যে, আমার সঙ্গে তোমার একটা সম্পর্ক আছে—

জ্ঞানেশ : হ্যাঁ, নীল অন্ধকারের সম্পর্ক।

মণিকা : কিন্তু তা সত্ত্বেও শোভনা—

জ্ঞানেশ : তোমার বয়স বোধহয় পঁয়তাল্লিশ হলো মণিকা ?

মণিকা : আমার চেহারা কিন্তু আমার বয়সকে অনেক কমিয়ে রাখে···

জ্ঞানেশ : আর আমার চেহারা নিরন্তর আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে আমার বয়স বাহান্ন।

মণিকা : সেই জন্যে আমি টয়লেট ব্যবহার করি—বয়সটা আমার পঁয়তাল্লিশের থেকে অনেক কম দেখায়। তুমিও শোভনা সম্পর্কে তোমার সংযমটাকে একটু ব্যবহার করলে পারতে!

জ্ঞানেশ : কিন্তু মাঝে মাঝে ঐ এক লাখ তেরো হাজার আমারও বয়সটাকেও কমিয়ে কম বয়সের একটা চেহারা এনে দেয়। শোভনা সম্পর্কে সেই চেহারাটা একটু উৎসুক হয়ে উঠেছিলো।

মণিকা : কিন্তু ওটা বার বার হলে তুমি আর আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো। এই বয়সে সেটা সহ্য করা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে!

জ্ঞানেশ : আমার বাহান্ন বয়সটা চুয়ান্ন-পঞ্চান্নর দিকে এগিয়েই যাচ্ছে। তাই শোভনারা মাঝে মাঝেই আসে। বাকী সময়টা তোমাকে কেন্দ্র করেই আমি!

মণিকা : কিন্তু শোভনাকে যদি তুমি···

জ্ঞানেশ : তা হয় না। মিসেস দত্ত আছেন—সবচেয়ে বড়ো কথা তুমি আছো!

মণিকা : (শূন্য পানপাত্র হেলাইয়া ধরিয়া) সত্যি ?

জ্ঞানেশ : (মণিকার পাত্র সোজা করিয়া মদ ঢালিতে ঢালিতে) সত্যি। তোমাকে কেন্দ্র করেই যে আমি।

মণিকা : (পানপাত্রে চুমুক দিয়া) তুমি আমায় বাঁচালে জ্ঞানেশ।

শেষাদ্রি : (চোখে মুখে অতীত-স্মরণের আভাস। অস্ফুট স্বরে) কিন্তু মামি, শোভনা—

মণিকা : (কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কে যেন কি বললে আমায়···কে রে ?

যোগীন : (আলোয় আসিয়া) বৌদি! শোভনা···

মণিকা : কি হয়েছে ঠাকুরপো ? শোভনার কি হয়েছে ?

রবি : (মণিকার হাতে একটি চিঠি দিয়া) শুনছো ··শোভনা···

মণিকা : কি হয়েছে ? শোভনার কি হয়েছে ? (চিঠি পড়িয়া কান্নায় যেন ভাঙিয়া পড়ে) শোভনা···শোভনা···

জ্ঞানেশ : চুপ—আস্তে ! যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন নো স্ক্যাণ্ডাল !

মণিকা : (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ঠিক বলেছো—নো স্ক্যাণ্ডাল ! সত্যি, তুমি কি বুদ্ধিমান, জ্ঞানেশ ! কিন্তু এখন ?

জ্ঞানেশ : এখন তুমি এখানে থাকো। আমরা গিয়ে শোভনাকে নামিয়ে নিই।

মণিকা : তাই নাও ! আর দেখো—শোভনার গলায় যেন লাগে না। (সকলে অন্ধকার প্রস্থানপথের দিকে অগ্রসর হয়।) তোমরা চলে যাচ্ছ—সত্যিই তোমরা চলে যাচ্ছ ? (সকলে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইয়া পড়িয়া আবার চলিতে আরম্ভ করে। মণিকা কম্পিত হস্তে পানপাত্র বাড়াইয়া দিয়া) আমার এটাতে একটু অ্যাবসাঁথ্ মিশিয়ে দেবে ? অ্যাবসাঁথ্! (জ্ঞানেশ এই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মণিকার গ্লাসে অল্প একটু মদ ঢালিয়া দেন। মণিকা যতক্ষণে পানপাত্র মুখে তুলিয়া ধরে, ততক্ষণে জ্ঞানেশ দত্ত পুনরায় অন্ধকার প্রস্থানপথের দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন।)

মণিকা : আমার এটাতে একটু অ্যাবসাঁথ্ মিশিয়ে দেবে ? অ্যাবসাঁথ্—

প্রতিধ্বনি : অ্যাবসাঁথ্—অ্যাব্‌সাঁথ······অ্যাবসাঁথ্— ! (কম্পিত পদে মণিকা অন্ধকার প্রস্থানপথের দিকে অগ্রসর হইয়া যায়) অ্যাবসাঁথ্ —অ্যাবসাঁথ্—অ্যাবসাঁথ্—(সমুদ্রের গর্জন ! গর্জনের শেষে— অ্যাবসাঁথ্—অ্যবসাঁথ্—অ্যাবসাঁথ্—)

প্রতিধ্বনি : অ্যাবসাঁথ্—অ্যাবসাঁথ্—অ্যাবসাঁথ্—(চারপাশে কেবল অন্ধকার। অন্ধকারে অস্পষ্ট শেষাদ্রি আবার ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।)

শেষাদ্রি : অ্যাবসাঁথ্—অ্যাবসাঁথ্—দেখলে আমার মামিকে ? অ্যাব-সাঁথ্-হাতে-করা আমার পঁয়তাল্লিশ বছরের মামিকে ? দেখলে যেন

তিরিশ বছর বলে মনে হয়—দেখলে আমার বোন শোভনাকে ? মৃত্যুর মতই সুন্দর ! অথচ আমি তোমাদের মাকে দেখেছি—বোনকে দেখেছি—জঞ্জালের মতো একঘেয়ে—জন্তুর মতো এক ··! শুনলে আমাদের কথাবার্তা ? ছোটো ছোটো, মাপা মাপা কথা। প্রত্যেকটি কথা যেন অলাদা কুয়াশা দিয়ে ঘেরা, প্রত্যেকটি কথার যেন পৃথক পৃথিবী, পারো তোমরা—ঐ নীল অন্ধকারের স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে ?—পারো তোমরা প্রত্যেকে ঐভাবে পৃথক হতে ?—পারো না···(চারিদিক থেকে—পারো না·· পারো না·· প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।)

[সমুদ্রের গর্জন। গর্জনের শেষে নানা জনের কথাবার্তা, নানা লোকের হাসি]

প্রথম জন : কি রে—হঠাৎ পা চালালি যে ?

দ্বিতীয় : তা কি করবো। আমারও ইউনিয়নের সময় ইউনিয়ন, তাসের সময় তাস—

তৃতীয় : দাঁড়া না, তাস তো আমাদেরও আছে—

দ্বিতীয় : ও ভাই তোমাদের থাকে থাক ! আমি একটু পা চালিয়ে গেলে দু'হাত এখনো খেলতে পারবো ··(মঞ্চের পিছন দিকে আলোর রেখা। সেই রেখা-পথ ধ'রে একজনকে হন হন করে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। পিছনে আরও দুইজন···তারা হেসে ওঠে।)

শেষাদ্রি : (হাসির শব্দে সচকিত হইয়া) কে···? কে···?

[সমুদ্রের গর্জন। গর্জনের শেষে মিছিলের কণ্ঠস্বর—]

মিছিল : ওরা ভাঙা মিছিলের লোকজন। মিছিলের পর নিজের নিজের বিচিত্র জীবনে ফিরে যাচ্ছে।

[পিছন দিকে প্রথম তিনজন ততক্ষণে এগিয়ে গেছে। এখন রেখাপথে আরও দুইজন]

চতুর্থ : চল্—'দিল তুমহারি' দেখে আসি—

পঞ্চম : না ভাই, আজ আমার সময় হবে না।

চতুর্থ : কেন ? রাজকাজটা কি শুনি ?

পঞ্চম : সকালবেলা ছেলেটার অসুখ দেখে বেরিয়েছি। বাড়িতে একটা অধলা নেই! কল্যাণকে বলা আছে—টাকা কুড়ি ধার নেবো—

চতুর্থ : কিন্তু এখন কি কল্যাণকে পাবি?

পঞ্চম : সাড়ে আটটা অবধি থাকবে বলেছে। (হন হন করিয়া এগোয় আবার কিন্তু ফিরিয়া আসে।) শোন্, কাল বোধহয় অফিসে যাবো না, স্ট্রাইক ব্যালটের খবরটা জানিয়ে যাস—(চতুর্থ মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায়। তারপর দুইজনেই এগিয়ে যায়। একজনের গতি দ্রুত, আর একজনের মন্থর।)

[রেখা-পথে অসীম ও মায়াকে দেখা যায়]

মায়া : এদিকে কোথার যাচ্ছ বলো তো?

অসীম : দ্বীপে—

মায়া : দ্বীপ? (হাসিয়া) কলকাতা শহরে দ্বীপ কই?

অসীম : আমাদের জন্যে নতুন একটা দ্বীপ তৈরি করেছি যে—

মায়া : (হাসিতে হাসিতে) কি রকম দ্বীপ?

অসীম : যেমন ভূগোলে পড়েছো—

মায়া : চারিদিক জলবেষ্টিত?

অসীম : না, চারিদিক রাস্তা-বেষ্টিত—সবুজ এক টুকরো ঘাস—আর ওপরে চাঁদের আলো—

মায়া : আহ্লাদ যে ধরে না দেখছি—

অসীম : সত্যিই আহ্লাদ আজ ধরছে না—

মায়া : কেন বলো তো?

অসীম : আজ মিছিলের পর যেন নিজের শক্তিতে ফিরে এলাম বলে মনে হচ্ছে!

মায়া : কোথায়—তোমার সে দ্বীপ কই?

অসীম : ঐ যে—

মায়া : দ্বীপে খাওয়াবে কি?

অসীম : চিনেবাদাম আর ভাঁড়ে চা—

মায়া : কিন্তু যদি ঠাণ্ডা লাগে?

অসীম : রোজ তো লাগে না, আজ না হয় একটু লাগলই—(বাঃ বেশ ! মায়া হেসে ওঠে—তারপর দুইজনে এগিয়ে যায়।)

[পিছনের রেখা-পথ অন্ধকারে মিলাইয়া যায়। আরম্ভের ঝাপসা আলো আবার এসে পড়ে শেষাদ্রির উপর সমুদ্রের গর্জন। গর্জনের শেষে মিছিল]

মিছিল : দেখলে—একের মধ্যে আমাদের স্বাতন্ত্র্য, একের মধ্যে আমাদের বিভিন্নতা ?

শেষাদ্রি : দেখেছি—দেখেছি, তবু তোমরা আমাদের মতো নও।—তোমাদের হয়ত বিভিন্নতা আছে, কিন্তু তোমরা আমাদের মতো বিচ্ছিন্ন নও—জানো তোমরা ? নীল অন্ধকারের কুয়াশা দিয়ে ঘেরা আমাদের আলাদা আলাদা পরিমণ্ডল—তাদের বিভিন্ন সমতল, বিচ্ছিন্ন মানস। তোমরা জানো—আমি বিবাহ করেছিলাম ?—জানো তোমরা ? আমার স্ত্রীর মনের গঠন আমার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ?

মিছিল : খুব জানি। তোমার স্ত্রী তো এখন আমাদেরই সঙ্গে।

শেষাদ্রি : ও, সে বুঝি তোমাদেরই সঙ্গে ! আর আমার মেয়ে— ?

মিছিল : সেও আমাদের সঙ্গে—

শেষাদ্রি : আশ্চর্য, খুকুকে কিন্তু আমি সত্যি ভালবাসতাম—

মিছিল : লতাকেও তুমি ভালবাসতে শেষাদ্রি।

শেষাদ্রি : ঠিক বলেছো, তাকেও আমি ভালবাসতাম, তার চারধারেও আমি নীল অন্ধকারের পরিমণ্ডল তৈরি করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি—পারিনি কেন জানো ?—আমি লতাকে ভালবাসলেও লতা আমাকে ভালবাসেনি···

মিছিল : ওটা তোমার ভুল ধারণা শেষাদ্রি। লতাও ভালবাসতো তোমাকে। কিন্তু সূর্যের মেয়ে লতা তোমার ওই নীল অন্ধকারের মধ্যে যেতে পারেনি।

শেষাদ্রি : কিন্তু এলে কতো ভালো হতো বলো তো ?

মিছিল : কোথায় ?

শেষাদ্রি : কেন ?—আমার ঐ নীল অন্ধকারের মধ্যে ! কিন্তু কি যেন তুমি বললে ? লতা আমাকে ভালবাসতো, কিন্তু আমার ঐ নীল অন্ধকারের মধ্যে আসতে পারেনি ? হ্যাঁ হ্যাঁ, বোধহয় ঠিকই বলেছো তুমি, সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।—সেই যে, সেদিন—যেদিন, যেদিন আমি আমার বারান্দায় ঠিক এই ভাবেই বসেছিলাম, ঠিক এই ভাবেই বসেছিলাম—পাশের ঘরে পিয়ানো বাজছে, আমার মার নীল অন্ধকারের অবশিষ্ট—খুকুর পিয়ানো লেস্‌ন্‌···মাঝে মাঝে শিক্ষকের তিরস্কার, পিয়ানোয় খুকুর মন নেই, আর আমিও দু'মাসের মাইনে দিতে পারিনি···ঠিক এইভাবে বসেছিলাম। ঠিক এইভাবে লতা যেন কাছে এসে দাঁড়ালো, আমার অন্ধকারে সীমানার ঠিক বাইরেই···

[শেষাদ্রি অন্ধকার হয়ে যায়। তারপর সে অন্ধকার বেশ একটু নীল হয়ে ওঠে। পাশ থেকে পিয়ানোর আওয়াজ, কি রকম যেন বেসুরো। শেষাদ্রির পিছনে সূর্যের সাদা আলো। আর শেষাদ্রির নীল অন্ধকারের কাছেই, সেই সূর্যের আলোর ধারে দাঁড়িয়ে লতা]

লতা : একটা কথা বলতে এলাম—

শেষাদ্রি : কি বলো তো ?

লতা : খুকুর ওপর অত্যাচার হচ্ছে—

শেষাদ্রি : কেন ?

লতা : খুকুর পিয়ানো শেখার ইচ্ছে নেই। তুমি জোর করে তাকে পিয়ানো শেখাবে !

শেষাদ্রি : কেন, ইচ্ছে নেই কেন ?

লতা : সকলের সব রকম ইচ্ছে থাকে না, তাছাড়া পিয়ানোটা ভাঙা। মাস্টার মশাই বলেন—তুমি ঘোড়া গাধা হলে তোমায় এটাতে পিয়ানো শেখাতে পারতাম।

শেষাদ্রি : মানে ? ওটা কোন্ বাড়ির পিয়ানো জানো ?

লতা : কিন্তু তুমি ওটাকে ভাঙা অবস্থায় বন্ধকী-বাড়ি থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলে। তারপর আরো ভেঙে গেছে—আর সারানো হয়নি !

শেষাদ্রি : কিন্তু মাস্টার ওকথা বলবে কেন ? ডাকো তাকে ? একটা বাজনার দোকানের মিস্ত্রী···

লতা : সেই মিস্ত্রীরই কিন্তু দু'মাসের মাইনে বাকী—

শেষাদ্রি : ঠিক আছে, কালই চেক কেটে দেবো—

লতা : চেক তুমি অনেককাল কাটা বন্ধ করেছো, শেষ টাকাটা তুলে ঐ ভাঙা পিয়ানোটা ছড়িয়ে এনেছিলে—(পিছন দিক থেকে শিক্ষকের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—কর্কশ কণ্ঠস্বর, আর পিয়ানোর বেসুরো আওয়াজ ।—কি হচ্ছে কি ! এতদিনেও আঙুল ফেলতে পরছো না কেন ? ঐভাবে বাজায় ! এই ভাবে—নাও নাও, বাজাও বাজাও । খুকু বাজায়—পিয়ানোর আওয়াজের সঙ্গে তার কান্নার শব্দ ।)

লতা : কাল থেকে খুকু আর পিয়ানো শিখবে না ।

শেষাদ্রি : কিন্তু আমাদের বাড়িতে পিয়ানো সকলকে শিখতে হয়···

লতা : তোমার বাড়ি আর নেই শেষাদ্রি । সেখান থেকে তুমি অনেক দূরে সরে এসেছো ।

শেষাদ্রি : খুকু আমাকে ড্যাডি বলে ডাকে না কেন ?

লতা : আমি বারণ করেছি—

শেষাদ্রি : কিন্তু আমাদের বাড়িতে বাবাকে আমরা সবাই বলতাম ড্যাডি—

লতা : ঐ তো বললাম—তোমাদের বাড়ি আর নেই শেষাদ্রি—

শেষাদ্রি : আমার বেশ মনে পড়ে—রাত্তিরে মাঝে মাঝে আমরা এক টেবিলে বসে খেতাম । আচ্ছা—এখন আর টেবিলে খাই না কেন ?

লতা : আমি আসার পর থেকে কোনদিনই তো টেবিলে খাইনি শেষাদ্রি ।

শেষাদ্রি : কেন বলো তো ?

লতা : ওপরে রেখে খাবার মতো টেবিল আমাদের ছিলো না বলেই বোধহয় । আর তাছাড়া তুমি তো আর এখন খাও না শেষাদ্রি । খালি তো দেখি মদ খাও ! আচ্ছা, মদ কেন খাও বলতে পারো ?

শেষাদ্রি : আমি তো মদ খাই না লতা ! ওটা যে আমদের পরিবারের

রেওয়াজ। আমি বাজায় রেখে চলেছি মাত্র—

লতা : খুকুকে আমি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি।

শেষাদ্রি : কিন্তু আমি তো ওকে যে সে স্কুলে পড়াবো না আমার ইচ্ছে আছে।

লতা : তোমার ও ইউরোপিয়ান গভর্নেস্ রাখার গল্প আমি অনেকদিন শুনেছি শেষাদ্রি—

শেষাদ্রি : কেন—আমি কি গভর্নেস্ রাখতে পারি না?—তোমার আমার দু'জনের আয় আছে—

লতা : তোমার আয়ের সমস্তটাই তো দামী মদের ওপর চলে যাচ্ছে, শেষাদ্রি—

শেষাদ্রি : কিন্তু ওটাও তো চাই লতা, আমার চারধারে নীল অন্ধকার সৃষ্টি করে না নিলে আমি যে শোভনাকে খুঁজে পাই না।—মামি, ড্যাডি, রবিকাকা, জ্ঞানেশ দত্ত কাউকে খুঁজে পাই না! নিজেকে আলাদা করে নিতে পারি না। তুমিও আমার সঙ্গে এসো না লতা, তোমাকেও আমার মতো আলাদা করে নিই···

লতা : কিন্তু আমি তো তোমার সঙ্গে যেতে পারি না শেষাদ্রি—

শেষাদ্রি : কেন লতা—কেন?

লতা : আমি সূর্যের আলোর মেয়ে·· তোমার ও নীল অন্ধকার আমার জন্যে নয়—

শেষাদ্রি : তুমি কি আমাকে আর ভালবাসো না লতা?

লতা : না।

শেষাদ্রি : আমি কিন্তু তোমাকে আজও ভালবাসি লতা। আজও··· কিন্তু লতা, তুমি কি কোনদিন আমাকে ভালবাসতে পারোনি?

লতা : আজও আমার প্রথম দিনের কথা মনে আছে শেষাদ্রি—পার্কের মধ্যে আমার পাশে তুমি···মনে হলো শিক্ষায় বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, কিন্তু কেমন যেন বিষণ্ণ···

শেষাদ্রি : সে বিষণ্ণ সন্ধ্যা আমার চিরকালের লতা।

লতা : আমার তা মনে হয়নি। প্রথমে ভেবেছিলাম আশপাশের মানুষের

জন্যে তুমি বিষণ্ণ। পরে দেখলাম—তা নও, তোমার কাছে পাশের কোনো মানুষ নেই, অতীতের কঙ্কাল তোমার পৃথিবীর বাসিন্দা··· তোমার ওই নীল অন্ধকার তোমার নিজের সৃষ্টি···তোমার ওই বিষণ্ণ সন্ধ্যা একান্তভাবে তোমারই নিজস্ব···(শেষের দিকে পিছনের সাদা সূর্যের আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে আসে। পিয়ানোর আওয়াজ অনেকক্ষণ বন্ধ। খুকুর কান্নাও শোনা যায় না। লতা যেন দূর থেকে আরো দূরে সরে যাচ্ছে।)

লতা : (ক্রমশঃ ম্লান হয়ে যেতে যেতে, ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে যেতে) তোমার ওই বিষণ্ণ সন্ধ্যা একান্তভাবে তোমারই নিজস্ব।—তাই আমি তোমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছি শেষাদ্রি, খুকুকে নিয়ে—আমি···তোমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছি শেষাদ্রি খুকুকে নিয়ে—

(শেষাদ্রির পিছন দিক ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে যায়।)

শেষাদ্রি : লতা, লতা···যেও না—শুনছো···শোনো, যেও না—আমি আমার নীল অন্ধকারকে···(অবসন্ন কণ্ঠস্বরে) না, পারবো না—ওখানে নামতে পারবো না।—তুমি খুকুকে নিয়ে চলেই যাও লতা, খুকুকে নিয়ে তুমি চলেই যাও···

[শেষাদ্রির উপর থেকে নীল অন্ধকার সরে যায়। আগের আলো আবার ফিরে আসে। ক্লান্ত অবসন্ন শেষাদ্রি]

শেষাদ্রি : না, পারলাম না। খুকুকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তুমি চলেই গেলে! আমি পারলাম না, তোমার ওখানে নামতে পারলাম না। —আজও পারবো না তোমার ওখানে নামতে।

মিছিল : ওখানে কিন্তু নামা নয়, ওঠা—

শেষাদ্রি : না, কখনো না—

মিছিল : তুমি আমাদের সঙ্গে এসো—তাহলেই দেখতে পাবে—

শেষাদ্রি : যাবো?—তোমাদের সঙ্গে? কিন্তু সুন্দর নীল অন্ধকার?

মিছিল : সে অন্ধকার নেই, অন্ধকারের সে রংও নেই।—ও তোমার মনের কল্পনা।

শেষাদ্রি : কি বলছো তুমি? আমার নীল অন্ধকার নিয়ত আমাকে

বাধা দিচ্ছে, নিয়ত আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তোমাদের মতো মলিনকে নিয়ত দূরে সরিয়ে রেখেছে···

মিছিল : একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

শেষাদ্রি : করো—

মিছিল : আমাকে দেখতে পাচ্ছ তুমি ?

শেষাদ্রি : না।

মিছিল : বুঝতে পারছো ?

শেষাদ্রি : তা বোধ হয় পারছি—

মিছিল : কি ক'রে পারছো বলতে পারো ?

শেষাদ্রি : মাঝে মাঝে নিজেকে একা বলে মনে হওয়ার মুহূর্ত অনুভব করছি···

মিছিল : আগে কিন্তু এটাও হতো না।

শেষাদ্রি : (উত্তেজিত অবস্থায় উঠিয়া) মানে ?—মানে ? (উত্তেজিত শেষাদ্রি। সমুদ্রের গর্জন। সেই গর্জনের সঙ্গে তাল রেখে মিছিলের কণ্ঠস্বরও ক্রমশ প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হয়ে উঠতে থাকে।)

মিছিল : তোমার ঘন নীল ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে—

শেষাদ্রি : (সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে) না না,—কিন্তু আমি যেন তোমাকে দেখতে পাচ্ছি—আবছা অস্পষ্ট (পিছনে মিছিলের অস্পষ্ট আকার। শেষাদ্রিকে ঘিরে যত এগিয়ে আসে, ততই যেন স্পষ্ট হয়।)

মিছিল : তাহলেই দেখতে পাচ্ছ—তোমার নীল ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে।—এরপর ?

শেষাদ্রি : এরপর ?—এরপর ?

মিছিল : সূর্যের আলোয় একেবারে মিলিয়ে যাবে। (সমুদ্রের গর্জন প্রচণ্ডতর হয়।)

শেষাদ্রি : তারপর ? তারপর ?

প্রচণ্ড মিছিল : তারপর আমরা সূর্যের মতো সমুদ্র হয়ে তোমার নীল অন্ধকারকে গ্রাস করবো।

শেষাদ্রি : তাতে কি হবে ? তাতে কি আমি ওই বাচ্চা ছেলেটার মতো

হতে পারবো ? তাতে কি আমি ওর মতো 'কি মজা, বরফ খাবো' বলতে পারবো ?

মিছিল : কেন পারবে না ? নিশ্চয় পারবে।

শেষাদ্রি : কিন্তু শোভনার মতো ঐ মেয়েটি ?—তার দুঃখ ? শোভনার দুঃখ ? জ্ঞানেশ দত্তকে কেন্দ্র করে মা আর শোভনা ?—তাদের বিভিন্ন সমতল ?—তাদের বিচ্ছিন্ন বেদনা ?

মিছিল : আমাদের দুঃখের সমতলে এক হয়ে যাবে।

শেষাদ্রি : কিন্তু লতা, খুকু—?

লতা : আমরা তো মিছিলেই আছি, শেষাদ্রি। তুমিও এসো—তুমি, আমি, খুকু আবার এক হয়ে যাই।

শেষাদ্রি : কিন্তু লতা, আমার দ্বীপ ? তোমার, আমার, খুকুর রাস্তাঘেরা দ্বীপ। সে দ্বীপ তো নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তুমি যখন ছিলে না তখন আমি একটা আহ্লাদ বিক্রী-করা মেয়ের কাছে যেতাম। আজও যে আমি সে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি লতা—মাংসের দোকান—লোহার শিকে ঝোলানো খণ্ড খণ্ড মাংস—হাওয়ায় দুলছে, শুকোচ্ছে।—এমন সময় আমি আসি···ফোঁটা ফোঁটা ঘাম··· খোঁচা খোঁচা দাড়ি···দু'ধারে তোলা উনুন···দু'চোখে স্বপ্নের আমেজ ···সামনে তোলা উনুনের ধেঁায়া···রাস্তার দু'ধারে লোক···সে সব অন্যলোক, তাদের অন্য কথা। আর মাংসের দোকানে শিকে ঝোলানো খণ্ড খণ্ড মাংস···আমি কিন্তু ঐ রাশি রাশি ধেঁায়াকে সঙ্গে নিয়ে নীচু পথ দিয়ে নেমেই গেলাম—রুক্ষ চুল, পাজামার তলায় ছেঁড়া···কি রকম যেন নিজেকে টানতে টানতে···

মিছিল : আমরা জানি শেষাদ্রি, ওটা যে তোমার ওই নীল অন্ধকারের স্বপ্ন—

শেষাদ্রি : কিন্তু স্বপ্নের শেষে যে সেই আহ্লাদ-বিক্রী-করা মেয়ে···

লতা : সে মেয়েও কিন্তু আজ আমাদের মিছিলে সামিল, শেষাদ্রি।

শেষাদ্রি : কিন্তু স্বপ্নটা ?—সেটা তো মিছিলে সামিল নয় ? সেটা যদি আবার আমাকে আক্রমণ করে ?

মিছিল : আমাদের সূর্যের আলোয় যখন তোমার ঘুম ভাঙবে, তখন ওই রাতের দুঃস্বপ্নের চিহ্নমাত্রও থাকবে না !

শেষাদ্রি : সত্যি ?—ওই স্বপ্নের চিহ্নমাত্রও থাকবে না ?

মিছিল : না—থাকবে না।

শেষাদ্রি : আমি কি তাহলে আবার আমাদের দ্বীপকে খুঁজে পাবো ?

লতা : মিছিল থেকে ফেরার পথে প্রতিদিন আমরা তাকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করবো শেষাদ্রি।

শেষাদ্রি : তবে নাও, আমাকে তোমরা তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ করে মিলিয়ে নাও, সম্পূর্ণ ক'রে মিলিয়ে নাও···(সমুদ্রের গর্জন আরও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। শেষাদ্রিকে ঘিরে অর্ধবৃত্তাকারে মিছিল এগিয়ে আসে।)

মিছিল : কম্‌রেড্‌স, এসো—আজ আমরা শেষাদ্রিকে মিছিলে সামিল ক'রে নিই, আমাদের সূর্যের মতো সমুদ্র তাকে আলোকিত করুক ! ইন কিলাব—

প্রচণ্ড মিছিল : জিন্দাবাদ !

[শেষাদ্রি কিছু বলিতে পারে না। আবেগে তার সর্বাঙ্গ কম্পিত হয়। আজ তাকে ঘিরে লতা, খুকু, সেই আহ্লাদ-বিক্রী-করা মেয়েটা। আজ তাকে ঘিরে মিছিল। আবেগে কণ্ঠরোধ হয়ে আসে তার। সে কিছু বলিতে পারে না। শুধু যথাশক্তিতে মিছিলের সঙ্গে হাতটা তোলে। পর্দা নেমে আসে]

সামান্য সেই লোকটি

॥ চরিত্র-লিপি ॥

সামান্য সেই লোকটি। শ্রীবিলাস রয়
শ্রীমতী রয়। অনুপম ভোস। কর্নেল বিক্রম সেন
কিশোর শর্মা। একটি মেয়ে ও তার শিশু সন্তান
ওয়েটার। স্টেশনের একজন পদস্থ কর্মচারী
পুলিস ও একজন কুলি

[একটি স্টেশন। স্টেশনটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারীদের নিকট বিখ্যাত। পর্দা উঠিলে মঞ্চের সম্মুখভাগে প্ল্যাট্‌ফর্ম। এক কোণে বিলাসবহুল রেস্তোরাঁ। পিছন দিকে আর এক কোণ ঘেঁসিয়া একটি উঁচু বেদী। বেদীর উপর বসিবার আসন। উপর হইতে দণ্ডায়মান যাত্রীদের জন্য হাতল ঝুলিতেছে, আসলে এটি প্রয়োজন মতো ট্রেনের কামরায় রূপান্তরিত হইবে। রেস্তোরাঁর মধ্যে কয়েকজন বসিয়া আছেন। একজন ওয়েটার আদেশমত খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ইত্যাদি লইয়া আসিতেছে। একটু দূরে এক ধারে একটি মেয়ে বসিয়া আছে। দেখিলেই মনে হয় অতি দীন অবস্থা। সামনে দুইটি পুঁটলি। একটির উপর পুরাতন গরম কপড়ে জড়ানো একটি বাচ্চা শোয়ানো। পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে আছেন শ্রী ও শ্রীমতী বিলাস রয়। স্বামী-স্ত্রী, ইংলণ্ডেই থাকিতেন, সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। অনুপম ভোস, ইঁনিও আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিয়াছেন, সঙ্গে ফিল্ডগ্লাস্‌ ও ক্যামেরা। কর্নেল্‌ বিক্রম সেন, গতযুদ্ধের পর সৈন্যবাহিনী হইতে অবসরপ্রাপ্ত, ইনিও প্রায় বছর-পাঁচেক পশ্চিম জার্মানিতে ছিলেন। কিশোর শর্মা, তরুণ, হাসিখুশি, ভারতীয় নৌবাহিনীতে আছেন, বর্তমানে ছুটিতে। দীন অবস্থার ঐ মেয়েটি ও তার শিশু সন্তান, ওয়েটার, স্টেশনের একজন পদস্থ কর্মচারী, নাম মিস্টার ব্যানার্জী, পুলিস, কুলী ও দীনবন্ধু মাহাতো, সামান্য সাধারণ এক ব্যক্তি অর্থাৎ সামান্য সেই লোকটি]

ওয়েটার : (রয় দম্পতির টেবিলে আসিয়া) দুটো কফি ?

বিলাস : ঠিক আছে। (ঘড়ি দেখিয়া) কতো ?

ওয়েটার : তিন টাকা।

বিলাস : (ঘড়ি দেখিতে দেখিতে দাম মিটাইয়া দিলেন) চিনি ?

শ্রীমতী রয় : এক।

অনুপম : আমার খুব ভালো লাগে যদি তুমি আমার টেবিলে দু'টি ডিম

পেড়ে যাও। আমি অনেকক্ষণ বসে আছি।

ওয়েটার : পেড়ে গেলুম বলে সার—

অনুপম : কি বললে?

ওয়েটার : আমার কোনো দোষ নেই সার। আমাদের ট্রেনিং-এ বলা হয়েছে, পারলে খরিদ্দারের ভাষায়, খরিদ্দারের ভাবে, খরিদ্দারের ভঙ্গীতে কথা বলবে।

বিক্রম : কেল্‌নার্ বেটসালেন্, বিল্ লে আও—(কণ্ঠস্বর বাঘের গর্জনের মতো, মোম দিয়ে পাকানো মোছের মতই কঠিন। এককালে সৈন্যবাহিনীতে কর্নেল ছিলেন, সে আভাস চেহারায়, পরিচ্ছদে আছে। মাথার চুল কাঁচায় পাকায়।)—এমনই অভ্যাস হয়ে গেছে—মাঝে মাঝে মুখ ফস্কে জার্মানটা বেরিয়ে যায়! (অনুপম তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুতের ন্যায় অনুপমকেই কথাটা বলিলেন।)—বছর পাঁচেক ছিলাম কিনা—পুবে নয়, পশ্চিমে! (সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটারকে) কেল্‌নার্—

ওয়েটার : কম্ গ্লাইস্—আভি লাতা হুঁ সাব!

বিক্রম : একি! তুমিও—?

ওয়েটার : ওখান থেকেই ওয়েটারশিপ পাশ করে এসেছি সার।

অনুপম : ডিম! আমার ডিম! এক্ষুনি—নড়তে পারো না? টুইস্ট করো, নেচে যাও নেচে এসো, জোর কদমে, এক্ষুনি, আমার ডিম!

ওয়েটার : জোর কদমে সার—এই এলুম বলে। (প্রায় নাচিতে নাচিতে এ-চেয়ার-ও-চেয়ারের পাশ দিয়া দ্রুত বাহির হইয়া যায়।)
[একটু দূরে কোণে রাখা একটি টেবিলে দীনবন্ধু মাহাতো, সামান্য সেই লোকটি। একবার উঠিলেন। দ্রুত নিষ্ক্রান্ত ওয়েটারের দিকে দেখিতে দেখিতে কাছাকাছি আর একটি টেবিলে বসিলেন]

বিলাস : (ঘড়ি দেখিয়া) আর দশ মিনিট।

শ্রীমতী : বিরক্তিকর!

অনুপম : (তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া) মনে হয় এদের ডিম সম্পর্কে কোনো কুসংস্কার আছে। (বিলাস অনুপমের দিকে মুহূর্তের জন্য

চোখ তুলিয়া নামাইয়া লইলেন। কথা বলিলেন না।)

বিক্রম : নামেই টুরিস্টদের স্বাচ্ছন্দ্য। এখানে বোধহয় কেউ কিছুই পায়-টায় না। কর্নেল হয়ে অবসর নিয়েছি, আমার আবার এসব শৈথিল্য বরদাস্ত হয় না।

(ওয়েটার প্রায় উড়িতে উড়িতে আসিয়া কিশোর শর্মার টেবিলে পুডিং রাখে। কিশোর দাম দেন।)

বিক্রম : কেল্‌নার্ বেট্‌সালেন্—বিল।

ওয়েটার : আইনে ক্রোনে জেস্ত্‌সিস্—ছ'টাকা আশি সাব !

(বিক্রম দাম মিটাইয়া দেন।)

অনুপম (ওয়েটারকে) শোনো—(ঘড়ি দেখিতে দেখিতে) আর বিশ সেকেণ্ডের মধ্যে যদি ডিম না পাই তবে তোমায় স্বর্গে গিয়ে জোড়া ডিম পাড়তে হবে।

ওয়েটার : (প্রায় উড়িয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে) এক্ষুনি পেড়ে দিচ্ছি সার !

অনুপম (সকলের নিকট সহানুভূতি পাইবার চেষ্টায়) হুটো ডিমে প্রায় পাগলা করে দিলে !

(বিলাস খবরের কাগজটি খুলিয়া বিজ্ঞাপনের পাতা স্ত্রীর হাতে ধরাইয়া দেন। শিশুটি কাঁদে। মা তাকে দোল দেয়। কিশোর শর্মা খাওয়া বন্ধ করিয়া অকারণে হাসেন। বিক্রম সেন সিগারেট ধরান। দীনবন্ধু মাহাতো, সামান্য সেই লোকটি চুপচাপ বসিয়া রুমালটি আঙুলে জড়ান আর খোলেন। ওয়েটার ডিম লইয়া প্রায় উড়িয়া আসে ও অনুপমের সামনে রাখে।)

অনুপম : (ডিম খাইতে খাইতে) বছর ছয়েক মিনেসোটাতে ছিলাম। ওদের কিন্তু ডিম সম্পর্কে কোনো কুসংস্কার নেই। বললেই পেড়ে দিয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে—একটা বললে একটা, হুটো বললে হুটো।

দীনবন্ধু : (ভদ্র ও নম্র স্বরে) ওয়েটার-সাহেব—দয়া করে যদি এক গ্লাস ঠাণ্ডা এনে দেন।

ওয়েটার : আজ্ঞে—নিশ্চয়। (প্রস্থান।)

অনুপম : (দীনবন্ধুকে) মাফ করবেন, কি বাবু যেন ?

দীনবন্ধু : আজ্ঞে, দীনবন্ধু—বাবু নই, মাহাতো।

অনুপম : মাফ করবেন দীনবন্ধুবাবু। আমার বেশ মনের মতো হয়—মানে পছন্দ হয় আর কি—যদি আপনি আমাকে বলেন—আপনি ঐ ছোকরাটাকে ওয়েটার-সাহেব বললেন কেন ? মিনেসোটায় যেমন হয় আর কি—ও যদি হেড-ওয়েটার হতো—আপনি ওকে ওয়েটার-সাহেব বলতেন—কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ছিলো না! কিন্তু এদেশে ওসব ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা কোথায় ? এখানে হেড্-ফেডের কেউ ধার ধারে না! এখানে সবাই ওয়েটার। কোথায় কাকে সাহেব বলতে হয়—আপনি ঠিক জানেন তো ?

দীনবন্ধু : (নম্রস্বরে) মনে তো হয়—জানি।

অনুপম : আমার হাসি পাচ্ছে। আপনার অনুমতি নিয়ে আমি মৃদু মৃদু হাসছি।

দীনবন্ধু : আমার কি ওঁকে ওয়েটার-সাহেব বলা উচিত হয়নি ?

বিক্রম : (সংক্ষেপে) নাইন্—উচিত হয়নি। কেল্নার বলবেন—মানে ওয়েটার।

অনুপম : হ্যাঁ, ঠিকই তো—ওয়েটার বলবেন—শুধু ওয়েটার। হতো মিনেসোটা, হেড্-ওয়েটার থাকতো—ওয়েটার-সাহেব বলতেন—বুঝতাম। এখানে বললেই আমার মৃদু মৃদু হাসি পায়।

(কিশোর শর্মা খাওয়া থামাইয়া হাসিয়া উঠেন। দীনবন্ধু রুমাল লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে এ-মুখ হইতে ও-মুখ তাকাইতে থাকেন।)

দীনবন্ধু : না, মানে—শুধু ওয়েটার বলে ডাকলে উনি যদি কিছু মনে করেন। আর ওয়েটারবাবু তো বলা যায় না—কি রকম বেখাপ্পা শোনায়, তাই ওয়েটার-সাহেব। মানে—মনে যদি আঘাত পান—

অনুপম : আমাদের স্টেট্সে, না মানে—ওদের মিনেসোটায় এসব ব্যাপারে ওরা কিন্তু খুব জনগণমুখী, একেবারে গণতন্ত্র—কিন্তু এখানে ব্যাপারটা বেশ ভাববার মতো।

বিলাস : (স্ত্রীকে) আর কফি দেবো ?

শ্রীমতী রয় : না, ধন্যবাদ।

বিলাস : প্রতিমাকে মনে পড়ে তোমার, সেই যে—লণ্ডনের কাভায়ে প্লেসে !

শ্রীমতী রয় : না পড়ার কি আছে।

বিলাস : বেশ একটু মজার—কেমন যেন পতিব্রতা গোছের ?

শ্রীমতী রয় : ওটা তো শো—মানে, ভারতীয় ন্যাকামি।

বিক্রম : (হঠাৎ) এই সব ছোকরা, এদের সঙ্গে যদি এইমত আচরণ করেন—এরা কিন্তু প্রশ্রয় পাবে—মানে, স্বাধীনতা নেবে। আপনি কি যেন আনতে বললেন ?

দীনবন্ধু : আজ্ঞে, ঠাণ্ডা—

বিক্রম : দেখে নিন—আপনি কিন্তু পাচ্ছেন না। (ওয়েটার দীনবন্ধুর পানীয় লইয়া আসিয়া দীনবন্ধুর টেবিলে নামাইয়া দেয়।)

অনুপম : মনে হচ্ছে গণতন্ত্রের সপক্ষে এক পয়েন্ট্ হলো। (দীনবন্ধুকে) বিচারে মনে হয়, আপনি কোনো ভ্রাতৃসংঘে কিংবা মাতৃসংঘে আছেন ?

দীনবন্ধু : মানে···?

অনুপম : মানে, ঐ যাকে বলে—সবাই আমরা বাপের ছেলে কিংবা একই মায়ের সন্তান ?

দীনবন্ধু : (হতভম্বের ন্যায়) কই—না তো !

অনুপম : আমি আবার জানেন—লিও টস্স্টয়, মহাত্মা গান্ধী—এসব থেকে মনের সঞ্চয়টা খুব পাই ! সবরমতী, টল্স্টয়মতী, সব মহৎ-প্রাণের বিরাট বিরাট যন্ত্র এক-একখানা ! কিন্তু আমার মনে হয়—এদেশে, মানে মিনেসোটায় নয়—এদেশে এই সব ওয়েটারদের এক-আধটা চড় চিমটি দেওয়া ভালো, তাতে যন্ত্রটা অন্তত জোরে চলবে। (এই মুহূর্তে বিলাস রয় অবহেলার দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকালেই শ্রী ও শ্রীমতী রয়কে লক্ষ্য করিয়া) আপনারা তো দেখলেন, আমার ডিমের ব্যাপারটা কি করলে ! (রয়দম্পতির

মাথা নড়িল কি নড়িল না—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা দৃষ্টি সরাইয়া লইলেন। ওয়েটারকে) ওয়েটার—

ওয়েটার : (প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া) কম্' গ্লাইস্—থুড়ি, যাবো আর আসবো সার—

অনুপম : ঠাণ্ডা একটা—জলদি—

ওয়েটার : হুজুর !

বিক্রম : সিগারেন্—সিগার—হাভানা—

ওয়েটার : (লাফাইয়া উঠিয়া) শন্—এসে গেছে সার ! (মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য।)

অনুপম : (দীনবন্ধুকে, অমায়িক কণ্ঠস্বরে) এখন যদি আমার ঠাণ্ডাটা আপনার ঠাণ্ডার চেয়ে কম সময়ের মধ্যে না পাই, তাহলে আপনার প্রশংসা করতেই হয়।

দীনবন্ধু : (এমুখ-ওমুখ দেখিতে দেখিতে, আঙুলে রুমাল জড়াইতে জড়াইতে, খুলিতে খুলিতে) আমি···মানে···

বিক্রম : টল্স্টয়—গান্ধী—লিস্টস্—কিচ্ছু নয়—কোনো কর্মের নয়—

অনুপম : (তর্কের মুখ ধরিয়া) উঁহু—এক কথায় 'না' করতে পারেন না। ওটা যার যেমন স্বভাবে যে যেমন বোঝে। এই দেখুন না, —মিনেসোটা থেকে ফিরে আসার পর থেকেই আমি সাম্যের সপক্ষে—সবাই সমান ! ঐ যে দীনহীনা মেয়েটি দূরে এক কোণে বাচ্চা নিয়ে বসে আছে—ওকে নিশ্চয় আপনার সমান বলে মনে হচ্ছে না ? আমার কিন্তু হচ্ছে। ও এখানে না থাকলেই বোধহয় আপনার আর একটু ভালো লাগতো ?

বিক্রম : টল্স্টয় ! জেন্টিমেন্টাল্ উন্জিন্—ভাবপ্রবণ আবোল তাবোল ! দার্শনিক বললেই নিট্শে, একমাত্র দার্শনিক—সত্যিকারের লোক একটা—ঐ যে যন্ত্র বলছিলেন না ?—একমাত্র যন্ত্র।

অনুপম : হুঁ, তা ঠিক ! বিচার্য-বিষয়ের অনুষ্ঠানপত্রের মধ্যে নামটা রাখা যেতে পারে, উত্তেজনা আনে—ঝাঁজালো পুরোনো মদের মতো এখনও বেশ খোঁচায় ! খোঁচড় একখানি। বয়সে বুড়ো নিট্শ্, খুড়ো

—আচষা জমি, কুমারী মন—লাঙল চষলেই হয়। আমার কিন্তু নিট্‌শ্‌ নয়, হয় মহাত্মা মোহনদাস, নয় পরমাত্মা লিও! (কিশোর শর্মাকে) আপনি কি বলেন সার ? নৌবাহিনীতে তো দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ান। লোকে টল্‌স্টয় পড়ে কেমন ? (তরুণ কিশোর শর্মা সশব্দে হাসেন।) বাঃ! বেশ আলো-করা উত্তর তো—একেবারে বারো ব্যাটারির টর্চের মতো।

বিক্রম : টল্‌স্টয় কিচ্ছু নয়। মানুষের উচিত—নিজেকে আউস্‌ড্রিকেন্‌ করা, মানে নিজেকে প্রকাশ করা—গায়ের জোরে নিজেকে ঠেলে সামনে আনা—তাকে বলবান হতেই হবে—একেবারে বিফেলের মতো, মানে মোষের মতো।

অনুপম : ঠিক তাই। মিনেসোটাতে দেখেছি ওরা পৌরুষে বিশ্বাস করে। ওরা চায়—ফুল ফুটুক না ফুটুক, ওরা যেন ফুটে ওঠে—বেড়ে ওঠে—বিস্তৃত হয়—নিজেকে বাড়ায়। তবে ঐ—সবই ভাই ভাই হয়ে। তবে ঐ একটা দাগ টানা আছে। নিগারদের বাদ দেওয়া হয়।

বিক্রম : তাহলে তো আপনাকেও বাদ দেওয়া হতো। আপনি তো ভারতীয়।

অনুপম : না না, আমি তো আর নিগার নই। আমাকেও ভাইয়ের মতই দেখতো। তবে আপন ভাই নয়, বয়ঃকনিষ্ঠ মাসতুতো ভাই আর কি!

বিক্রম : ডয়েট্‌স্‌লান্টে, মানে জার্মানীতে দেখেছি—ওরা ওসব ভাই-ফাইয়ের ধার ধারে না! ওখানে দু'টি ভাগ—হয় আর্য নয় অনার্য!

অনুপম : ওই! তাহলেই তো এসে গেল—উঁচু-নীচু ভেদাভেদ! মিনেসোটায় দেখেছি—নিগার বাদ দিলে, আর তুতো ভাইয়ের তফাতটুকু বাদ দিলে—সাম্যের দিকে একটা আরোহী ঝোঁক আছে। বাকী সবের মধ্যে সামাজিক কোনো বাধানিষেধ নেই, কোনো প্রভেদ-পার্থক্যও নেই।

বিলাস : (স্ত্রীকে) একটু যেন হাওয়া দিয়েছে না ?—মনে হচ্ছে না

তোমার ?

শ্রীমতী রয় : মনে হচ্ছে যেন—একটু।

বিক্রম : দাঁড়ান দাঁড়ান। স্টেট্‌স্‌ অর্থাৎ আমেরিকার তো এখনো সভ্যতার কৈশোর—কিংবা সবে যৌবন আসছে বলতে পারেন !

অনুপম : ঠিক কথা। সেই জন্যেই তো এখনো পচা গন্ধ ছাড়ে না—মাছিও বসেনি ! (দীনবন্ধুকে) মানুষের কর্তব্য সম্পর্কে আপনার মতামতটা যদি জানান—তো আমার খুব পছন্দ হয়। (দীনবন্ধু অল্প একটু নড়াচড়া করেন, অল্প একটু হাঁ করেন—বোধহয় কথা বলার জন্য।) এই ধরুন—আপনার কি মত ? অশক্ত-পীড়িতদের মেরে ফেলাই উচিত, যারা লম্ফ-ঝম্প করতে পারে না তারা যেন নিপাত যায় ?

বিক্রম : ইয়া, ইয়া ! ঠিক, ঠিক ! ঐ দিনই তো আসছে।

অনুপম : (দীনবন্ধুকে) বলুন না, তাহলে আমার খুব পছন্দ হয়।

দীনবন্ধু : (এমুখ ওমুখ দেখিতে দেখিতে) অশক্ত, পীড়িত, লম্ফ-ঝম্প করতে পারে না সেরকম—মানে—আমিও তো হতে পারি। (কিশোর শর্মা সশব্দে হাসিয়া উঠেন।)

অনুপম : (কিশোরের দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, দীনবন্ধুকে) এই না হলে বিনয়। সভ্যতার ব্যাকরণ প'ড়ে এ জিনিস আসে না। এখন একটি প্রস্তাব রেখে বিবাদের বিষয়ের কাছাকাছি চলে আসি। ধরুন—আপনি জানেন সাহায্য করলেই আপনার বিপদ। তবুও আপনি কি আপনার নিজের সোজা পথ ছেড়ে, ঘুর-পথে ঘুরে গিয়েও এই সব দুর্বল সাধারণকে সাহায্য করবেন ? বলুন না—শুনতে আমার বড়ো পছন্দ হয়।

বিক্রম : নাইন্‌ নাইন্‌, না না—ডাস্‌ ইস্ট্‌ নেরিশ্‌—একেবারে বোকার কাজ।

দীনবন্ধু : (একটু যেন উৎসুক, কেমন যেন একটু চিন্তাশীলের ন্যায়) আমার কিন্তু তা মনে হয় না। নিশ্চয় লোকে ভালো করতে, মানে—দেখুন না—পরমহংসেরা, কবীরেরা, নানকেরা—তারপর সব

ভালো ভালো লোকেরা, মানে—সব তো এদেশেই—তারপর আবার—

অনুপম : মহৎ সব প্রাণের মহান সব ঝোঁক ! আর আমার যতদূর আন্দাজ—ওঁদের মৃত্যুর কারণও ঐ ঝোঁক। ভালো করার ঝোঁক বেশ বিপজ্জনক—কি বলেন ? যাকগে, (উঠিয়া) হাতে হাত মেলান সার্। আমার নাম অনুপম ভোস—(কার্ড দিয়া) মিনেসোটা থেকে বরফকল তৈরি করা শিখে এসেছি। (হাতে হাত মিলাইয়া) আপনার মনের এই যে সব উচ্চ উচ্চ ভাব—আমার কিন্তু খুব পছন্দ হয়। (দরজার নিকট ওয়েটার্‌কে দেখিয়া) ওয়েটার্—(দীনবন্ধুর দিকে চোখ পড়িতে কোমল স্বরে প্রায় গানের সুরে) ওয়েটার্—ঠাণ্ডা আমার কোন্ নরকে রেখে এলে বন্ধু ?

ওয়েটার্ : কম্’ গ্লাইস্—নিয়ে এলুম সার্। (দ্রুত প্রস্থান।)

বিলাস : (ঘড়ি দেখিয়া) গাড়ী দেরীতে আসছে।

শ্রীমতী রয় : সত্যি ! অর্থহীন ! এদেশের গাড়ি তো !

বিলাস : সেবার লণ্ডনে গাড়ির জন্য কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিলো।

শ্রীমতী : ও সে ঐ একবারই।

বিলাস : তা যা বলেছো। (প্রায় চার চৌকো চেহারার একজন রেল পুলিস সকলের দিকে দেখিতে দেখিতে একবার ঘুরিয়া যায়।)

অনুপম : (বসিয়া, বিক্রমকে) মিনেসোটাতে যদিও অতটা নেই, তবুও —আমরা, মানে ওরা আর কি—মানুষকে বিশ্বাস করে—বিশ্বাস করে মানুষের স্বভাবকে।

বিক্রম : আ হা ! আনালিজিরেন্—বিশ্লেষণ করুন দেখবেন নিজে ছাড়া কিছু নেই !

দীনবন্ধু : (কেমন যেন চিন্তাশীলের ন্যায়) আপনি কি মানুষের স্বভাবে বিশ্বাস করেন না ?

অনুপম : বেশ উত্তেজক প্রশ্ন। (মতামতের জন্য চারিদিকে তাকান।

কিশোর শর্মা সশব্দে হাসিয়া উঠেন।)

বিলাস: (নিজের কাগজটা স্ত্রীর দিকে বাড়াইয়া দিয়া) বদলাও।

(শ্রীমতী নিজের কাগজ স্বামীকে দিয়া কাগজ বদলান।)

বিক্রম: মানুষের স্বভাব—যতটা চোখে দেখা যায় ততটাই বিশ্বাস করি, তার বেশী নয়।

অনুপম: এ কথাটা কিন্তু আমার কাছে কি রকম অধার্মিক—শয়তান-শয়তান ঠেকছে। আমি—ঐ যে কি বলে?—ধীরোদাও বীরোচিত-ভাবে বিশ্বাস করি। আমার তো মনে হয় না—এখানে এমন একজনও নেই, যার মধ্যে না বীরোচিত ভাব আছে—সুযোগের অপেক্ষায় শুধু।

দীনবন্ধু: (ব্যগ্রভাবে) আপনি তাহলে বিশ্বাস করেন?

অনুপম: আমার মতে বীর সেই, যে নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও অপরকে সাহায্য করে। ধরুন না—ঐ মেয়েটি? উনিও একজন বীরাঙ্গনা, অন্তত আমার যতদূর আন্দাজ। যে কোনো দৈনন্দিন মুহূর্তে উনি ওঁর সন্তানের জন্য স্বচ্ছন্দে মরতে পারেন।

বিক্রম: জানোয়াররাও তাদের সন্তানের জন্য মরে। ওটা কিছুই নয়।

অনুপম: আমি আর একটু নিয়ে যাই। একটা স্বতঃসিদ্ধ রাখি—এক্ষুনি যদি একটা এন্‌জিন্‌ এখানে গড়িয়ে এসে ঐ শিশুটিকে মাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, আমরা সকলেই ওর জন্য প্রাণ দিতে ইচ্ছা করবো। (বিক্রমকে) আমার আন্দাজ, আপনি নিজেই জানেন না, আপনি কতো ভালো (বিক্রম গোঁফের অগ্রভাগ পাকাইতে থাকেন। শ্রীমতী রয়কে) এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে আমার বড়ো পছন্দ হয়, মাদাম্‌।

শ্রীমতী: আজ্ঞে, মাফ করবেন।

অনুপম: না, মানে—আপনি তো ইংলণ্ডে ছিলেন। ইংরেজরা খুব মানবিক, তাদের একটা উঁচু মাপের কর্তব্যবোধ আছে। হের্‌ বিক্রম বলতে পারবেন—জার্মানিদেরও আছে। আর আমি তো আমেরিকায় ছিলাম—আমেরিকানদের তো আছে নিশ্চয়।

(কিশোরকে) আর আপনাদের নৌবাহিনীতে তো আছেই। এটা সাম্যের যুগ, সবাই সমান—উঁচু উঁচু, বড়ো বড়ো ভাব। (দীনবন্ধুকে) তা আপনার কোথায় বাড়ি সার ?

দীনবন্ধু : (লজ্জিত কণ্ঠস্বরে) আজ্ঞে, এই ভারতবর্ষে।

অনুপম : (হতভম্বের ন্যায়) তার মানে ?

দীনবন্ধু : (লজ্জিত কণ্ঠস্বরে) না, মানে ঠিক একটা জায়গায় তো ফেলা যাবে না। বাবা, সিকি হিন্দুস্থানী সিকি বাঙালী, সিকি তামিল, সিকি তেলেগু আর মা সিকি মারাঠি, সিকি বাঙালী, সিকি উড়িয়া···

অনুপম : (আরও হতভম্বের ন্যায়) কিন্তু আপনি তো মাহাতো ?

দীনবন্ধু : আজ্ঞে, বাবা মা ফেলে দিয়েছিলেন—দীনহীন এক মাহাতো কুড়িয়ে এনে মানুষ করে নাম রেখেছিলেন দীনবন্ধু মাহাতো। ঐ—মানে, অধিরথসূতপুত্র আর কি।

অনুপম : বাঃ! এ যে দেখি—পুরোনো পথে ফাগুয়ার রঙ, ফাগুন লেগেছে বনে বনে! (পুলিসটি ঘুরিয়া যায়।) আচ্ছা—আমাদের এখানে কি ঐ ইউনিফর্মধারীর কোনো প্রয়োজন আছে ? আমরা তো বেশ নরম হয়ে গেছি—আগে যেমন গরম গরম নিজেদের কথা ভাবতাম এখন তো আর তা ভাবছি না। (দরজায় ওয়েটারকে দেখা যায়।)

বিক্রম : (বাজখাঁই গলায়) সিগারেন্—হাভানা, ডোন্নের্‌ভেট্টের—হতবুদ্ধি হয়ে জাহান্নমে যাও!

অনুপম : (ঘুষি দেখাইয়া) আমার ঠাণ্ডা ?

ওয়েটার্ : কম্' গ্লাইস্—এখুনি আসছি সার—

অনুপম : আর একটু দেরী—একেবারে সোজা একচিতে নরকে পতন করে দেবো। হ্যাঁ,—ও যখন এলো তখন কি যেন বলছিলাম ? ও হ্যাঁ, এখন আমরা অনেক-সব বদলে গেছি—সবাই কেমন ঠাঁই-ঠাঁই ভাই-ভাই হয়ে গেছি। এই যে কর্নেল—লোহার মতো কঠিন রক্তের শরীর। কিন্তু এঁকে একটা সুযোগ দিন—দেখবেন

সঙ্গে সঙ্গে, এইখানে—হ্যাঁ হ্যাঁ, এইখানে বসে বসেই কেমন উদার হয়ে গেছেন। (বিক্রমকে) বলুন সার্—একবার অন্তত 'হ্যাঁ' বলুন। (বিক্রম সেন উন্নাসিক আনন্দে গোঁফের অগ্রভাগ পাকাইতে থাকেন।)

দীনবন্ধু : আমারও কেমন মনে হয়, জানেন ?······মানে···আমরা সবাই হয়ত চাই কিন্তু কোথায় যেন······কেমন করে যেন······(মাথা নাড়েন।)

অনুপম : মনে হচ্ছে—কোথায় যেন আপনার একটা সন্দেহ আছে। হবে হয়ত—আপনার অভিজ্ঞতা হয়ত তাই বলছে। আমি কিন্তু মশাই, আশাবাদী—আমার তো মনে হয়—অদূর ভবিষ্যতে খোদ শয়তানকেও আমরা ঠাঁই-ঠাঁই ভাই-ভাই করে ফেলবো। সেও হয়ত দেখবো গলা মিলিয়ে গুন্ গুন্ করতে করতে আমদেরই মতো উদার হয়ে পড়েছে। তা শয়তানকে বেশ খানিকটা বিপদে ফেলে দেওয়া যাবে, কি বলেন ?—সেই কবে থেকে, আবহমান কাল থেকে মানুষের মন্দ করে আসছে বলুন তো! সমস্ত আত্মচিন্তা, স্বার্থপরতা যেন হোমাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে! এই যে বিক্রম সেন, বুড়ো-নিট্‌শ্‌কে নিয়ে পড়েছেন—এই বিক্রম সেন তখন নিজেকে চিনতেই পারবেন না। উদার, দয়ালু একটা মানুষের মতো মানুষ তখন! পবিত্র সুযোগ সব তখন তো এসে গেছে। (রেল-কর্মচারীর ঘোষণা শোনা যায়। একটি গাড়ি আসিতেছে।)

বিক্রম : (হতচকিত) ডের্ টয়ফেল্—মানে—দেখেছ শয়তানিটা—জাহন্নমে যাক! (ব্যাগ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিশোর শর্মাও উঠিয়া দাঁড়ান।)

বিলাস : একি, আমাদের গাড়ি ?

বিক্রম : হ্যাঁ, ঐ প্লাট্‌ফর্মে এসেছে—এক মিনিট দাঁড়াবে। (সকলেই তাড়াতাড়ি মালপত্র লইয়া উঠিয়া পাড়লেন।)

অনুপম : উত্তেজিত হবো না বললে কি হবে ? এরা মানুষকে খুঁচিয়ে উত্তেজিত করে। আমার ঠাণ্ডাটা আর এলো না!

(তাড়াতাড়ি করিয়া গাড়ি ধরিবার জন্য সকলেই অগ্রসর হয়। দীনহীনা ঐ স্ত্রীলোকটিকে দেখা যায় শিশুসন্তান এবং দুইটি বড়ো পুঁটলি লইয়া গাড়ি ধরিবার জন্য অসহায়ের ন্যায় অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। মুখে চোখে নিদারুণ হতাশা—ভয়, হয়ত গাড়ি ধরিতে পারিবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর না পারিয়া, সমস্ত কিছু নামাইয়া দিয়া চিৎকার করিয়া উঠেঃ 'দয়া ক'রে একটু সাহায্য করুন—গাড়িটা আমাকে ধরতেই হবে'। অগ্রসরমান যাত্রীরা ঐ চিৎকারে মুহূর্তের জন্য পিছন ফিরিয়া তাকায়।)

অনুপম : কি যেন বললে? সাহায্য! (না থামিয়া অগ্রসর হইয়া যান।)

দীনবন্ধু : (দ্রুত নিকটে আসিয়া শিশুটি এবং একটি পুঁটুলি উঠাইয়া) ঐ পুঁটলিটা তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে চলে আসুন। (দুইজনে প্রায় ছুটিয়া অগ্রসর হয়। দ্বারপথে ওয়েটারকে দেখা যায়—মুখে ক্লান্ত হাসি। অন্ধকার।)

(আলো আসিয়া পড়ে বেদীর উপর। বেদীটি এখন গাড়ির কামরা। ট্রেন চলার শব্দ। বাহিরে আলো আসিয়া পড়ায় বোঝা যায় গাড়ি চলিতেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা। যাত্রীরা বসিয়া আছেন। অল্প দোলায়মান ভাব। শ্রী ও শ্রীমতী রয়—দুইজনেরই মুখের সামনে খবর-কাগজ খুলিয়া ধরা—যেন অপরাপর যাত্রীদের উপস্থিতির বিপক্ষে বর্মস্বরূপ। শ্রীমতী রয়ের পাশে বিক্রম সেন, তাঁহার বিপরীতে অনুপম ভোস, তাঁহার পাশে জানালার ধারে কিশোর শর্মা, অপর জানালার সামনে বিক্রম সেনের ব্যাগ। ট্রেন চলার শব্দ ও খবর-কাগজের পাতা ওলটানর খণ্ড খণ্ড শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই নাই।)

অনুপম : (কিশোরকে) জানলাটা একটু তুলে দিলে হতো। যে দৌড়টা করিয়েছে! (কিশোর সশব্দে হাসিয়া জানালা তুলিয়া দেন। শ্রী ও শ্রীমতী রয় একটু বিরক্তির সঙ্গে ব্যাপরটি লক্ষ্য

করেন। বিক্রম সেন ব্যাগ হইতে একটি বই বাহির করেন।)

অনুপম : (বিক্রমকে) আপনারও পড়ার অভ্যাস আছে দেখছি। হবেই তো, জার্মানীতে ছিলেন কিনা! জার্মানরা জানেন—খুব কিন্তু পড়াশুনো করে! কিছু না পায় তো অভিধান, কিংবা পাঁজি —পাঁজিই সই—মানে জার্মানী পাঁজি আর কি! আমাদের—মানে ওদের মিনেসোটাতেও কিন্তু পড়ার রেওয়াজটা খুব ছিলো। কিছু না কিছু একটা পড়তেই হবে। আমিও যা পাই তাই পড়ি। অনেকটা গরুর মতো আর কি—যা পায় তাই খায়। কিশোর সশব্দে হাসিয়া উঠেন। অনুপমের দৃষ্টি বিরক্তপূর্ণ। বিক্রমকে) কি বই? (নিজেই উঁকি দিয়া বইয়ের নাম দেখিয়া) ডন্ কিওটে। খুব ভালো, আমাদের মিনেসোটায়, মানে ওদের ওখানে ভদ্রলোকের খুব খাতির। তবে কি জানেন? কেমন যেন পাগলাটে, অনেকটা খেপা হুলো বেড়ালের মতো। তবে আমরা—মানে ওরা কিন্তু ভদ্রলোককে খাতিরই করে, ঠাট্টা তামসা করে না।

বিক্রম : অনেককাল মারা গেছে। দুনিয়াও রেহাই পেয়েছে।

অনুপম : (মুখের দিকে তাকাইয়া) কি যেন আপনার নামটা?

বিক্রম : কর্নেল—ছিলাম—বিক্রম সেন।

অনুপম : হ্যাঁ হ্যাঁ, কর্নেল সেন—তাই বলছিলাম—ডন্ কিওটে—মানে বীরোচিত ধীরোদাও—আমাদের—মানে ওদের মিনেসোটাতে কিন্তু এসবের খুব খাতির।

বিক্রম : বীরোচিত ধীরোদাও—কিছু নয়, কিছু নয়—নাইন্, নাইন্—সেন্টিমেণ্টালিশ্—ফাঁকা আবেগ—আলু-আলু ভাব। আজকের দিনে কুছ্ কাম্‌কা নেহি! আজ শুধু জোর—হয় জোরে ঠেলো—আর নয় জোরে টানো!

অনুপম : আপনি জার্মানী গিয়েছিলেন কিনা—তাই শুধু ঠেলো আর টানো করছেন। আমাদের মিনেসোটাতে—মানে ওদের ওখানে—প্রত্যেক লোকের বেঁচে থাকার আত্মিক স্বাধীনতা আছে—তা সে যতো সামান্য যতো দুর্বলই হোক। এইভাবে ভেবে আমরা, মানে

ওরা একটু উঁচু উঁচু বোধ করে—কি রকম যেন মহৎ হয়ে যাই. মানে যায়।

বিক্রম : মহৎ ? দূর মশাই। (দীনবন্ধুবাবু অগ্রসর হইয়া আসেন এক হাতে পুঁটলি, এক হাতে শিশু। বসিবার আসনের জন্য এদিক-ওদিক দেখেন। শ্রী ও শ্রীমতী রয় খবর-কাগজের অন্তরালে যেন গভীরে নিমগ্ন। কিশোর হাসিয়া উঠেন।)

বিক্রম : আরে !

অনুপম : এ কি !

দীনবন্ধু : একটু জায়গা হবে ?—বসবো ?

অনুপম : নিশ্চয় নিশ্চয়—এই তো—(বিক্রমের ব্যাগের দিকে দেখাইয়া দেন।)

দীনবন্ধু : (পুঁটুলিটি নামাইয়া রাখিয়া শিশুটিকে দোলাইতে দোলাইতে) বসতে পারি ?

অনুপম : আসুন—বসুন—(বিক্রম সেন বেশ উষ্ণতার সঙ্গে ব্যাগটি সরাইয়া অল্প জায়গ করিয়া দিলে দীনবন্ধু কোনো মতে বসিলেন।) —এর মা কোথায় ?

দীনবন্ধু : (বিমর্ষ কণ্ঠস্বরে) মনে হচ্ছে—উঠতে পারেন নি। (কিশোর হাসিয়া উঠেন। শ্রী রয় খবর-কাগজের অন্তরাল হইতে নিজের অজ্ঞাতসারেই মুখ বাহির করেন। চোখে বিস্মিত দৃষ্টি।)

অনুপম : বাঃ, এ যে দেখছি পুরো ঘর-গৃহস্থালী ব্যাপার। (বিলাস রয় দুইটি অক্ষরে হা-হা করিয়া হাসিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে কাগজের অন্তরালে। তারপর শ্রী ও শ্রীমতী রয়ের সামনের কাগজ চাপা-হাসিতে কম্পিত হইতে লাগিল।)

বিক্রম : (দীনবন্ধুকে) এবং আপনি তার পুঁটলি আর সন্তানটিকে নিয়ে উঠে পড়েছেন—হা (শুষ্ক হাসি হাসেন।)

অনুপম : (গম্ভীরভাবে) আমি কিন্তু মৃদু-মন্দ হাসছি। আমার তো মনে হয়—দৈব আপনাকে বেশ ভালমতে ল্যাং মেরেছেন। এটা কিন্তু ঠিক হয়নি—খুব কিন্তু ইতরের মতো কাজ !

বিক্রম : কার ?

অনুপম : কেন ? ঐ দৈবের—মানে ঈশ্বরের। (শিশুটি কাঁদে। দীনবন্ধু হতাশভাবে তাকে দোলান—মুখের ভাব কিন্তু নম্র, কোমল, বিরক্তি নাই। সকলের মুখের দিকে তাকান। সকলেই অল্পবিস্তর মজা পাইতেছেন। কেবল অনুপম গাম্ভীর্যে অটল।)

অনুপম : আপনি বরং চটপট নেমে বাচ্চাটাকে ওর মার কাছে দিয়ে আসুন—বাচ্চার মা তো পাগলের বাড়া হয়ে আছে না !

দীনবন্ধু : বেচারা ! কি কষ্টই না পাচ্ছে ! ভাবছে—হয়ত হারিয়েই গেল। (হঠাৎ হাসি চাপিতে না পারিয়া সকলে সশব্দে হাসিয়া উঠেন। সারা কামরা হাসির শব্দে ভরিয়া যায়। শ্রী ও শ্রীমতী রয় কাগজের অন্তরাল হইতে মুখ বাহির করিয়া হাসিতে অংশগ্রহণ করিবার উপক্রম করেন। দীনবন্ধুর মুখে শীতার্ত মৃদু হাসি।)

অনুপম : (হাসির পর অবসাদক্লিন্ন স্বরে) ঘটনাটা ঘটলো কিভাবে ?

দীনবন্ধু : আমরা যখন পৌঁছলাম, ট্রেন তখন ছাড়লো। আমি লাফিয়ে উঠলাম।—ভাবলাম, ওকে ধরে তুলে নেবো। কিন্তু গাড়ি জোর দিলে, আমায় ছেড়ে দিতে হলো। (আবারও সকলের হাসি।)

অনুপম : আন্দাজ করুন—আমি হলে বাচ্চাটাকে ছুঁড়ে তাকে দিয়ে দিতাম।

দীনবন্ধু : ভয় হচ্ছিল—যদি হাড়গোড় ভেঙে যায়। বাচ্চা কাঁদে। দীনবন্ধু দোলান। আবারও হাসি।)

অনুপম : (গম্ভীর হইয়া) ব্যাপারটায় বেশ কৌতুক আছে। না না, বাচ্চাটার দিক থেকে নয়। আচ্ছা, ভালো কথা, বাচ্চাটা কি ? একটু যেন কি রকম-কি রকম মনে হচ্ছে ! অন্তত আমার বিচারে—

দীনবন্ধু : আমি কিন্তু ভালো করে দেখিনি।

অনুপম : সামনে কোন্ দিকটা ?

দীনবন্ধু : মনে তো হয় মাথার দিকটা।

অনুপম : উল্‌টো করে নিয়ে আসেন নি তো ?

দীনবন্ধু : না না, সোজা করেই এনেছি।

অনুপম : এক কাজ করুন,—জানলা দিয়ে ওকে একটু বাইরে ধরুন। বাচ্চারা উত্তেজিত অবস্থায় যখন-তখন প্রস্রাব করে—মিনেসোটায় তো করেই।

শ্রীমতী রয় : (তড়িতাহতের ন্যায়) না না—

বিলাস : (শ্রীমতীর হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া) মনীষা—

অনুপম : (বিলাসকে) না না, উনি তো ঠিকই বলেছেন। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। একটা বাচ্চার জীবনের দাম কতো।—ওরাই ভবিষ্যৎ। আর তাছাড়া, আমরা সবাই তো ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে এই বাচ্চার অংশীদার—মানে বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বপ্রেম আর কি! জীবে দয়া করে যেই জন—ভালো কথা, মাদী না মদ্দা?

দীনবন্ধু : আমি শুধু মাথার ওপরটা দেখতে পাচ্ছি।

অনুপম : তাতে তো ঠিক বোঝা যাবে না। বড্ড বেশী কাপড় জড়ানো হয়েছে!—একটু খুলে দিলে হয় না?

বিক্রম : নাইন্, নাইন্—না, না।

অনুপম : মনে তো হয় কর্নেল—খুব সম্ভবত আপনিই ঠিক। ছেঁড়া কাপড় জড়ানো বাচ্চাটাকে বাতাসে উন্মুক্ত করাটা সবিশেষ দুঃখেরই হবে। ওর মার সঙ্গে একটু আলোচনা করাটা বোধহয় উচিত—কি বলেন?

শ্রীমতী রয় : নিশ্চয় নিশ্চয়! আমি তো বলি—

শ্রীরয় : (শ্রীমতীকে সকলের অলক্ষ্যে স্পর্শ করিয়া) যেমন আছে তেমনি থাক না—কুকুরবাচ্চার মতো জড়ানো-সড়ানো বেশ তো আছে বলে মনে হয়।

অনুপম : সেটা তো এই মুহূর্তে ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু আমার বিচারে ওর মুখটা অন্তত দেখা—এটা আমদের মানবতাবোধের একটা দায়-দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

দীনবন্ধু : (হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে) বাচ্চাটা আমার আঙুলটা কিন্তু চুষেই যাচ্ছে। এই তো—এই তো—দেখুন না!

অনুপম : আমার ধারণা করতে ইচ্ছা হয়—তাই ধারণা—আপনার অবসর-সময়ে আপনি এইরূপ দু-একটি বাচ্চা নিশ্চয় তৈরি করেছেন, দীনবন্ধুবাবু ?

দীনবন্ধু : না না, বাস্তবিক বিশ্বাস করুন—একেবারেই না।

অনুপম : আমার দিব্য !—আপনি যে কি হারাইয়াছেন, তা আপনি নিজেই জানেন না। (বাড়ির সকলের উদ্দেশ্যে) আমার তো মনে হয়, এই ছোট্ট আগন্তুকটি—যে আজ আমাদের মধ্যে এসে পড়েছে—এতে আমরা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করতে পারি। এই ঘটনা প্রমাণ করছে—এই শিশুর মতো অসহায় দুর্বলরা আমাদের ওপর কতখানি জোর রাখে। এই যে কর্নেল, লৌহকঠিন মানুষ—রক্তের মতই ঘোর—এমন কি, এই কর্নেলও কেমন ঠাণ্ডা মেরে গিয়ে এই শিশুর প্রতিবেশী হয়ে চুপচাপ বসে আছেন। সকল আঁধার পবিত্র-করা এই শিশু এই কর্নেলের মধ্যে যেন ঈশ্বরের করুণার নির্দেশ স্বরূপ। সত্যি সত্যিই, ধীরোদাত্ত বীরোচিত।

দীনবন্ধু : (কোনমতে, মৃদুস্বরে) আমি—আমি যেন এইবার মুখটা একটু দেখতে পাচ্ছি। (সকলে ঝুঁকিলেন।)

অনুপম : শিশুটির আকার প্রকার কিরূপ ?

দীনবন্ধু : (পূর্বের মতই, কোনমতে, মৃদুস্বরে) আমি তো—মানে আমি তো গোটাকতক ছোটো ছোটো গুটি-গুটি দাগ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

বিক্রম : ওঃ! হাঃ! ফুই! (কিশোর সশব্দে হাসেন।)

অনুপম : শুনেছি, শিশুদের গায়ে প্রায়ই মাঝে মাঝে এরকম দেখা যায়। (শ্রীমতী রয়কে) আপনি বোধহয় এ সম্পর্কে আমাদের কিছু তথ্য দিতে পারেন, মাদাম্।

শ্রীমতী রয় : হ্যাঁ, নিশ্চয়—কিন্তু—মানে কি ধরনের—

দীনবন্ধু : মনে হচ্ছে, দাগগুলো সারা গায়েই ছড়িয়ে আছে—(সকলকে একটু সিটকাইয়া উঠিতে দেখিয়া) তবে আমার কি রকম যেন

নিশ্চিত মনে হচ্ছে যে, বাচ্চাটা—মানে, কাপড়ে জড়ানো এই বাচ্চাটা—এমনিতে, মানে বেশ ভালই হবে আর কি।

অনুপম : সেটা কিন্তু জোর করে বলা শক্ত। আমি আবার একটু অনুভূতিপ্রবণ, বুঝলেন কিনা। কোনো খারাপ রোগও তো হতে পারে—শুনেছি, অনেক সময় উপ-ত্বকে ঐ রকম দাগ-দাগ হয়ে ফুটে ওঠে—সংক্রামকও হয়।

বিক্রম : ফুই! (যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়া একটি সিগার ধরাইলেন। কিশোর নিজের পা পিছনে সরান, বাচ্চাটির নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টায়।)

অনুপম : (একটি সিগার বাহির করিয়া) মনে হয় গাড়িতে একটু ধোঁয়া দিলে ভালই হবে। (দীনবন্ধুকে)—বাচ্চাটা কি কষ্ট পাচ্ছে, কি মনে হয় আপনার ?

দীনবন্ধু : (উঁকি মারিয়া) বাস্তবিক পক্ষে আমি তা মনে করি না—তবে মানে—আমি খুব নিশ্চিন্ত নই।—বাচ্চাদের সম্পর্কে আমি এতো কম জানি—মুখ চোখের ভাব নিশ্চয় ভালই হবে—যদি পুরো দেখা যেতো—

অনুপম : কি রকম দাগ ?—একটু ফোস্কা ধরনের ?

দীনবন্ধু : হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু যেন ফোস্কা-ফোস্কা।

অনুপম : (গম্ভীরভাবে চারিদিক দেখিতে দেখিতে) আমার বিচারে—হয় জল-বসন্ত, নয় হাম-বসন্ত, আর নয় তো গুটি-বসন্ত।—বড়ই সংক্রামক (বিক্রম নিজেকে সঙ্কুচিত করিতে করিতে, সরিতে সরিতে পাশে বসা শ্রীমতী রয়ের আসনের সঙ্গে নিজেকে আঁটিয়া দিলেন বলিলেই হয়।)

শ্রীমতী রয় : বেচারা! (উঠিবার উপক্রম করিয়া) আমি কি একটু—

বিলাস : (শ্রীমতীকে স্পর্শ করিয়া বাধা দিয়া) না, কক্ষনো না—চুলোয় যাক।

অনুপম : মাদাম্, আপনার মনোভাবকে সম্মান জানাই। আপনি আমাদের সকলের সম্মান। কিন্তু আপনার স্বামীর প্রতি আমার

সহানুভূতি আছে। জল-বসন্ত কি হাম-বসন্ত কিংবা গুটি বসন্ত—তিনটিই মহামারী আর সংক্রামক তো বটেই—এখানে না হোক, মিনেসোটায় তো নিশ্চয়—বিশেষ করে আপনার মতো যৌবনবতী রমণীর পক্ষে।

দীনবন্ধু : আমার আঙুলটাকে এর কিন্তু ভারি পছন্দ। বাস্তবিক পক্ষে, মানে—এমনি কিন্তু বেশ মিষ্টি বাচ্চা।

অনুপম : (কিসের যেন ঘ্রাণ লইতে লইতে) ওটাই তো একটা বড়ো প্রশ্ন—সত্যিই মিষ্টি কি না ?—আমার তো তাই মনে হয়। আচ্ছা, ঐ জল ফোস্কাগুলো ?—গোলাপি-গোলাপি লালচে ?

দীনবন্ধু : না তো। কালো, অন্ধকার-অন্ধকার—প্রায় কালোই বরং বলা চলে।

বিক্রম : গট্! হা ঈশ্বর! এ তো শুঁটো হাম! ডয়েট্স্লাণ্টে—মানে জার্মানীতে হয় দেখেছি—এখানে কি করে এলো—ভয়ঙ্কর—ঐ যে কি বলে—(নিজেকে সঙ্কুচিত করিতে করিতে, সরাইতে সরাইতে শ্রীমতী রয়ের আসনের হাতলটি অধিকার করিয়া লইয়াছেন বলিলেই হয়।)

অনুপম : জার্মান মিজ্ল্স্—শুঁটো হাম, ভীষণ ছোঁয়াচে—সাংঘাতিক অসুখ—রোগের মতো রোগ একটা। (কিশোর শর্মা হঠাৎ উঠিয়া কামরার বাহিরের খোলা জায়গার দিকে অগ্রসর হন। পিছনে বিক্রম, চুরুট টানিতেছেন। শ্রীরয় ও অনুপম এক মুহূর্তের জন্য কোনো কথা না বলিয়া বসিয়া থাকেন। শ্রীমতী রয় দীনবন্ধুকে দেখিতেছেন। সে দৃষ্টিতে কৌতূহল, বিস্ময়, করুণা, ভয়,—সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।)

বিলাস : (স্ত্রীকে) কি রকম যেন গুমোট মনে হচ্ছে। চলো—একটু বাইরে যাই। লাগছে না গুমোট ? (কোনো কথা বলিবার অবসর না দিয়া স্ত্রীকে উঠাইয়া দুইজনে অগ্রসর হইলেন। শ্রীমতী অগ্রসর হইতে হইতেও দীনবন্ধুকে দেখিতেছেন।)

অনুপম : মিনেসোটাতে শুনতাম—সাহসের মতো প্রশংসার বস্তু আর

কিছুই নেই। তবু—আমি একটু বাইরেই যাই। (সিগার টানিতে টানিতে অগ্রসর হইলেন। দীনবন্ধু চোখ-মুখ কেমন ছোটো করিয়া তাঁহার দিকে দেখিতেছেন। তারপর নিজের থেকে একটু তফাতে রাখিয়া শিশুটিকে দোলা দিতে আরম্ভ করিলেন। শিশুটি কাঁদে। দীনবন্ধু কি করিবেন কিছু ঠিক করিতে পারিতেছেন না। একবার নামাইয়া দেন, একবার তুলিয়া দোলা দেন। শিশুটি তবুও কাঁদে। তখন অল্প অল্প দোলাতেই ভাঙা-গলায় ঘুম পাড়ানি গান গাহিতে থাকেন। শিশুর কান্না থামে। শোয়াইয়া দিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখেন দরজার নিকট অনুপম। মুখ প্রায় চুরুটের ধোঁয়ায় অন্ধকার। জানালা নামাইয়া দিয়াছে। হু-হু করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া আসে। গায়ের চাদর তুলিয়া হাওয়া আড়াল করেন। (অগ্রসর না হইয়াই বলেন) আপনি করুণার মূর্ত প্রতীক। দেখি নাই কভু, শুনি নাই কভু—আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে যে পরমানুভূতি বর্তমান আপনি তার প্রতিনিধি স্বরূপ। এমন দৃশ্য আমি জীবনে কখনও দেখিনি। আমি ভেতরে দীনবন্ধু, বাইরে অনুপম—আর আপনার ভিতর-বাহির এক—শুধুই দীনবন্ধু। মুখ তখন চুরুটের ধোঁয়ার মেঘে ঢাকা। দীনবন্ধু ভাঙা গলায় ঘুমপাড়ানি গান গাহিতেছেন। কখনও ঠাণ্ডা বাতাস আড়াল করিতেছেন। কখনও বা বাচ্চাকে দোলাইতেছেন। অন্ধকার।)

(আলো আসে। ট্রেন আসিবার প্ল্যাটফর্মের উপর। ব্যস্ত যাত্রীরা। মালপত্র ইত্যাদি। অসহায় অবস্থায় শিশুটিকে লইয়া দীনবন্ধু দাঁড়াইয়া আছেন। পিছন হইতে একজন পদস্থ কর্মচারী ও একজন পুলিস দীনবন্ধুর দিকে অগ্রসর হইয়া আসেন।)

কর্মচারী : (একটি টেলিগ্রাম পড়িতে পড়িতে দীনবন্ধুকে দেখিয়া) এই তো—(নিকটে আসিয়া) আপনি একটা বাচ্চা চুরি করেছেন ?

দীনবন্ধু : (অসহায়ের ন্যায়) কই—না তো।

কর্মচারী : এ আপনার বাচ্চা ?

দীনবন্ধু : কই—না তো। (কর্মচারী শিশুটির দিকে হাত বাড়ান।)

দীনবন্ধু : (মাথা নাড়িয়া) খুব সাবধান। বড্ড অসুখ। জার্মান মিজ্‌ল্‌স্—শুঁটো হাম—ভীষণ ছোঁয়াচে।

কর্মচারী : (মাথা নাড়িয়া) বুঝতে পারছি না। এ তো আপনার বাচ্চা নয় ?—নয় তো ?

দীনবন্ধু : (জোরে মাথা নাড়িয়া) না, না তো—কিছুতেই না।

কর্মচারী : (টেলিগ্রামটিতে টোকা মারিতে মারিতে) ভালো কথা। আপনাকে গ্রেফতার করলাম—(পুলিসকে) এই—(ইঙ্গিত করিলেন। পুলিস দীনবন্ধুর হাত ধরে।)

দীনবন্ধু : কিন্তু কেন ? আমি তো বাচ্চা চাইনি।

কর্মচারী : পুঁটুলি তো আপনার নয় ?

দীনবন্ধু : না।

কর্মচারী : খুব ভালো কথা। আপনাকে আবারও গ্রেফতার করা হলো।

দীনবন্ধু : কিন্তু—আমি তো চোর নই। ওই মেয়েটির জন্যে এটা তুলে নিয়েছিলাম।

কর্মচারী : (মাথা নাড়িয়া) টেলিগ্রাম অন্য কথা বলছে। আমি টেলিগ্রাম বুঝি—আপনার কথা বুঝি না।

দীনবন্ধু : (তখন নিজের মাথার চুল ছিঁড়িবার মতো অবস্থা) কিন্তু আমি তো—আমি তো—(শিশু কাঁদে।) না না,—না না,—কাঁদে না —(হাত ধরা অবস্থাতেই যতটা সম্ভব শিশুটিকে দোলাইতে থাকেন।)

কর্মচারী : নড়বেন না। একদম স্থির থাকুন। আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দীনবন্ধু : এর মা কোথায় ?

কর্মচারী : পরের গাড়িতে আসছে। এই তো টেলিগ্রামে বলছে—কালো বাচ্চা, কালো পুঁটুলি, সামান্য ময়লা, একটা লোক—ছেলে চুরি—দেখলেই ধরো—পরের গাড়িতে 'মা'কে পাঠাচ্ছি। আসুন আমাদের সঙ্গে। (দীনবন্ধুকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে—

এমন সময় পিছন হইতে অনুপমের কণ্ঠস্বর—)

অনুপম : (নিজেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখিয়া) একটু দাঁড়ান—এক মিনিট। (সকলেই দাঁড়াইয়া পড়েন। দীনবন্ধু পাশের বেঞ্চে বসেন। পুলিস পিছনে দাঁড়ায়। অনুপম দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া কর্মচারীটিকে ইশারায় কাছে ডাকেন। কর্মচারীটি নিকটে আসিল—) আপনি আনন্দ করতে পারেন ?

কর্মচারী : কিসের আনন্দ ?

অনুপম : স্বর্গ থেকে মূর্তিমান দেবদূত ঐ বেঞ্চে বসে আছেন। কাজেই, পেছনে পুলিস কেন ?

কর্মচারী : বুঝতে পারছি না।

অনুপম : কেন ?—আমি তো বাংলায় বলছি।

কর্মচারী : বুঝি না।

অনুপম : কি বোঝেন ?

কর্মচারী : টেলিগ্রাম।

অনুপম : স্বর্গ বোঝেন ?

কর্মচারী : না।

অনুপম : (পাখা নাড়িয়া উড়িবার ইঙ্গিত করিয়া) দেবদূত বোঝেন ?

কর্মচারী : না।

অনুপম : তবে কি বোঝেন ?

কর্মচারী : বললাম তো—টেলিগ্রাম। (ছোটো-খাটো একটি ভীড় জমিয়া যায়। শ্রী ও শ্রীমতী রয়, বিক্রম সেন, কিশোর শর্মা—সকলকেই দেখা যায়।)

কর্মচারী : (টেলিগ্রামে টোকা মারিতে মারিতে) আমি টেলিগ্রাম ছাড়া কিচ্ছু বুঝি না। আমাকে আমার কর্তব্য তো করতে হবে।

অনুপম : তবে আপনাকে বলি শুনুন—ভদ্রলোক কিন্তু খুব সাদা, আমাদের মিনেসোটার ভাষায় ভদ্রলোকের খাতার পাতা একেবারে সাদা।

কর্মচারী : ভালো হোক, মন্দ হোক, কালো হোক, সাদা হোক—তাতে

কিছু এসে যায় না। এই টেলিগ্রাম অনুসারে আমার কর্তব্য আমাকে করতেই হবে।

অনুপম : শুধু পাতাটি সাদা নয়, (হাতের আংটি দেখাইয়া) এই যে আংটি দেখছেন সোনা দিয়ে তৈরি, ওঁর হৃদয়টিও তেমনি সোনা দিয়ে তৈরি—যাকে বলে—হার্ট অব্ গোল্ড (একটি টাকা বাজাইয়া) রূপো নয়—একেবারে খাঁটি সোনা !

কর্মচারী : (ঘুষের কথায় আসিতেছে মনে করিয়া দর বাড়াইবার জন্য) আংটিটাতে আর কতটুকু সোনা আছে বলুন ? চার আনাও হবে না। আর টাকার কি কোনো দাম আছে আজকাল ? আমাকে আমার কর্তব্য করতেই হবে। (দীনবন্ধুর দিকে অগ্রসর হন।)

অনুপম : একটা কিন্তু কালো আছে। বাচ্চাটার জার্মান মিজ্‌ল্‌স্—মানে শুঁটো হাম—ভীষণ ছোঁয়াচে—সঙ্গে জ্বর বিকার, প্রদাহ, কালাজ্বর। এখন কর্তব্য করুন। আপনার জন্য, আর আপনার পুলিসটির জন্য আমার দুঃখই হয়।

কর্মচারী : (থামিয়া গিয়া) জ্বর-বিকার, প্রদাহ, কালাজ্বর, জার্মান মিজ্‌ল্‌স্—মানে শুঁটো হাম—সে তো বড্ড ছোঁয়াচে।

অনুপম : তবে আর বলছি কি ?

কর্মচারী : ভগবানের দিব্যি—এতো বড়ো বিপদ হলো ! আমার কর্তব্য—মানে ডিউটি—?

অনুপম : (ভিড়ের মধ্যে বিক্রম সেনকে দেখাইয়া) এই ভদ্রলোকও জানেন, জিজ্ঞেস করুন—

কর্মচারী : জার্মান মিজ্‌ল্‌স্—শুঁটো হাম—প্রদাহ—কালাজ্বর—এসব তো বড়ো ভয়ানক কথা !

অনুপম : আমার কি রকম মনে হয়েছিলো—আপনার এই রকমই মনে হবে।

কর্মচারী : এক্ষুনি ফিনাইল, ডি ডি টি—(স্টেশনের একজন কুলিকে) জলদি—! (কুলিটি দ্রুত বাহির হইয়া যায়। ভিড় দীনবন্ধুকে দেখিতে থাকে। দীনবন্ধুর ভ্রূক্ষেপ নাই—ক্রন্দনরত শিশুটিকে তিনি

দোলাইতেছেন, গান গাহিতেছেন।)—কিন্তু এখন কি করা যায়?

অনুপম : বলবো ?—বাচ্চাটাকে আলাদা করে ফেলুন।

কর্মচারী : কিন্তু আমি কি ভুল করলাম? (টেলিগ্রাম দেখিয়া) এই তো টেলিগ্রাম—কালো বাচ্চা, কালো পুঁটলি,—সামান্য ময়লা একটা লোক, ছেলে চুরি—দেখলেই ধরো—তাই তো ধরলাম—তবে? ও—বাচ্চাটাকে আলাদা করতে হবে।—এই যে দাদা, দয়া করে বাচ্চাটাকে নামিয়ে রাখুন, আমরা জমা করে নিই। —যদি বলেন তো হাসপাতালে—(দীনবন্ধুর ভ্রূক্ষেপ নাই। শিষ দিতেছেন, গান গাহিতেছেন, বাচ্চা দোলাইতেছেন।)

বিক্রম : (দীনবন্ধুকে) বাচ্চাটাকে নামিয়ে দিতে বলছেন। (দীনবন্ধুর ভ্রূক্ষেপ নাই।)—ওটাকে নামিয়ে দিন (দীনবন্ধুর অবস্থা পূর্ববৎ। এইবার প্রায় গর্জন করিয়া) বিট্টে, মাইন্ হের্—সবিনয় নিবেদন, মহাশয়,—জাগেন্ জিঈম, উনি আপনাকে বলছেন—ডেন্ বুবেন্-ৎসু নিডেরজেৎসেন্—শিশুটিকে নামিয়ে রাখুন। (দীনবন্ধু মাথা নাড়েন ও পূর্ববৎ আচরণ করিতে থাকেন।)

কর্মচারী : নামাতেই হবে—নামান বলছি—

(উত্তপ্ত চক্ষু দীনবন্ধু কিছুটা উত্তেজিত, কিন্তু নির্বাক।)

শ্রীমতী রয় : লোকটি কিন্তু সত্যি ভালো।

বিক্রম : ভেতর থেকে ওঁর নামিয়ে রাখার ইচ্ছেই নেই।

কর্মচারী : কিন্তু নামাতে ওঁকে হবেই। এই—এক্ষুনি নামিয়ে রাখুন বলছি, নামিয়ে রেখে আমাদের সঙ্গে আসুন! (বাচ্চা কাঁদে।)

দীনবন্ধু : (কিছুটা উত্তেজিত) এই অসহায়, অশক্ত-অসুস্থ বাচ্চাটাকে এখানে একা রেখে যাবো? অ-অ-অ-অনন্ত ন-ন-ন-নরক! অনন্ত নরক!

অনুপম : (একটি তোরঙ্গের উপর উঠিয়া, উৎসাহের সহিত) এই তো, —মুখের মতো জবাব! চালিয়ে যান, চমৎকার জমবে—

(শ্রী ও শ্রীমতী রয় আস্তে আস্তে উৎসাহব্যঞ্জক তালি দেন। কিশোর শর্মা সশব্দে হাসেন। কর্মচারীটি ক্রোধে বিড়বিড় করিয়া

কি যেন বল্লেন।)

অনুপম : (বিক্রমকে) পাকড়ানেওয়ালা বলে কি ?

বিক্রম : বলছে—সব মিথ্যে—ভান, ছল—গ্রেফতার এড়াবার জন্য বাচ্চাটাকে ব্যবহার করছে। বলছে—খুব চালু।

অনুপম : আমার বিচারে ওঁর প্রতি কিন্তু অন্যায় করা হচ্ছে। এ রকম চাঁদের মতো ধপধপে মন আমি একটাও দেখিনি। গরিবের একটা কালো নোংরা বাচ্চা, তাকে সে মানুষের বাচ্চার মতো মনে করছে —কুকুরবাচ্চার মতো তাকে একা রাস্তায় নামিয়ে রেখে যেতে সে রাজীই নয়। এসব মিনেসোটাতেই দেখেছি। নিগার বাদ দিলে—একটা কুকুরবাচ্চাকে পর্যন্ত তারা রাস্তায় ফেলে রেখে যাবে না। নিগারদের অবিশ্যি ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নেয়—তবে কুত্তার বাচ্চাদের নয়। (দীনবন্ধু ওঠেন। বাচ্চা লইয়া অগ্রসর হন। ভিড়ের বৃত্ত বড়ো হয়। আবার পিছিয়ে যান। বৃত্ত ছোটো হয়। বসিয়া পড়েন।)

অনুপম : (কর্মচারীকে) আমার তো মনে হয়—বাচ্চাটার মা আসা অবধি ব্যাপারটা স্থগিত রাখলে ভালো হয়।

কর্মচারী : (পা ঠুকিয়া) আমি তো মাটাকেও গ্রেফ্‌তার করবো। এই সাংঘাতিক ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে গাড়িতে উঠেছে কেন ? (দীনবন্ধুকে) বাচ্চাটাকে নামিয়ে রাখুন—(দীনবন্ধু মৃদু হাসেন।) —শুনছেন—

অনুপম : (কর্মচারীকে) এ দৃশ্য যে কতো সুন্দর—আপনার কোনো ধারণাই নেই। (দীনবন্ধুকে দেখাইয়া) এই ভদ্রলোক—সামান্য এক ব্যক্তি—অপরের একটা কালো নোংরা বাচ্চার জন্য রোগের সাংঘাতিক ছোঁয়াচকে ভয় না করে—নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করেছেন। ভদ্রলোক খ্রীষ্টের মতো, কৃষ্ণের মতই করুণাময়।

কর্মচারী : ভালো কথায় বলছি—বাচ্চাটাকে নামিয়ে রাখুন। নইলে কাউকে হুকুম দেবো—জোর করে নামিয়ে দেবে। (পুলিসটি অল্প পিছাইয়া যায়।)

অনুপম : (পুলিসটির দিকে দেখিয়া) জোর করে নামিয়ে নেবে ! বেশ দেখার মতো ব্যাপার হবে একটা !

কর্মচারী : (পুলিসকে) বাচ্চাটাকে ,নামিয়ে নিন—(পুলিসটি বিড়বিড় করিতে করিতে অল্প পিছাইয়া যায় ।)

অনুপম : (বিক্রমকে) আমার কিন্তু একটা পয়েন্ট গেল—একটা হারলাম । বিড় বিড় করে কি বললে, ঠিক্ শুনতে পেলাম না—

বিক্রম : বললে—উনি ওর অফিসার নন ।

অনুপম : (তুইটি শব্দে হাসেন ।) হা-হা, হাসতে হাসতে আমি বোধহয় মারাই যাবো । কি রকম আপনা-আপনি সুড়িসুড়ি লাগছে ! হা-হা-হা-হা—

কর্মচারী : বাচ্চাটাকে কেউ নামিয়ে নেবে না তাহলে ?

শ্রীমতী রয় : (এক পা অগ্রসর হইয়া) হ্যাঁ, মানে আমি—

বিলাস : (হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া) কি হচ্ছে কি ? পাগল হলে নাকি ?

কর্মচারী : (কোনমতে মনে জোর আনিয়া, তুই পা অগ্রসর হইয়া) আমার হুকুম—(দীনবন্ধুকে উঠিতে দেখিয়া তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন নিভিয়া যায় ।) না না, নড়বেন না—বসুন—বসুন ওখানে ।

অনুপম : বাঃ ! কি আশ্চর্য—কি অদ্ভুত—কী গভীর কর্তব্যবোধ ! (কিশোর শর্মা সশব্দে হাসেন । কর্মচারীটি তাহাকে লইয়া সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় দ্রুতগতিতে মেয়েটিকে প্রবেশ করিতে দেখা যায় ।)

মেয়েটি : (দীনবন্ধুর দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে হইতে) পুঁটি—পুঁটি— ঐ তো পুঁটি—আমার পুঁটি—

কর্মচারী : (পুলিসকে) মেয়েটাকে আটকান—ধরুন । (পুলিস ধরে মেয়েটিকে ।—শুঁটে হাম, হামজ্বর, প্রদাহ, কালাজ্বর—ওই সব সংঘাতিক সাংঘাতিক ছোঁয়াচে রোগশুদ্ধ ঐ বাচ্চাটাকে নিয়ে কেন তুমি গাড়িতে উঠেছিলে ?

অনুপম : (তোরঙ্গের উপর হইতে আগ্রহসহকারে বিক্রমকে) ঠিক

শুনতে পেলাম না, কি বললে ?

বিক্রম : (দ্রুত) ভারুম্ হাবেন্‌জি আইনেন্ বুবেন্ মিট্‌টাইফুস্ মিট্‌-টাইফুস্ মিট্ আউস্‌গেব্রাখ্‌ট্ ? মানে—অর্থাৎ বললে—কেন তুমি জার্মান শুঁটো, প্রদাহ কালাজ্বর সহ একটা বাচ্চাকে তোমার সহিত গাড়িতে আনিয়াছ ?

অনুপম : একটা প্রশ্নের মতো প্রশ্ন বটে। (ফিল্ড্‌গ্লাসটি ঠিক করিয়া বাচ্চাটিকে দেখেন।)

মেয়েটি : আমার পুঁটির শুঁটে-হাম, হাম-জ্বর—ছোঁয়াচে রোগ—না না, কক্ষনো না !

কর্মচারী : হ্যাঁ, ওর জার্মান শুঁটে-হাম হয়েছে, প্রদাহ, কালাজ্বর, জ্বর-বিকার হয়েছে !

মেয়েটি : না না, কক্ষনো না !

অনুপম : (ফিল্ড্‌গ্লাস দিয়া দেখিতে দেখিতে) মনে হচ্ছে—মেয়েটিই ঠিক। গরম কাপড়ে জড়ানো ছিলো, কাপড়টায় লাল পড়েছে। ঐ নালের দাগই গায়ে-মুখে লেগে—ঐ যে কি বলে—শুঁটো হাম-টাম বলে মনে হচ্ছে। (কিশোর শর্মা সশব্দে হাসিয়া উঠেন।)

কর্মচারী : কক্ষনো না—ওর হামজ্বর, প্রদাহ, জ্বরবিকার, এমন কি—কালাজ্বর পর্যন্ত হয়েছে !—নিশ্চয় হয়েছে !

অনুপম : (কর্মচারীকে) ভুলটা মনে হচ্ছে আপনারই। ওটা নালেরই দাগ। এখানে এসে এটা দিয়ে দেখুন—(কর্মচারীটি তোরঙ্গের উপর উঠিয়া ফিল্ড্‌গ্লাসের মধ্য দিয়া দেখেন।)

অনুপম : (দীনবন্ধুকে) ওর পাটা ভালো করে দেখুন তো। ওখানে যদি কোনো দাগ-টাগ না থাকে তবে আমার পক্ষে যথেষ্ট ভালো—(দীনবন্ধু জড়ানো কাপড় হাতড়াইয়া বাচ্চার ছোট্ট পা-দুইটি বাহির করেন।)

মেয়েটি : (ব্যাকুলভাবে) পুঁটি, আমার পুঁটি—(হাত ছাড়াইয়া চলিয়া আসিবার চেষ্টা করে।)

অনুপম : কোথায় দাগ ?—এ তো দেখছি গাছ-পাকা মর্তমান কলার

মতই পরিস্কার। (কর্মচারীকে নম্রস্বরে) তাহলে আন্দাজ করুন—আপনি আপনার ঐ সব প্রদাহ-ট্রদাহ বলে আমাদের এক রকম বোকাই বানিয়েছেন।

কর্মচারী : মেয়েটাকে ছেড়ে দাও (পুলিস তাহাকে ছাড়িয়া দিলে মেয়েটি দ্রুত বাচ্চার দিকে ছুটিয়া যায়।)

মেয়েটি : পুঁটি—(বাচ্চা দীনবন্ধুর কোলে উষ্ণতা উপভোগ করিতেছিল.। মা কোলে লইতেই অল্প যেন ঠাণ্ডা মনে হয়—কাঁদিয়া উঠে।)

কর্মচারী : (নামিয়া আসিয়া মেয়েটিকে) তুমি কি এই ভদ্রলোককে বাচ্চা চুরির দায়ে দায়ী করছো ? (পুলিস দীনবন্ধুর হাত ধরে।)

অনুপম : কি যেন বললে ? শেষ পর্যন্ত সেই দীনবন্ধুবাবুকেই ?

বিক্রম : বললে—সি ভোল্লেন্ ডেন্ হেরন্ অক্‌ুজিরেন্ ? আপনি কি লোকটিকে অভিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন ? (মেয়েটি বাচ্চাটিকে আদর করে। তাহার কান্না থামিয়াছে। মেয়েটি দীনবন্ধুকে দেখে। দীনবন্ধু হতভম্বের ন্যায় উপরের দিকে চোখ তুলিয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ মেয়েটি দীনবন্ধুর পায়ের কাছে শিশুটিকে নামাইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রণিপাত করে।)

মেয়েটি ঃ (অশ্রুরুদ্ধ স্বরে) ভগবানকে কোনদিন পাইনি, কিন্তু আপনার মতো মানুষকে তো পেলাম !

অনুপম : (টুপি খুলিয়া, মাথা নত করিয়া) কী, স্বর্গীয় দৃশ্য ! পুলিস ততক্ষণে দীনবন্ধুর হাত ছাড়িয়া দিয়াছে। অনুপম দীনবন্ধুকে হাত ধরিয়া তুলিয়া) ভাই দীনবন্ধু, আমি আপনার জন্য গর্বিত। এ আমার অভিজ্ঞতার এক মহৎ মুহূর্ত। (সকলের সামনে দীনবন্ধুকে লইয়া আসিয়া)। আমি আমার বর্তমান অবস্থার তাৎপর্য অবগত হয়েই বলছি—আজ এই স্টেশনের হীন পারিপার্শ্বিকে আমাদের এই সামান্য বন্ধুর সঙ্গে একই সঙ্গে নিঃশ্বাস নিতে পেরেছি—এ আমাদের জীবনের এক চরমতম সম্মানের মুহূর্ত। আমাদের স্মৃতির যাদুঘরে আমাদের এই বন্ধুর মুখচ্ছবি এক অমূল্য সঞ্চয়। আশাকরি এই ভালো মানুষের মেয়েটি বাড়ি ফিরে তার বাচ্চাটিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে

রাখবে।—মানবজাতির প্রতি এক নূতন বিশ্বাসে আজ আমি অনুপ্রাণিত। শুধু একটি জ্যোতির্মণ্ডলের অভাব—সেটি হলেই কবির সেই বাণী—মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা, তখন কি দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা। (দীনবন্ধুকে) দীনবন্ধু—আসুন, উঠে আসুন—(দীনবন্ধুবাবু হতভম্বের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়ান। কর্মচারীটি তাঁহাকে নমস্কার করেন, পুলিস অভিবাদন জানায়। বিক্রম সেন টান-টান করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ান ও তুইবার দ্রুত মাথা নত করেন। শ্রী ও শ্রীমতী রয় তুই-পা অন্তত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন, পরে কি মনে করিয়া পিছাইয়া গেলেন তাঁহারা। কুলিটি একটি স্প্রে লইয়া আসিয়া দীনবন্ধুর পিছনে সোনালী রঙের কিছু স্প্রে করিতে থাকে। একটি চলমান এন্‌জিনের ধোঁয়া আসে। এই তুই মিলিয়া দীনবন্ধুর মাথার চারিপাশে সোনালী ধূসর বর্ণের এক জ্যোতির্মণ্ডলের সৃষ্টি হয়। সকলে উপরের দিকে তাকাইয়া আছেন।)

অনুপম : এ এক ঐশ্বরিক আবির্ভাব! অন্তত তাই বলে চালিয়ে তো দেওয়া যাবে। আমি একটা ছবি নিয়ে দেখি—দারুণ হবে। (অনুপম ছবি নেন।)